# সৎকথা

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের ( স্বামী অদ্ভুতানন্দ )
উপদেশামৃত

স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

প্রকাশক
স্বামী ভ. .বোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা



দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬১

দুই টাকা

পূজ্যপাদ

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের

করকমলে

# নিবেদন

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ আমাকে তাঁহার চরণপ্রান্তে কয়েক ৎসর সেবকরূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত পদেশগুলি শুনিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম ; উহার কতকগুলি পূর্ব্বে উদ্বোধন' পত্রিকায় 'সৎকথা' নামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। াধারণের উপকারার্থ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ ও পূজ্যপাদ স্বামী ারদানন্দ মহারাজদ্বয়ের অনুমত্যনুসারে উপদেশগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য থাকে, তাহা আমারই ক্ষুদ্রবুদ্ধির জন্য ; কারণ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ অবস্থায় উপদেশ দিতেন বলিয়া তাঁহার কথা ঠিক ঠিক ধরা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৯

সিদ্ধানন্দ

# প্রকাশকের নিবেদন

'সৎকথা'র নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে উহা একত্রে এক খণ্ডে প্রকাশিত হইল। পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের সহজ সরল ভাষায় কথিত এই উপদেশাবলী পাঠকপাঠিকাগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কাগজ, ছাপা প্রভৃতির খরচবৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম রাখা হইল।

পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৫৬

প্রকাশক

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

অনন্তভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধারণা করা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টি দেখিয়া যেমন স্রষ্টার মহিমা কল্পনা করা যায়, তরঙ্গ যেমন সাগরে অপরিমেয় শক্তির আভাস প্রদান করে, ফল যেমন বৃক্ষের এবং মণি খনির পরিচায়ক, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব স্বয়ং যাঁহাদিগকে শ্রীহস্তে গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে আমরা তেমনই সেই মহাভাবসিন্ধুর মাহাত্ম্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। সকল ছেলে বাপকে সমানভাবে দেখে না। তিনি কাহারও শিক্ষক, কাহারও শাস্তা, কাহারও উপদেষ্টা, কাহারও সহায়, কাহারও সহকর্ম্মী, কিন্তু সকলেরই স্নেহময় পিতা এবং বিষয়বিভাগে সকলেই সমান অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজ সন্তান ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে যিনি যেভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যোগ্য আধার বুঝিয়া ঠাকুর যেভাবে যাঁহার জীবন পরিস্ফুট করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেরই সম্পূর্ণ বিকাশ।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ, আমাদের পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আমি মূর্খোত্তম'। কিন্তু তাঁহার এই ভক্তটি ছিলেন নিরক্ষর; সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত 'সৎকথায়' শাস্ত্রের ঘোরতর তরঙ্গ নাই, তর্কযুক্তির রঙ্গভঙ্গ নাই, আছে কেবল সাধুভাষায় নয়—সরল সাধুর ভাষায় তাঁহার অন্তরের উপলব্ধি এবং জীবন্ত ধর্ম্মের জাজ্বল্যমান সত্য। স্বামী অদ্ভুতানন্দের পূর্ব্ব জীবন (সাংসারিক জীবন) অজ্ঞাত। কেবলমাত্র জানিতে পারা যায়, ছাপরা অঞ্চলে কোনও দরিদ্র ঘরে তাঁহার জন্ম। ভাল নাম ছিল রাখতুরাম;

ডাক নাম লাটু। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের সংস্পর্শে পরমার্থ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের কথা ইহার বেশী জানিবার কোনও উপায় ছিল না। আত্মচর্চ্চায় তাঁহার একান্ত বিতৃষ্ণা ছিল। বলিতেন, "আমার চর্চ্চা করো না। আমার চর্চ্চা করে কোন লাভ নাই। ঠাকুর-স্বামীজীর চর্চ্চা কর। রাতদিন কর, তাতে শান্তি পাবে। ঠাকুর-স্বামীজীর যে চর্চ্চা করবে তার কল্যাণ হবেই হবে" ( 'সংকথা', বিবিধ—৩৮ )। কোন্ অজ্ঞাত লোক হইতে এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পার্থিব সংস্রবে আসিয়া—প্রখর আলোক-পাতে ক্ষণিকের জন্য আমাদের মোহান্ধ চক্ষু ঝল্‌সিয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার 'সংকথা'য় সে অপূর্ব্ব আলোকের যতটুকু জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাহার উপাদান এবং পবিত্র চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস, বাল্য-জীবন-কাহিনী কাহারও কাছে কখনও ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু কৈশোর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসা অবধি তাঁহার পুণ্যময় জীবন কিভাবে চালিত ও গঠিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 'সংকথা'য় আছে। ফুল কি আপনার গন্ধ লুকাইতে পারে? তাহার সৌরভই তাহার পরিচয় প্রদান করে। স্বামী অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত চরিত্র—তাঁহার কঠোর ত্যাগ, ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, অলৌকিক গুরুভক্তি, অবিচল বিশ্বাস, অনির্ব্বচনীয় ভগবৎপ্রেম, অটল বৈরাগ্য, তাঁহার প্রাণপন আত্মসংগ্রাম, পরিপূর্ণ আত্মজয়, তাঁহার একাগ্র লক্ষ্য, উগ্র সাধনা, দুর্লভ সিদ্ধি, এবং সর্ব্বশেষে লোককল্যাণব্রতে তাঁহার অনন্যসাধারণ আত্মোৎসর্গ—'সংকথা' যিনি পাঠ করিবেন তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু
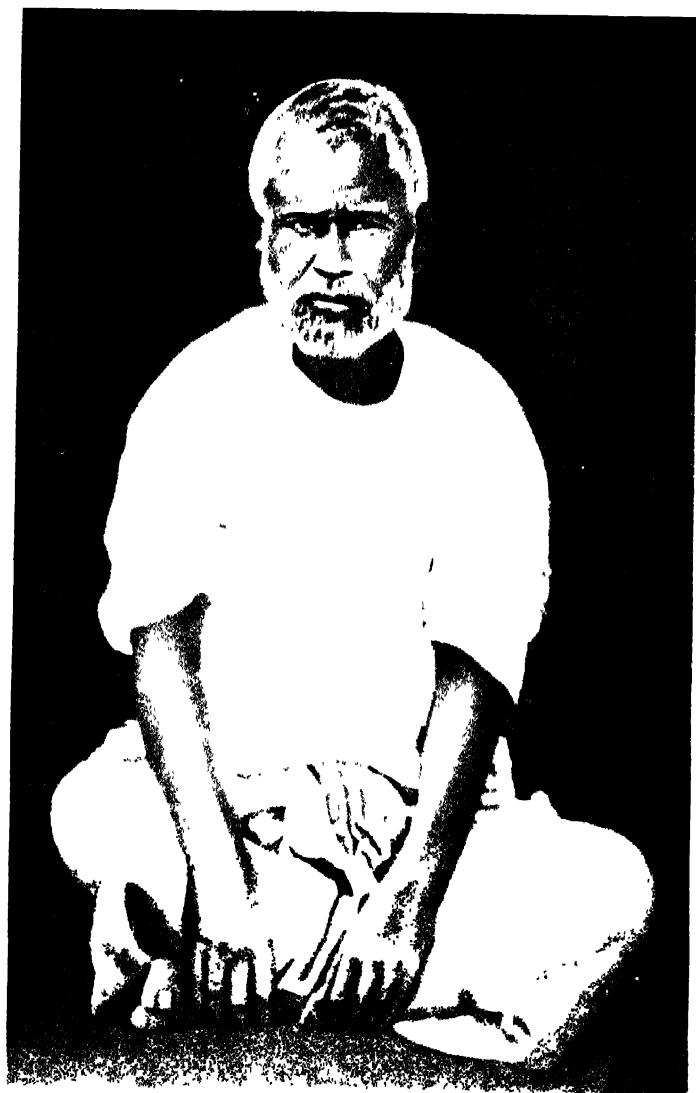
# শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ

## ( সংক্ষিপ্ত পরিচয় )

বিগত ১১ই বৈশাখ, সন ১৩২৭ সাল, ইংরেজী ২৪শে এপ্রিল, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৺কাশীধামে মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগকরতঃ শ্রীগুরুপদপ্রান্তে চলিয়া গিযাছেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিনী ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়—বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। তথাপি তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ দুই-চারি কথা লেখা আমাদের কর্ত্তব্য। ছাপ্‌রা জেলার কোন দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'লাটু' *। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ইনি চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতা আগমন করেন এবং শিমলার ৺রামচন্দ্র দত্তের গৃহে সাধারণ হিন্দুস্থানী বেহারারা যেসকল কাজ করিয়া থাকে, সেইসকল কাজ করিতে নিযুক্ত হন। রাম বাবু তখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন। সুতরাং মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত লাটুকে দিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফলমিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর কিন্তু তাঁহার জনৈক ভক্ত ভৃত্যবেশে উপস্থিত হইলেও শ্রীযুত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত লাটুও কি জানি কেন, এই অপরিচিতের

* স্বামী অদ্ভুতানন্দের পূর্ব্বনাম ছিল—রাখতুরাম চৌধুরী (?) ; ডাকনাম—লাটু।

প্রতি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন এবং রাম বাবু ফলমূল পাঠাইলে সানন্দে সেগুলি ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেন—হয়ত দু-এক দিন তাঁহার নিকট রহিয়াই গেলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন 'নহবতে' থাকিতেন।... তিনিও তাই বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেন না, বরং তাঁহার দ্বারা জল আনা, ময়দা ঠাসা, বাজার করা প্রভৃতি ছোটখাট কাজগুলি করাইয়া লইতেন। শ্রীযুত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন রাম বাবুর নিকট শ্রীযুত লাটুকে নিজের কাছে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রাম বাবু এবং লাটু উভয়েই সানন্দে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীযুত লাটু সেই দিন হইতে ঠাকুরের নিকট থাকিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত লাটু বড় কীর্ত্তন ভালবাসিতেন। তাঁহার রাম বাবুর বাটীতে অবস্থানকালে আমরা ইহার পরিচয় পাই। শুনা যায়, রাস্তা দিয়া কীর্ত্তনসম্প্রদায় যাইলে তিনি কাজকর্ম্ম ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন এবং বহুক্ষণ তাহাতে মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্য-অবহেলার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও সহ্য করিতে হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সংকীর্ত্তন হইত এবং শ্রীযুত লাটু ও অন্যান্য ছেলেরা তাহাতে যোগ দিয়া মহা-উল্লাসে নৃত্যাদি করিতেন। ছেলেদের অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, "মা, এদের একটু ভাবটাব হোক্।" আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অভ্যাসে ফল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই শ্রীযুত লাটুর ও অপর কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল।

এইরূপে ঠাকুরের পূত সঙ্গে ও তাঁহার আন্তরিক সেবায় শ্রীযুত লাটু দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান-ধারণাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীযুত লাটু তখন সমস্ত দিন খাটিয়া-খুটিয়া সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন। এক দিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সে কি রে, সন্ধ্যায় ঘুম কি রে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি ত ধ্যান-ধারণা করবি কখন?" বাস্, ইহাই যথেষ্ট। সেই দিন হইতে যে তিনি রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অভ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন। কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পরে তিনি আজীবন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। গীতার সেই ভগবদুক্তি—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

তাঁহার জীবনে আক্ষরিক অর্থে ও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। উত্তরকালে তাঁহাতে যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফল।

এইরূপে সারারাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিত-ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন। যখন ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর-উদ্যানে ছিলেন, তখনও তিনি বরাবর

তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই সময়ে যখন ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যমণ্ডলীকে সন্ন্যাস ও গেরুয়াবস্ত্র দান করেন তখন ইনিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন তাঁহার যুবক ত্যাগী শিষ্যগণ কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া গিয়া পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন, কি এখনই সংসার ত্যাগকরতঃ সাধন-ভজনে রত থাকিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে চলিবেন—এই সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, তখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুত লাটু, তারক ও বুড়ো-গোপাল এ তিন জনের বাড়ীঘরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান না থাকায় তাঁহাদের থাকিবার জন্য বরাহনগরে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহাই হইল বরাহনগর মঠের সূত্রপাত। অতঃপর ক্রমেই শ্রীযুত নরেন্দ্র-প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী একে একে এখানে আসিয়া সমবেত হন এবং সকলে মিলিয়া ভগবানলাভের তীব্র ব্যাকুলতায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্রি ধ্যান, জপ, কীর্ত্তনাদিতে ডুবিয়া থাকেন। এইখানেই স্বামীজী সকলকে লইয়া যথাবিধি বিরজাহোম করেন এবং সকলকে সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। এই সময়েই শ্রীযুত লাটুর অদ্ভুত চরিত্র—তাঁহার অদ্ভুত ভাব, ধ্যানধারণায় অদ্ভুত অনুরাগ ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ স্মরণ করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে 'অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

অতঃপর তিনি আলমবাজার মঠ, বেলুড় মঠ, কলিকাতায় 'বলরাম-মন্দির' ও অন্যান্য স্থানে অনেক দিন অতিবাহিত করেন এবং স্বামীজীর প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কিছুদিন তাঁহার সহিত আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মঠ,

মিশন প্রভৃতি নানাবিধ লোকহিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই আহ্বানে অনেকেই তাঁহার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ ইহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি যেভাবে আজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ধ্যান-ধারণা-কীর্ত্তনাদি উচ্চাঙ্গের কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত প্রচার, সেবা প্রভৃতি রজঃপ্রধান বাহ্যকর্ম্মের কিছুতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিলেন না। তিনি বরাবর ধ্যান-ধারণাদি লইয়াই রহিলেন।

তিনি আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু মনোযোগ-সহকারে বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন এবং সহজেই তাহাদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যে সহজেই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্রের যাহা গূঢ়ার্থ তাহা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কাজেই শাস্ত্রোক্ত কোন কথাই তাঁহার নিকট নূতন ঠেকিত না। একবার জনৈক সাধু তাঁহাকে কঠোপনিষদ্ শুনাইতেছিলেন। যেমন তিনি পাঠ করিলেন—

> "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
> তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ॥"

তখন তিনি, 'প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ' অর্থাৎ ধানের শিষটা যেমন অতি সন্তর্পণে ধৈর্য্যসহকারে খড় হইতে পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিবে—এই কথাটি শুনিয়া বড়ই খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই ঠিক বলেছে।" তাঁহার এইরূপ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সহজে এই দুর্ব্বোধ্য কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

মোট কথা, তিনি অপরের নিকট শুনিয়া-শুনিয়া সমস্ত বিষয়েই এমন একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার এমন একটি সুন্দর উত্তর দিতেন—যাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া যাইত। তাঁহার মীমাংসা হয়ত অপরের সহিত না মিলিতে পারে, কিন্তু তিনি যে দিক হইতে প্রশ্নটির উত্তর দিতেন, সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে উহা যে বাস্তবিকই খুব বুদ্ধিমানের মত উত্তর, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। 'উদ্বোধনে'র পাঠকবর্গও ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ২৩, ২৪শ বর্ষের 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে 'সৎকথা'-শীর্ষক যেসকল অমূল্য উপদেশ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেগুলি ইঁহারই প্রদত্ত উপদেশ ও কথাবার্ত্তা হইতে সঙ্কলিত। শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুত অতুল বাবু বলিতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের **miracle** ( অলৌকিক শক্তি ) যদি দেখিতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় **miracle** আমি আর কিছু দেখি নে।" পূজ্যপাদ স্বামীজীও বলিতেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম, লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটি-মাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-

ধারণাসহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।”

লাটু মহারাজের একটি বিশেষত্ব ছিল—সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলামেশার ভাব। তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিত এবং তাঁহার নিকট হইতে ছোলাভাজা, হালুয়া প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্য ভিড করিত। তিনি খুব সরল, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন।

শেষজীবন তিনি বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে অতিবাহিত করিবার জন্য ৺কাশী গমন করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সারারাত্রি ধ্যান-ধারণা করিতেন অথচ আহার-বিহারে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না—সর্ব্বদাই যেন একটা ভাবে থাকিতেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট বড একটা শুনা যাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন; ভক্তবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথামৃত পান করিত। অবশেষে তিনি সকলকে প্রসাদ দিয়া বিদায় দিতেন।

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নামমাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাঁহার বৃদ্ধ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিনরোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। শেষ ২।৩ বৎসর তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি শরীরের দিকে আদৌ নজর দিতেন না। ‘শরীরধারণ বিড়ম্বনম্’ এই কথাটি প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। ইদানীং অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন—ইচ্ছা হইত ত

কাহারও সহিত কথা কহিতেন, নতুবা চুপচাপ থাকিতেন—দেহ-ত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ে একটা ফোস্কা হইয়া ঘা হয়। তিনি উহার বিশেষ কোন যত্ন লইতেন না। উহা ক্রমে বিষাক্ত হইয়া 'গ্যাংগ্রিণে' পরিণত হয়। উপর্য্যুপরি চারিদিন প্রত্যহ ২।৩টা করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার একটুও বিকার হয় নাই—যেন অপর কাহারও শরীরের উপর অস্ত্রচালনা করা হইতেছে। এরূপ দেহজ্ঞানরাহিত্য মানুষে সম্ভবে না। তাঁহার মন জীব-জগৎ, এমন কি, নিজের অতি প্রিয় দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে সেই পরমানন্দময় সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিত—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" তাঁহার শেষ-সময়ের সংবাদ নিম্নোদ্ধৃত পূজনীয় তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রে পাঠকবর্গ আরও সুন্দররূপে অবগত হইবেন—

"প্রিয়বর—,

··· লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন লিখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন—ভ্রূমধ্যবদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম, অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্ব্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর নড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে। তাহাতে বলিলেন, শরীর গেলেই ত ভাল। আমি বলিলাম, তোমার

ও কথা বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন করিবেন, সেইরূপ হইবে। তাহাতে বলিলেন, তা ত জানি, তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্ত্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন। প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প— বলিত, তবে আমিও কিছু খাইব না। অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প— বলিল, খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না। লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, 'মৎ খা'—একেবারে মায়ানির্ম্মুক্ত উক্তি!

"পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২°৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্যদিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎ সহায়েরও আসিবার কথা স্থির ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম লাটু মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ—কে তার করিতে বলিয়া

আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬ নং হাড়ারবাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডানদিক চাপিয়া পাশ-বালিসে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল, সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন—কেবল অধিক প্রশান্ত ভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে-চারটার সময় তাঁহাকে বসাইয়া যথারীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

"যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয়, তখনকার মুখের ভাব যে কী সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই! ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা—কি প্রসন্নতা—কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত! যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণই বটে! প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই।

কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন-প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান এবং তথা হইতে নৌকা-যোগে ৺গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ব্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জলসমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই চরমকালে লাটু মহারাজের এই পরমানন্দমূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!"*

* ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'উদ্বোধন' হইতে উদ্ধৃত।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

# স্তোত্র

সংসারবৃক্ষমারূঢাঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

# শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভ্রাতৃগণ

ঠাকুর-স্বামীজীকে আদর্শ করে চল। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের মহাশক্তি। এঁদের ভিতরই সব দেবতা। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বলেছেন ও দেখেছেন। আবার সন্দেহ কি? এমন আদর্শ আর কোথায় পাবে? সাঙ্গো-পাঙ্গদের ভিতরও সেই একই শক্তি নানাভাবে লীলা করছেন। সবই ইষ্টের লীলা—এঁরা যে লোকশিক্ষক। কে বোঝে? যে বোঝে, সেই মজে। মাকে চিরদিনই মার মতই দেখতাম। মা আমাদেরই মা, এতে আর সন্দেহ কি আছে? আমাদের ঠাকুর আমাদেরই বাপ—যথাসর্ব্বস্ব। আর কোন ভয়-ভাবনা ছিল না। বাপ-মার কাছে যেন ছোট খোকার মত থাকতাম। সাধনভজন করতাম, খাবার সময় খেতাম। সাধন-ভজনে বিলম্ব হলে, নানা ছল করে ঠাকুর এনে খাওয়াতেন। বেশী ধ্যান করলে ঐরূপ করতেন—ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আনতেন।

ঠাকুর মা-কালীর প্রসাদী ফল যোগীনকে (স্বামী যোগানন্দ) রোজই রাখতে বলতেন। যোগীন ভাবলে—হাজার হোক ভটচায বামুন, সংস্কার যাবে কোথা? ফল-টলের মায়া ছাড়তে পারেন নি।

যোগীনের মনে এই কথা যেমনি হওয়া, অমনি ঠাকুর বললেন—বামুনেরা তাদের 'অবিদ্যার' জন্য নিয়ে যায়; তোরা খাস, তবুও সার্থক। যোগীনের মনে আপশোষ হলো—কি করলুম, খামকা এঁর উপর সংশয় করেছি, ইনি ত আমাদের জন্যই প্রসাদ রাখতে বলেন।

ঠাকুর আমাকে, রাখাল মহারাজকে ভিক্ষা করতে বলতেন। প্রায়ই বলতেন—ভিক্ষার অন্ন বড় পবিত্র। আমি ও রাখাল মহারাজ একদিন ভিক্ষা করতে গেলাম। যাবার সময় ঠাকুর বলে দিলেন—কেউ গালি দেবে, কেউ আশীর্ব্বাদ করবে, কেউ পয়সা দেবে, তোরা সব নিবি। প্রথমে একজন আমাদের ভিক্ষা করতে দেখে তেড়ে এসেছিল। বললে—এমন ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে আবার ভিক্ষা কচ্ছো? কাজ করে খেতে পার না? রাখাল মহারাজ ভয় পেয়েছিলেন। আমি বললাম—ঠাকুর ত আগেই এ সব কথা বলে দিয়েছেন, ভয় পাচ্ছো কেন? তার পর একজন স্ত্রীলোক আমাদের দেখে বললে—তোমরা কি দুঃখে ভিক্ষা কচ্ছো, বাবা? তোমাদের অভাব কি? আমরা তখন সব বললুম। তখন সে খুশী হয়ে একটা সিকি দিলে এবং সূর্য্যনারায়ণের দিকে তাকিয়ে আমাদের খুব আশীর্ব্বাদ করে বললে—তোমরা যে জন্য বেরিয়েছ, ভগবান তোমাদের সে আশা পূর্ণ করুন। আর অনেকেই চাল, পয়সা সব দিলে; আমরা সেইগুলো এনে ঠাকুরের কাছে দিলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে ভিক্ষা করলি? আমরা তখন সব বললুম। ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন,—ঠিক বলেছে; দেখ, আমার সঙ্গে সূর্য্যনারায়ণের যোগ আছে; একদিন মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, একটা লোক হঠাৎ এসে—"তোমার ও মাথার ব্যারাম নয়। সূর্য্য-

নারায়ণের সহিত তোমার যোগ আছে" বলেই চলে গেল। তখন আমি হৃদেকে বললাম—দেখ ত লোকটা কোথায় গেল? হৃদে ফটক পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বললে—দেখতে পেলাম না। তারপর ঠাকুর বললেন—এ সব দৈবী ঘটনা। ঠাকুর স্বামীজীকে ও ভবনাথকে রান্না করতে বললেন, সে দিন রবিবার। ঠাকুর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন;—খুব খুশী। যখন রান্না শেষ হয়েছে, পঙ্গত হবে, এমন সময় এক বাউল এসে উপস্থিত। ঠাকুর বললেন—এখন হবে না, যদি বাঁচে তবে পরে পাবে। বাউল রেগে চলে গেল। স্বামীজীর মনে হচ্ছে, অনেক জিনিস রান্না হয়েছে, খেতে দিলেন না কেন? কি কৃপণ! ঠাকুর বললেন—ও বাউল, কত কি করেছে। ও এমন কি কর্ম্ম করেছে যে, তোদের সঙ্গে বসে খাবে? তোরা সব শুদ্ধ, ওর সঙ্গে খাবি কি করে? তখন স্বামীজী বুঝতে পারলে কেন ঠাকুর তাকে বারণ কচ্ছেন। তখন আমরা সঙ্গগুণের অর্থ কি বুঝলাম। সাধনের সময় যার-তার সঙ্গে মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া ঠিক নয়—ভাবের হানি করে। তিনি এ সব বিষয়ে খুব নিয়ম মেনে চলতেন এবং আমাদের সব সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

তিনি যে অবতার, তা স্বামীজী বলেছে, আমি আর কি বলবো? তিনি আমার গুরু, পিতা। স্বামীজীই তাঁকে বুঝেছিল—তিনি কে। আমি তাঁকে কি জানি, কি বুঝি, বলবো যে? তিনি স্বামীজীকে তাঁর প্রচারের জন্য এনেছিলেন এবং তাকে তিনি শক্তি দিয়েছিলেন; তবে ত স্বামীজী তাঁকে প্রচার করতে পেরেছিল। যারা তাঁকে কায়মনে ডাকবে তিনি অবশ্য তাদের দয়া করবেন, জোর করে বলছি।

শশী মহারাজ এমনি আরত্তি করতো যে, ঠাকুর-ঘরটা জমজম করতো। আরতির সময় ঠাকুর-ঘরে সকলকেই যেতে হতো। আরতির সময় গুরুস্তোত্র পাঠ করা হতো। ভোগের জন্য বাজারের উৎকৃষ্ট ফল আসতো; কিন্তু আয় কিছু ছিল না। লোকে বলতো যে, এরা ক' ঘড়া মোহর পেয়েছে; নৈলে এত ফুর্ত্তি করে ভোগ লাগায়? ঠাকুরকে কোন্ জিনিসটা ভোগ দেবে, এই চিন্তাই তার ছিল। শশী মহারাজ দিনরাত পূজো নিয়ে থাকতো এবং আর সমস্ত কাজও নিজেই করতো। আমাদের বলতো—তোমরা খাওয়ার জন্য ভেবো না।

স্বামীজী রাতভোর ধ্যান করতো। কালী মহারাজ কখনও ধ্যান করতো, আর কখনও বা পড়তো—ঠাকুর যে সব বলে গিয়েছিলেন, সেই সব কথা বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতো। ধ্যান, জপ, গান-বাজনায় কত রাত কেটে যেতো।

ঠাকুর তাঁর সন্তানদের রাত্রিতে কম খেতে দিতেন। রাত্রিতে বেশী খেলে ধ্যান-জপ কি করে করবে? বেশী খেলেই ঘুম আসবে। দিনে বারুদ-ঠাসা খেতে হয়, আর রাত্রে সামান্য—তিনি বলতেন। ঠাকুর যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রে কি খাস? সে বললে—আধ সের আটার রুটি আর এক পোয়া আলুর চচ্চড়ি। ঠাকুর ঐ কথা শুনে বললেন—তোকে আমার সেবা করতে হবে না। তুই চলে যা, অত যোগাতে পারবো না। যোগানন্দ দিনে সেবা কোরে রাত্রে চলে যেতো।

যেমন ঠিক ঠিক গুরু মেলা শক্ত, তেমনি ঠিক ঠিক শিষ্য মেলাও শক্ত। ঠাকুরের মত গুরু দুর্লভ বৈকি! তিনি বলতেন—তোরা কত বড় হবি, হ না। খুব বড় হবি ত একটা অবতারের মত হ। আর কত বড় হবি? তাঁর খুব দয়া, তিনি জোর করে বলতেন—বিয়ে করিস নে, বিয়ে না করলে ধর্ম্ম একদিন না একদিন বুঝতে পারবি। তিনি, যার ধর্ম্ম হবে, তাকে আদর করতেন; আর গরীব দেখলেই খেতে দিতেন।

বরানগর মঠে হয়ত আমরা বেশ গল্প করছি, আর এমন সময় সুরেশ মিত্তির এসে হাজির। অমনি স্বামীজী ছাদে তাড়াতাড়ি উঠে যেতো। সুরেশ মিত্তির বলতো—তোমরা অত সঙ্কোচ কর কেন? তিনি দয়া করে দেওয়াচ্ছেন বলে দিচ্ছি। তোমরা অন্যরূপ ভাব কেন? দেখ, সুরেশ মিত্তির কেমন নিরহঙ্কার, আর গুরু-ভাইদের প্রতি তার কত ভালবাসা! এমনটি প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। স্বামীজী বলতো—মঠ-ফঠ যা দেখছিস, ঐ সুরেশ মিত্তিরের জন্যই ত হলো।

ভূপতিভাইয়ের পবিত্র জীবন। সে ত্যাগী, লেখাপড়াও বেশ জানে, অঙ্কে খুব অধিকার আছে। কাশীতে যোগীনের সঙ্গে থাকতো, আর সাধন-ভজন করতো। কাশীর বেগুন খুব ভাল দেখে এক দিন ভূপতিভাই বেগুনের জন্য পয়সা ভিক্ষা চাচ্ছিল। কাছে একটিও পয়সা ছিল না, তাই। পেছনে যোগীন ছিল; সে ধমকিয়ে ভূপতিকে বললে—এই, তুই সাধু হবি না? কাশীতে খুব কঠোর করেছে।

তিনি ত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ছিলেন কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি বেশী খরচ হলে কি যে বকতেন, তা তোরা কি বুঝবি। তামাক খাবার সময় দেশলাই ধরালে গাল দিতেন। বলতেন—রান্না হচ্ছে, আগুন নিয়ে আয়, আলস্য করিস কেন? কুঁড়েমিতে কি ধর্ম্ম হয়? কুঁড়ের কোন কালে ধর্ম্ম হয় না। স্বামীজী বেশ বলতো—কর্ম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে ঝুড়িয়ে * পুড়িয়ে। কেবল লম্বা লম্বা কথা, কাজের সময় নেই, আবার ধর্ম্ম লাভ করতে এসেছে! ধর্ম্ম লাভ কি এত সোজা রে?

বড়লোক হলেই যদি ধর্ম্ম হতো, তা হলে কলকাতায় অনেক বড়লোক ছিল, আগে তাদের হতো। ···আমাদের ঠাকুর বড় গরীব ছিলেন। একদিন ঠাকুরের ভারি খিদে পেয়েছে। ঠাকুর রামলাল দাদার মাকে বললেন—রামলালের মা, দেখ ত ঘরে কি আছে? আমার ভারি খিদে পেয়েছে। রামলাল দাদার মা বললেন—ঠাকুরপো, ঘরে কিছুই ত নেই, তবে পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ আছে। ঠাকুর খুব খুশী হয়ে তাই খেলেন। তোমাদের কোন মুরোদ নেই, কেবল ফাঁকা কথা। যাকে ভগবান বলে লোকে পূজো কচ্ছে, তিনিই পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ খেলেন!

গিরিশ ঘোষ বলেছিল যে, বুড়ো বয়সে ঠাকুর আমাকে কৃপা করলেন। যদি জোয়ান বয়সে কৃপা করতেন, তা হলে সন্ন্যাস কি জিনিস একবার দেখিয়ে দিতুম।

---

* জ্বালিয়ে

'উদ্বোধনে' ধর্ম্মকথা শুনতে পাচ্ছি। ভগবৎকৃপায় তোমার শরীর সুস্থ থাকুক, এই একান্ত প্রার্থনা। যত দিন যাচ্ছে, ততই তাঁর কৃপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তোমাদের মহিমা বুঝতে পাচ্ছি। তুমি মাতা-ঠাকুরাণীর সেবা কচ্ছো, বড়ই ভাগ্যের কথা। তিনিই করাচ্ছেন, তা ঠিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিই—" এই তাঁর দয়া। তোমার শরীর ধন্য। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার ও শশী মহারাজের বিষয় আমাকে বলেছিলেন। শশী-শরতের বাপ-মা-ভাই আছে, কোন অভাব নেই, ভগবান পাবার জন্য ব্যস্ত। আরও তোমাদের বিষয় আমাকে অনেক বলেছিলেন। সে সব সাক্ষাতে বলবো। তুমি আমার ইহকালের ভাই, পরকালের ভাই, এই কথাটি ভুলো না। ( জনৈক গুরুভাইকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত )।

আপনারা মঠে তাঁর ( ঠাকুরের ) উৎসবে গিয়েছিলেন শুনে বড়ই খুশী হলাম। এ উৎসব রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র দ্বারা তিনি থাকতেই করিয়েছিলেন। সব ভক্তেরা রবিবারে গিয়েছিলেন। তিনি অবতারের বিষয়, তিথি, জন্মবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। ভক্তেরা সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জন্মতিথি কবে ? ঠাকুর ধমকে বললেন—তা শুনে কি হবে ? তার পর বললেন—ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। আর বললেন—যার জন্মতিথি তাকে সেই দিন ভাল কাপড় পরাতে হয়, ভাল জিনিস খাওয়াতে হয়, পুকুরে ল্যাটা মাছ ছেড়ে দিতে হয়। ঐ দিনে মাছ-মাংস খেতে নেই। রাম দত্ত, সুরেশ মিত্তির বললেন—আমরাও উৎসব করবো। তখন দেড় শত দু শত লোক হতো। ভাল কীর্ত্তন, গান বাজনা, পদাবলী হতো। স্বামীজী বৈঠকী গান করতো। যা

জিনিস বাঁচত, গরীবদের দেওয়া হতো। তাঁর উৎসবে আনন্দ হবারই কথা। আমি আজ আপনাকে জানালাম। যত্ন করে রেখে দেবেন।... তামসিকতা যায় তাঁর নামে, ধ্যানে, গুণগানে। ঐ সব করতে করতে আপনি যায়। ( জনৈক ভক্তকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত )।

বিদ্যার দ্বারা পরমাত্মার কাছে যাওয়া যায়। কালী, দুর্গা, সীতা প্রভৃতি 'বিদ্যা'—এঁরা শিবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। এঁদের ভেতর কোন হিংসা, দ্বেষ, রাগ নেই। এঁদের সর্ব্বদাই সাহায্যের ইচ্ছা, সকলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঠাকুর বলতেন রাধার একটু হিংসা ছিল। তিনি একাই কৃষ্ণকে পাবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সীতার সে ভাব ছিল না—তিনি রামের কাছে সকলকে পাঠিয়ে দিতেন।

হৃষীকেশ খুব তপস্যার স্থান। সাধুরা সর্ব্বক্ষণই ধ্যান, জপ করে। আহারের চেষ্টায় পাছে সময় নষ্ট হয়, সে কারণ তৈরী অন্ন পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত আছে, এ খুবই ভাল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যে সিদ্ধি-লাভ করেছেন, ওটা দৈবাৎ। সাধুরা বলেন—তা না হলে, এ দিক ( বাংলা দেশ ) তপস্যার স্থান নয়।

ঠাকুর বলতেন—তোতাপুরী সমস্ত রাত ধ্যান করতেন। দিনে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। লোকে ভাবত, ঘুমিয়ে আছেন। বাস্তবিক কিন্তু ধ্যান করতেন।

গুরু, ইষ্ট এক। তোদের সংশয় বলেই না বিড়বিড় করি। আমার

শরীর খারাপ না হলে কাউকে দরকার ছিল না। কি করি, শরীর নিয়েই না যত ঝঞ্ঝাট! বিবেকানন্দ থাকলে কি আমাদের কিছু ভাবতে হতো?

দুর্গাচরণ ডাক্তার রাত্রি দশটার সময় এসে 'হৃদে হৃদে' করে ডাকতো। ঠাকুর তখনই হৃদেকে বলতেন—ওরে দোর খুলে দে। হৃদে দোর খুলে দিত। ডাক্তার বাবু ঠাকুরকে আপাদমস্তক দেখে একটি কথাও না বলে চলে যেতেন, আর হৃদেকে বলে যেতেন—ওখানে যেও। অর্থাৎ কিছু দেবেন। ডাক্তারই জানেন, তিনি ঠাকুরকে কি চোখে দেখেছিলেন।

ঠাকুর বলতেন—আমি সন্ন্যাসীর রাজা।

তোমাদের আপন বলেই না এত গাল দিয়ে থাকি। যদি তোমরা না বোঝ—ভোগ। আমি প্রত্যক্ষ দেখছি, তিনি আছেন; আমি কি মিছে বলছি? তিনি আমাদের ধরে রেখেছেন। ঠাকুরের উপদেশ মত চলতে হয়, তা না হলে কি বুঝবে?

ঠাকুরকে কি ভগবান বলে মনে হতো?—তা হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না তাঁর ধারে থাকা যায়? বাপ বলে মনে হতো—কোন চিন্তাই নেই, নিষ্পরোয়া।···মাঝে মাঝে কলকাতা যেতুম। মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। আবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে পড়তুম।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলে সমস্ত বাংলার ও উড়িষ্যার জনসাধারণ মানলে। দেখ, তাহাদের কেমন উন্নতি! আর যারা বিশ্বাস

করলে না, তাদের কি দুর্দ্দশা! পরমহংসদেবকে মানুক আর নাই মানুক, তাতে আমার কি? যে বিশ্বাস করবে, তারই সদ্বুদ্ধি হবে।

মুক্তি ত তাঁর (ঠাকুরের) হাতে। বাসনা—যেন জন্মে জন্মে বিবেকানন্দের মত গুরু-ভাই পাই। আগে বুঝতে পারি নি, আমাকে এত করেছে, তবু তাকে সময় সময় গাল দিয়েছি; কিন্তু কিছু মনে করে নি। এখন সেসব মনে হলে কি দুঃখ হয়—তা আর কাকে বলবো? আমি তাকে পূজো করি বৈ কি! তাঁর (ঠাকুরের) নীচেই বিবেকানন্দের ভালবাসা। দেখ, আমার শরীর বেশ ছিল। বেশ ফুর্ত্তি ছিল, কারও তোয়াক্কা রাখতুম না। দিনের বেলায় গঙ্গার ধারে পড়ে থাকতুম, আর রাত্রে 'বসুমতী' প্রেসে। বিবেকানন্দভাই চলে গেল, হঠাৎ শরীর ভেঙ্গে গেল—আর কোন কারণ নেই। এ কথা এত দিন বলি নি। আজ তোমাদের বলছি। তাই মনে হয়—এ শরীর আর সারবে না।

আজকাল ত খুব নাম পড়ে গেছে; বিবেকানন্দভাই থাকলে কত ফুর্ত্তি হতো। আমি বলেছিলাম—মঠ-ফঠ করে কি হবে? বিবেকানন্দ-ভাই বলেছিল—মঠ তোর-আমার জন্য নয়: এই সব ছেলেদের জন্য। যদি পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, তবুও কল্যাণ। মঠে ডাল-ভাতের কোন অভাব হবে না তাঁর কৃপায়! এখন দেখতে পাচ্ছি, সে যা বলেছে, তা সব ঠিক। আমেরিকা হতে আসার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই খেতিস কোথা? তুই ত বিগড়ে থাকতিস। আমি বললুম—'বসুমতী'র উপেন মুখুয্যে আমাকে খেতে দেয়। স্বামীজী উপেন বাবুকে খুব আশীর্ব্বাদ করলে।

মঠে একবার হুকুম হলো। ভোর চারটেয় উঠে সবাইকে ধ্যান করতে হবে। ঘণ্টা নেড়ে সকলের ঘুম ভাঙ্গান হতো। আমি একদিন সকালে উঠে গামছা-কাপড় কাঁধে ফেলে চলে যাচ্ছি দেখে স্বামীজী বললে—কোথায় যাচ্ছিস ? আমি বললুম—তুমি বিলেত থেকে এসেছ, কত নূতন নূতন আইন চালাবে, আমি ও সব মানতে পারবো না। মন কি ঘড়িধরা, যে, ঘণ্টা বাজলো, আর বসে গেল ? আমার এমন হয় নি। তোমার যদি হয়ে থাকে, ভালই। তাঁর কৃপায় কলকাতায় আমার দুটো অন্নের সংস্থান হবে। তখন স্বামীজী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে—তোকে যেতে হবে না। তোদের জন্য ও সব নিয়ম নয়। এরা সব নতুন, এদের যাতে একটা ভাব স্থায়ী হয়, তারই জন্য। তখন বললুম—তাই বল।

ধ্যান-জপ করে উঠেই ওকে মারছে, গাল দিচ্ছে, এ আবার কি রকম ? স্বামীজী ঠাকুরের কোন সন্তানকে বলেছিল—তোর ধ্যান না করা ছিল ভাল। তার রাগ ছিল বেশী, কিন্তু গুরুভাইদের ওপর অগাধ ভালবাসা ছিল। আমাদের মধ্যে কাকেও যদি বাইরের লোক এসে কিছু বলতো, তবে সে শুনতে পেলে আর রক্ষা ছিল না। কোন লোকের কিছু বলবার জো ছিল না।

স্বামীজী শশী মহারাজকে বলেছিল—শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস ? শশী মহারাজ বললে—হাঁ, তোমাকে খুব ভালবাসি। স্বামীজী বললে—যা বলবো তাই করবি ? তবে যা, চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানার মোড় থেকে পাঁউরুটি নিয়ে আয়, আর বিকেলে

পাঁচটার সময় নিয়ে আসবি যখন সব আফিসের ছুটি হবে, রাস্তায় খুব লোক চলবে। বিকেলে পাঁচটার সময়, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) পাঁউরুটি নিয়ে এল। আলমবাজারের মঠে শশী মহারাজের যখন ঠাকুর-পূজোয় মন বসে গেছে, হঠাৎ স্বামীজী বললে—তোকে মান্দ্রাজে যেতে হবে। অমনি চলে গেল। কোন কথা নেই, ওজর-আপত্তি কিছুই করলে না। সাধু হয়ে শশী কাশী পর্য্যন্ত দেখবার অপেক্ষা করলে না, গুরুভাই-এর ওপর এমন অগাধ ভালবাসা!

কারুর খুব রাগ হলে ঠাকুর বলতেন—ওকে ছুঁসনি, চণ্ডালে স্পর্শ করেছে। চণ্ডাল ছুঁলে যেমন অস্পৃশ্য হয়, ক্রোধের বশীভূত হলে মানুষ সেরূপ হয়।

যখন ভাল লাগতো না, এদিক ওদিক যেতে ইচ্ছা করতো, ঠাকুর দেখেই বুঝতে পারতেন; বলতেন, ওরে, দক্ষিণেশ্বরের এমন প্রসাদী অন্ন ছেড়ে কোথা যাবি? মন উচাটন করিস নি, বাইরে গেলে খাওয়ার কত কষ্ট জানিস ত? তবে মাঝে মাঝে বলতেন—কলকাতা ঘুরে আয়। কলকাতায় গিয়ে দু-চার দিন পরেই আবার চলে আসতুম। কলকাতাও ভাল লাগতো না, ঠাকুরের কাছে থাকার মত অত স্বাধীনতা কোথা পাব? একে বলে গুরুর দয়া। আমার মনে কখনও সংশয় হোত না যে, এঁর হুকুম কেন শুনি। এ-ও গুরুর দয়া বৈ কি!

ভাস্করানন্দ স্বামী বলেছিলেন—কোথাও ঘুরো না, ঘুরলে কিছু

পাবে না। আমি যোগেন প্রভৃতি তাঁর বাগানে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাদের অল্প বয়স দেখে, ভাস্করানন্দ খুব খুশী হয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন ও যত্ন করেছিলেন। বললেন—ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের দয়া করবেন। এক জায়গায় বসে তাঁকে ডাক। আমার দুঃখের কথা শোন। আমি হেঁটে হেঁটে চার ধাম (কেদার-বদরী, জগন্নাথ, দ্বারকানাথ, রামেশ্বর) করেছি। তখন রেল ছিল না; কি কষ্ট বুঝতে পাচ্ছো। এত ঘুরেও আমার কিছুই হয় নি, যে দুঃখ, সেই দুঃখই রয়ে গেছে। তখন এই বাগানে এসে প্রতিজ্ঞা করলুম,—হয় ভগবান লাভ হবে, না হয় শরীর যাবে। যা হোক, এখন আমার কিছু আনন্দ লাভ হয়েছে। তিনি হাতে ছড়ি নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তখন তাঁর মূর্ত্তির পূজো হচ্ছিল। খুব খুশী। আমাদের বললেন—উহাঁ কেয়া হোতা হ্যায়? আমি বললুম—আপ নারায়ণ হ্যায়, আপকো পূজা হোতা হ্যায়? তখন তিনি হেসে বললেন—কেয়াবাৎ! যেন বালকের ভাব।

ঠাকুরের খাবার তৈরী। ঠাকুর হঠাৎ বাইরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কোন লোকের বাড়ীতে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এলেন। হৃদে এদিকে তাঁকে না দেখে ডাকাডাকি কচ্ছে। উনি এসে বললেন—ওদের বাড়ীতে খেয়ে এলাম। হৃদে দুঃখ করে বললে—কি দুর্ভাগ্য আমার! এমন চর্ব্যচোষ্য প্রসাদ তৈরী, কোথা খেতে গেলে মামা? ঠাকুর বললেন—যখন পরমহংস অবস্থা হয়, তখন এমনি হয়ে থাকে, কোথায় খাবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

তিনি মাধুকরীর অন্ন বড় ভালবাসতেন; পবিত্র ও সাধনভজনের সহায়—বলতেন।

ঠাকুর যখন মথুর বাবুর সঙ্গে কাশী, বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, মথুর বাবু তখন অনেক টাকা খরচ করে গরীবদের খাইয়েছিলেন। ঠাকুর মথুর বাবুকে এত টাকা খরচ করতে দেখে বলেছিলেন—যদি তোমার শাশুড়ী ( রাসমণি ) কিছু বলে? মথুর বাবু বলেছিলেন—বেটীর কিছু বলবার মুরোদ নেই, বিষয় বাড়িয়ে দিয়েছি।

মথুর ঠাকুরকে বলেছিলেন—বাবা, এমন কি কর্ম্ম করেছি যে, আর জন্ম হবে না; তাই যতটুকু পারা যায়, সৎকাজ করা যাক। ঠাকুর বলেছিলেন—শালা বড় চতুর, সেয়ানা।

মথুর বাবুকে তাঁর কুলগুরু বলেছিলেন—আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার ইষ্ট সাথে সাথে থাকবে, একসঙ্গে খাবে ইত্যাদি। তার পর ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়ায় সব মিলে গেল। আগের কুলগুরুরা সব কেমন ছিল। বলার উদ্দেশ্য—যে কর্ম্ম ( সাধন ) করবে, তারই হবে; সে গৃহস্থ হোক, আর সাধুই হোক। গৃহস্থদের সংসারের জ্বালা এবং মায়া সব ভুলিয়ে দেয়—এই দোষ।

তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—বিয়ে করে কি পাপ করেছিস, ভয় কি রে? আমি আছি; আমার দয়া থাকলে কোন ভয় নেই। তবে, বিয়ে করে মুগ্ধ হওয়া খারাপ।

পরমহংসদেবের কাছে টাকাও ছিল না, বাগানও ছিল না। তবে কিসের লোভে বড় বড় লোক তাঁর কাছে পড়ে থাকতো?… হরিনাম করলে পরমহংসদেব কি যে খুশী হতেন তা মুখে বলা যায় না! একদিন কয়েক জন হরিনাম করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। তারা হরিনাম করে উঠে দেখে—পরমহংসদেব পাখা নিয়ে বাতাস কচ্ছেন। তারা সকলে বললে—মশায়, করেন কি? করেন কি? পরমহংসদেব বললেন—আহা! এত কষ্ট করে তোরা হরিনাম করলি! আর আমি একটু পাখার বাতাস দিতে পারি না?

তাঁকে যারা ইচ্ছা করে দেখেনি, তারা এখন অনুতাপ কচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের 'অমুক' বাবু ইঞ্জিনিয়ার, যোগেন মহারাজের পিতার সঙ্গে স্বামীজীকে দেখতে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় স্বামীজী বললেন—আপনি পরমহংসদেবের কাছে যান নি কেন? ইঞ্জিনিয়ার বাবু বললেন—আমি আর ইনি পরমহংসদেবের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ইনি বললেন—থাক, এ পাগল, এর কাছে যেও না, চল পঞ্চবটীর সাধুর কাছে যাই। আমরা পঞ্চবটীর সাধুর কাছেই গেলাম। সাধুর কৃপা ভাগ্যে না থাকলে সাধুদর্শন হয় না। এখন বড় দুঃখ হয়, একটা সামান্য কথার জন্য তাঁর দর্শন পেলুম না!

# শ্রীশ্রীমা

মা কখন কখন বলরাম বাবুর বাটীতে আসিতেন। আমি বাইরের ঘরে থাকতুম। আমাকে এসে কেউ কেউ বলতো—মশায়, মা উপরে এসেছেন। আমি বলতুম, তা কি হবে? আমার মনের ভাব না বুঝতে পেরে অনেকেই চটে যেত। 'উদ্বোধনে'ও যেতাম না বলে জিজ্ঞাসা করতো—কেন যান না? মঠে থাকতাম না বলে অনেকে জিজ্ঞাসা করতো—কেন থাকি না। আমি বলতুম—আমার ঠাকুর কি কেবল ওখানেই আছেন, এখানে নেই? আমি যেখান থেকে ডাকবো, তিনি সেখানেই প্রকাশ হবেন—এটুকু আমার বিশ্বাস।

মঠ হবার পরই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদধূলি এনে স্থাপন করে। তা আজও বেলুড় মঠে পূজো হয়। আর মঠ যত দিন থাকবে, তত দিনই পূজো হবে। মা ঠাকরুণ যে কি, তা একমাত্র স্বামীজীই বুঝেছিল! তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তা আর কেহ বোঝে নি। আর কাকেই বা বলি? তাঁর দয়া বুঝতে গেলে অনেক তপস্যার দরকার। তোরা কেবল মুখে মা ঠাকরুণকে মানি বলিস! তাঁকে মানতে হলে তপস্যা করতে হয়, তবে তাঁর দয়া হয়; সেই দয়ায় তাঁকে বোঝা যায়। তখন তাঁকে মানি বললে সার্থক। তাঁকে মানা কি মুখের কথা?

তোমরা ত রাজ-হালে আছ, মা কত কষ্টে না দিন কাটিয়েছেন! সামান্য একটু স্থানে কত দিন কাটালেন, কেউ জানতে

পারতো না। কখন গঙ্গাস্নান করে যেতেন, কেউ টেরও পেত না। মাকে আদর্শ কর, আমার কাছে এলে কি হবে? সাক্ষাৎ মা রয়েছেন। আমি তাঁকে জানবার জন্য এখানে বসে আছি। বহু ভাগ্য যে মার উপদেশ পেয়েছ। মার মত বৈরাগ্য কোথায়? দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না, শেষে টের পাবে। এখন ধ্যান-জপ না করলে শেষে বুড়ো বয়সে মালা ঠক ঠক করলে কি হবে? কেবল বক বক করে বেড়ালে কি ধর্ম্ম হয়? এক স্থানে বসে ধ্যান-জপ কর। কর্ম্মই প্রধান।

মাকে আর বলবো কি? মা সব জানছেন। আমার দক্ষিণেশ্বরের সেই মা। মার দয়ার কি তুলনা আছে? মা কি আমাদের কাছ থেকে কিছু আশা করেন? কোন আশা নেই, কেবল এইটুকু তাঁর অহেতুকী দয়া—যদি সকাল-সন্ধ্যায় একটু নাম করে এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, সংসারের জ্বালা হতে রক্ষা পায়—তাই স্থান দেন। এই ছেলেটাকে দেখছো, কথা বলতে জানে না, কোথা বাড়ী তার ঠিক নেই—একেও কৃপা করলেন।

বেইমান হোস্ নি। তোরা ক্ষুদ্র জীব—মার উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই নেই, কেবল মুখে মা, মা করিস! অমন মাতৃ-ভক্তি আমি চাই না। তোদের মত মাতৃ-ভক্তি আমার নেই।

তুমি আমার কাছে এত দিন আছ, আমি এত লোককে চিঠি লিখি—তুমি ত জিজ্ঞাসা করতে পার, মাকে কেন লিখি না। কেন

লিখি না জান? মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানছেন। তাঁকে লোক-দেখান চিঠি লিখে কি হবে? যিনি আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন, তাঁকে চিঠি দেওয়ার কি দরকার? যারা বোঝে না, তাদের চিঠি দিতে হয়। যদি বেইমানি করি, তবে ভুগতে হবে।

দেখ, মার কত দয়া, যদি কেউ মার কাছে বলে—মা, আমি ডাক্তার হব, উকিল হব, মা বলেন—তা বেশ ত, তাই হয়ো। কেউ বিয়ে করবো বললেও মা প্রায় সম্মাত দেন। মা জানেন, ওর ভেতর-ভেতর ইচ্ছা আছে; বারণ করলে কি হবে?

আমি মার কথা যেখানে-সেখানে বলি না, ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলে থাকি। সকলে বুঝবে না, উল্টো বুঝবে, তাই। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়ীতে মা যখন থাকতেন তখন এক দিন যোগীন মহারাজ না থাকায় আমাকে বাজার করতে বলেন; আমি বলেছিলাম—আমার দ্বারা ও-সব হবে না, তোমাদের হাঙ্গামা পোয়াতে পারবো না; যাই, যোগীনকে ডেকে দিই গে। মা বললেন, গিয়ে কাজ নেই, থাক। এ রকম কত উৎপাত করতুম, মা কিন্তু কখনও বিরক্ত হতেন না। মার কি সহ্যগুণ, তাঁর তুলনা নেই! লোকে এত বিরক্ত করে, কিন্তু মা কখনও বিরক্তি দেখান না।

আমি যদি মার কাছে না গেলাম, আমার মা কি পর হয়ে যাবেন? মাকে কি মনে করি, জিজ্ঞাসা কচ্ছো?—তিনি মা লক্ষ্মী, আবার কখনও তিনি সীতা।

# ধ্যান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম

পূজোতে মনটা বসে গেলেই খুব হল। পূজো—তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়া। যে ভগবানকে ভোগ না দিয়ে খায়, সে চোর। শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পূজো করলেই সেখানে ঠাকুর থাকেন, তা না হলে তিনি পালিয়ে যান। পূজো, ধ্যান, জপ করলে হিংসা চলে যায়।···

সাধুরা ইচ্ছা করেন—শরীরটা ভাল থাকুক, বেশ ধ্যান-জপ করি। কিন্তু ধ্যান-জপ করা অতি শক্ত কাজ; একটা হুকুম মানবার ক্ষমতা নেই, ধ্যান-জপ করবে কি? ধ্যান-জপ করলে নিজের দোষটা বুঝতে পারা যায়, (এবং) পরের জন্য প্রাণ কাঁদে। যারা ধ্যান-জপ করবে, তারা রাত্রে কম খাবে। রাত্রিই ধ্যান-জপের প্রশস্ত সময়। কারণ তখন চারদিক নিস্তব্ধ থাকে। বেশী খেলে হাঁসফাঁস করে, মন ধ্যান-জপে ভাল বসে না।

ভগবানকে যে ভালবাসে, সেই ধন্য। মানুষ আজ ভালবাসবে, হয় ত কাল আবার ঘৃণা করবে। কারণ, মানুষের ভালবাসায় স্বার্থ আছে, কিন্তু ভগবানের ভালবাসায় স্বার্থের গন্ধমাত্র নেই। মানুষের নিরানব্বুইটা উপকার কর, কিন্তু একটা অপকার করলেই মানুষ ঘৃণা করবে। আর ঈশ্বরের নিকট নিরানব্বুইটা অপরাধ করে আর একটিবার ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করলেই তিনি আশ্রয় দেবেন।

পূজো কি জানিস? তাঁকে কি দেব, সবই তো তাঁর! ভাল ভাল জিনিস যা দিবি, তাঁর ছাড়া তো আর কারুর নয়। তবে ঠাকুর বলতেন—যেমন একজন বড়লোক তাঁর নিজের বাগানে গিয়ে বৈঠকখানায় বসে আছেন, মালী-টালী সব বাগানের কাজে ব্যস্ত আছে; এমন সময় দরোয়ান এসে বললে, 'বাবু, আপনার জন্য কাল থেকে একটি গাছপাকা পেঁপে তুলে রেখে দিয়েছি, আপনি নিন।' বাবু জানেন—বাগান তাঁর, গাছ তাঁর, পেঁপেও তাঁর; কিন্তু দরোয়ান যে শ্রদ্ধা করে পেঁপে রেখেছিল, বাবু কি দরোয়ানের সেই শ্রদ্ধা দেখবেন না? পূজো করাও যে সেই রকম!

তিনি (ঠাকুর) বলেছেন—কিছু খেয়ে-দেয়ে পূজো করলে কোন দোষ নেই। তা না হলে পেট চুঁই-চুঁই করবে, পূজো কেমন করে করবে? কেবল খাবার দিকে মন থাকবে। কিছু খেয়ে তারপর পূজোয় বসলে মনটা স্থির হয়।

বাইরে ভক্তি, ভিতরে কপটতা—এ ভারী খারাপ। ওখান থেকে ভগবান অনেক দূরে। এরা একটা-না-একটা স্বার্থ নিয়ে ভক্তি করে, তাই এদের কিছু উন্নতি হয় না; এজন্য তিনি (ঠাকুর) বলতেন, মন-মুখ এক করে ভক্তি করতে হয়, লোক-দেখান ভক্তিতে কিছু ফল হয় না। ও সব পাটোয়ারি বুদ্ধি; ওখান থেকে ভগবান অনেক দূরে। লোক-দেখান ভক্তি বেশীদিন থাকে না; সময়মত স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তাই যা করবে, ঠিক ঠিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত করবে। যে অমনি করে, সেই ঠিক ঠিক ভক্ত।

এখন আমার সেবা করতে কষ্ট হচ্ছে; শেষে একটা কথার জন্য তোরা কাঁদবি। শরীর চলে গেলে ছবিতে ফুল দিলে আর কি হবে? শরীর থাকতে থাকতে সেবা করলে তার কল্যাণ হবে।···

একদিন ঠাকুর প্রাতে শৌচে যাচ্ছিলেন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে; দেখলেন—পঞ্চবটীর তলায় বসে হরিশ ধ্যান কচ্ছে। ঠাকুর যেতে যেতে আপনার মনে গুন্ গুন্ করে বলতে লাগলেন, হরিশ, যার ধ্যান কচ্ছো, সে এক গাড়ু জলও পায় না! (জনৈক ভক্তের প্রতি)

সংসারই বল, আর ধর্ম্মই বল, শ্রদ্ধা ও প্রীতি না হলে কিছুই হয় না। উপরোধে কি কোন কাজ হয়? প্রীতি থাকলে আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না, ক্রমশঃ ভগবানে মন বসে যায়। প্রীতিই হলো প্রধান।

আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছে, এ জগতে আর কেউ নেই। এ ভাব হলে চিত্ত-শুদ্ধি হবে। একেই বলে ধ্যান।

যে হরষিত হয়ে তাঁর জিনিস তাঁকে দেয়, সে ভাগ্যবান পুরুষ—ভগবান তা গ্রহণ করেন। 'প্রীতিসে' না দিলে তিনি গ্রহণ করেন না। যার প্রীতি নেই—মলিন ভাব, তার পূজো কোন দিন গ্রহণ করেন না, জানবে।

## ত্যাগ ও বৈরাগ্য

যে ধর্মে যত ত্যাগী জন্মায়, সেই ধর্ম তত শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর-লাভ করতে হলে ঠিক ঠিক ত্যাগ চাই। ভগবান ত্যাগীকে খুব ভালবাসেন। ত্যাগের ভাব না এলে ভগবানলাভ হয় না। ত্যাগ বলতে গেলে—ধন, মান এসব ত ত্যাগ করতে হবেই, এমন কি দেহটাও—যা এত আদরের সামগ্রী, সে দেহটিকেও সময় সময় ভুলে যেতে হবে। ভোগের ইচ্ছা একটুও থাকলে ত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না। বাসনাপূর্ণ মন কখনও কি ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত ধারণা করতে পারে? যে মান চায়, তার কাছ হতে ভগবান বহু দূরে।

অভাব থাকলে মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকতে পারে না। কিন্তু মানুষের অভাবের সীমা নেই। অভাব-বোধ এমনি জিনিস, যত মনে করবে আমার অভাব আছে, ততই দেখবে অভাব বাড়বে! সেইজন্য যারা ভগবানকে পেতে চায়, তাদের নিবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত।

ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হতে গেলে অনেক হাজার জন্মের সাধনার দরকার। তারা কত জন্ম রাজত্ব করেছে, রাজ্যসুখ ভোগ করেছে, তবে বিতৃষ্ণা এসেছে—তারপর না সন্ন্যাসী হয়েছে!

সামান্য সুখভোগ, মান-যশ, টাকা-কড়ির জন্য লোক পাগল হয়। ঐ সকল লাভ করবার জন্য কত কু-মতলবই না করে। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে, তিনি কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য রাজত্ব পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলেন। আবার তপস্যা করতে করতে যখন সিদ্ধাই আসতে লাগল, তখন তিনি বললেন, তপস্যা না করেই রাজত্ব পেয়েছিলাম, এখন কি আবার তপস্যা করে ঐ সকল ভোগ করতে হবে? এই বলে তিনি সিদ্ধাই-টিদ্ধাই তাড়িয়ে দিলেন।

বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হতে পারলে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ভগবানলাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ করতে হয়। মুক্তি কটা লোকের হয়? রামপ্রসাদ বলেছেন, ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি। অর্থাৎ ভগবান নিজেই মুক্ত করে দেন, আবার নিজেই মুক্তপুরুষকে আদর করেন আর বাহবা দেন।

ভগবান বলেছেন, বিষয়-বাসনা ছাড়লে আমাকে পাবে—বিষয় পেতে হলে আমাকে পাবে না, দুই একসঙ্গে পাবে না।

কোন বিষয় জোর করে ত্যাগ হয় না।

ত্যাগ না হলে তাঁকে বুঝবার যো নেই।

যাঁরা ভগবানের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, ভগবান তাঁদের প্রতি বড়ই খুশী হন। তাঁদের আত্মা বড়ই সুখে থাকে। সংসারীরা

তাঁদের ঘৃণা করে, কিন্তু ভগবান খুব আদর করেন যে, আমার জন্য তোমরা সব ত্যাগ করেছ।

তোরা ত্যাগী ত্যাগী বলে অহঙ্কার করিস; কিসের তোরা ত্যাগী? তোদের কি আছে যে, ত্যাগ হবে? ত্যাগী ছিলেন—বুদ্ধদেব। তিনি রাজার ছেলে, কোনও অভাব ছিল না—তবু সত্য জানবার জন্য সব ত্যাগ করেছিলেন। ত্যাগের একমাত্র আদর্শ বুদ্ধদেব। এঁকেই ত্যাগী বলে। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে, সত্য সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন—সব শক্তির চেয়ে ধর্ম্মশক্তি বড়। ভগবানের জীবের প্রতি দয়া অপার। রাজত্ব-সুখের জন্য লোক ব্যস্ত হয়ে আছে; যদি আমার হুকুম মানে, এই কথা ভেবে বুদ্ধদেব রাজত্ব ছেড়ে দিলেন। নিজে কষ্ট করলেন জীবের জন্য।

সাধুর ত্যাগই শোভা, সংসারীর টাকাই শোভা। সাধু আর গৃহী কত তফাৎ! গৃহীরা মান-ইজ্জত নিয়ে পড়ে আছে, সাধু মান-ইজ্জত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তাই বলি, গৃহীর সাধুর কাছে সব সময় থাকতে নেই, তা হলে উভয়ের ভাব ভঙ্গ হতে পারে।···ত্যাগীর আশ্রয় নিলে জন্মজন্মান্তর সাধু হতেই হবে।

ছেলেদের কর্ম্মের কথা বললেই বৈরাগ্য (আলস্য) উপস্থিত হয়। জগতের সকলেই সুখ চায়, দুঃখ কেউ চায় না।

ছেলে সাধু হলে বাপ-মা যদি খুশী হয়, ছেলের যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হলো—এই কথা বুঝতে পারে, তা হলে বড়ই সুখের বিষয়। বুঝতে

পারে না, তাই এত গোলযোগ করে। ছেলে সাধু হলে বাপ-মার কত ভাগ্য! সাধু হলে সে সুখে থাকবে। আর যদি সেই ছেলেকে ধর্ম্ম-পথে বাধা দেয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের মঠের শোভা।··· যে ত্যাগীর আশ্রয় পেয়েছে, তার বহু ভাগ্য।··· সাধুর আশ্রয় পেলে কি হয়? বিবেক-বৈরাগ্য মনে পরিস্ফুট হয়, মন শুদ্ধ হয়।··· যার নিজের দুঃখ দূর হয় নি, সে আবার অন্যের দুঃখ কি করে দূর করবে?

অভাব থাকতে মানুষ ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকতে পারে না। মানুষের অভাবের সীমা নেই। মানুষ (কামনাপূর্ণ জীব) ভগবানকে ডাকবে কি? যার অভাব-বোধ দূর হয়েছে—সে-ই ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকতে পারে।

# বিশ্বাস, ভক্তি, সাধন ও সিদ্ধি

যদি কিছু কঠিন থাকে, তবে সেইটি ধর্ম্ম—ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না। একটা কড়া কথা বললেই ছোট হয়ে যায়, সেই মন নিয়ে কি ধর্ম্ম হয়? আজকাল লোকে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করছে, ও সব হুজুগে ধর্ম্ম। ঠিক ঠিক লোক কটা? কজন লোক ধর্ম্ম চায়? সকলেই হুজুগে ধর্ম্ম করে; তবে ভালর মন্দটাও ভাল, এই পর্য্যন্ত।··· স্কুলে যেমন মাষ্টারের কথা না মানলে লেখাপড়া হয় না, তেমনি যে ধর্ম্ম জানে, তার কথা না মানলে ধর্ম্ম হয় না। ফাঁকি দিলে ধর্ম্ম হয় না। রামপ্রসাদ বলেছেন—

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে<br>
শ্যামা মাকে পাবে।<br>
এ ছেলের হাতে মোয়া নয় যে,<br>
ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥<br>
সাতগেঁয়ে আর মাম্‌দোবাজি<br>
কেবা কারে ফাঁকি দিবে।<br>
সে যে কড়ার কড়া তস্য কড়া<br>
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥

তুমি ভগবানকে ফাঁকি দেবে কি? তিনি তোমার চেয়েও চালাক।

যে সাধন-ভজন করবে তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না; সে নিজের কাজ নিজেই করে যাবে। যে সাধন-ভজন করে, তার মেজাজই আলাদা।

ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে যে-কোন একটা জোর করে ধরে থাকতে হয়। ভগবানলাভ করতে হলে একনিষ্ঠ হতে হয়।

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

হনুমানের মত এইরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা চাই।

মনের মত পাজি জিনিস আর নেই। কত রকম সংশয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। ভগবানের নাম করতে করতে মান-যশের আকাঙ্ক্ষা চলে যায়—চিত্ত শুদ্ধ হয়।

হাজার হাজার ধর্ম্মকথা জানার চেয়ে, বলার চেয়ে, লোককে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ভগবানকে ডাকা ভাল।

ধর্ম্ম কি ইন্দ্রিয়সুখ যে, হাতে হাতে ফল লাভ হবে? ধর্ম্মলাভ সময়সাপেক্ষ; সৎপথে থেকে, ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়।

ক্ষিদে হলে সব জিনিস মিষ্টি লাগে—তখন যা জুটল, সব ভরপেট খেলে। ক্ষুধাই হল প্রধান; তেমনি যার ভগবানের উপর অনুরাগ হয়েছে, সে অত মত-পথ বিচার করে না। সে যে-কোন পথ অবলম্বন করে তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়। ভগবানে অনুরাগ, বিশ্বাসই হল তাঁকে লাভ করবার প্রধান উপায়।

ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব-স্তুতি করতেন, তাই তিনি তাদের জানিয়ে

দিলেন, "আমি ভগবান।" কিন্তু ব্রজবালকগণ তাঁর সঙ্গে কত খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ করলে, তবুও তাঁকে জানতে পারলে না। তাঁকে জানতে হলে সাধন-ভজন, স্তব-স্তুতি করতে হয়। এইরূপে লেগে পড়ে থাকলে তিনি দেখা দেন, সব বুঝিয়ে দেন। যতই ঘোর-ফের না কেন, দেখবে কোথাও কিছু নেই, কেবল কর্ম্মভোগ। এক জায়গায় বসে মন স্থির করে ডাকলেই হয়ে যাবে।

গুরুবাক্যে সংশয় করলে কখনও ধর্ম্ম হয় না। এক জনের উপর নির্ভর করা কি কম কথা? সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে চলতে হবে—তবেই মঙ্গল।

চরিত্রহীন হলে কি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা যায়? ভগবান বলছেন—হে জীব, সৎ হও, পবিত্র হও, চরিত্রবান হও, তবে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। চরিত্রহীন হলে শাস্ত্রপুরাণাদির কথা বুঝতে পারা যায় না। সেই জন্য লোকে ও-সব গল্প-গুজব মনে করে। সাধন-ভজন-তপস্যাদি করলে ঐ সকলই আবার সত্য বলে মনে হবে।

যে ঠিক ঠিক সাধু হবে, তার কোন স্বার্থ থাকবে না। ভগবানের প্রতি কি করে ভক্তি-শ্রদ্ধা হবে, এইটুকুমাত্র স্বার্থ তার মধ্যে থাকে। সংসারের ঝঞ্ঝাট তার ভাল লাগে না, শান্তি পাবার জন্যই সাধু হয়।

যার ধর্ম্ম-ভয় আছে, ভগবানকে ভয় করে, সে ত সৎলোক। কটা লোক এরূপ হয়?

## বিশ্বাস, ভক্তি, সাধন ও সিদ্ধি

বরাবর গুরুর উপর, সাধুর উপর, ঠাকুরের উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকা কঠিন। যার থাকে, সেই ভাগ্যবান পুরুষ। তার উপর ভগবানের খুব দয়া বলতে হবে।

ভিক্ষা করে খাওয়ার উদ্দেশ্য কি? মান-অপমান, লোকলজ্জা সব কাক-বিষ্ঠার মত ত্যাগ করতে হবে বলে। ভিক্ষুকের আর ও-সবের ধার ধারতে হয় না। ভিক্ষা করে খেয়ে ভগবানের নাম কর, তা হলে তাঁর দয়া হবে। ( সন্ন্যাসীর প্রতি )

এ জগতে সুখ নেই, সব মিথ্যা—একমাত্র ভগবানই সার। এ সব কথা কি সকলে বুঝতে পারে? ভগবানের বিশেষ দয়া না হলে এ সকল কথা ধরা যায় না।

গুরু আর ইষ্ট এক; এই একই আবার লীলাতে বহু—ইনিই ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি, জীব ও জগৎ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অজ্ঞানবশতঃ ভেদবুদ্ধি আসে। তজ্জন্য গুরু এবং বেদান্তবাক্যে খুব বিশ্বাস রেখে সাধন-ভজন ও বিচার করতে হয়। গুরু আর ইষ্টে খুব নিষ্ঠা চাই। ক্রমে ক্রমে সব অভেদ উপলব্ধি হবে—দেখবে, তিনি সর্ব্বঘটে আছেন।

শাস্ত্রে ত বড় বড় কথা আছে, তাতে হবে কি? জীবনে প্রতিপন্ন করা চাই;—এই সাধনা।

খালি মন্ত্র নিলে কি হবে? মন্ত্র নিয়ে গুরুর উপদেশমত কাজ করতে হয়, তবে ত গুরুর মাহমা বোঝা যায়!

যতদিন ভগবান সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন ঠকান-বুদ্ধি যায় না।

তিনি বলতেন, খাবার সংস্থান থাকলে জুয়োচুরি প্রবঞ্চনা না করে দুটো খাও দাও, তাঁর নাম কর। তাতে আত্মা সুখে থাকে।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি—এই চার সময়ের মধ্যে যে সময় ইচ্ছা, নিয়মিতরূপে ধ্যান-জপ করা উচিত। তা হলে তাড়াতাড়ি সাধনে উন্নতি হয়। ( সাধন-ইঙ্গিত )

ভগবান চাই-ই। এই জগতের কর্ত্তাকে যদি না পেলাম তবে জন্ম বৃথা। প্রহ্লাদের পবিত্র অহৈতুক বৈরাগ্য। কারুর 'হেতুসে' বৈরাগ্য হয়; তাও ভাল। যে কোন কারণে ভগবানকে ডাকতে পারলেই হলো।

ভাগবত-শাস্ত্রাদি শুনে সেইমত কাজ করবার চেষ্টা করে ত জীবের কল্যাণ হবেই।

ভগবানে দৃঢ় ভক্তি চাই। সংসারে ত সুখ-দুঃখ আছেই—ঐ দিক না ভুললেই সব দিক মঙ্গল।

ফুসমন্ত্রে কি হবে? একটা মন্ত্র বৈ ত নয়। সেই মন্ত্রের উপর বিশ্বাস না হলে ভগবানকে কোনকালে দেখা যায় না। তাঁর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হওয়া—এ কি কম? বাপ-মাকে দেখেই ভক্তি হয় না!

এঁরা সাধু, ভিক্ষের কোন ঠিক নেই, অথচ ৺তিলভাণ্ডেশ্বরের

কি সেবা করছে, দেখলে অবাক হতে হয়! ভোর চারটেয় উঠে এই দারুণ শীতে গঙ্গাস্নান, পূজাপাঠ করে, আবার সন্ধ্যার সময় স্নান করে আরতি আদি করে—এ কি কম কথা? আমি ত পারি না। ঠিক ঠিক ভক্তি থাকলে এই রকমই হয়। ঠাকুর-দেবতার সেবা করা ভাগ্য বৈ কি। যাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেন, সে মহাভাগ্যবান; কিন্তু সকলে তা বুঝতে পারে না;—অনেক সময় পয়সার দিকে নজর থাকে। তখন ঠাকুর-সেবা ভুলে গিয়ে—ভক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করে কেবল 'হা পয়সা, হা পয়সা' করে। তাই ত এত দুঃখ পায়।—তিলভাণ্ডেশ্বরের সাধুদের বেশ লাগে, ঠিক ঠিক সাধু হলে এমনি হয়।

মন বড়ই চঞ্চল, পাজি; ক্রমাগত এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। খুব নজর রাখতে হয় মনটা কোথায় দৌড়ুচ্ছে। এ জন্য ধ্যান-ধারণা, সাধুসঙ্গ খুব দরকার। তা হলে মন স্থির হয়। মন স্থির না হলে কোন কাজ হয় না। (সাধন-ইঙ্গিত)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে যাচ্ছেন, কুন্তী বললেন, 'হে কৃষ্ণ, আমার রাজত্ব চাই না, দুঃখ দাও। যদি দুঃখ পাই, তবে সর্ব্বদা স্মরণ হবে ও তোমায় দেখতে পাব। রাজত্ব-সুখে তোমায় ভুলিয়ে রাখে।' দুঃখের সময় সকলেরই ভগবানকে মনে পড়ে!

শুধু বই পড়লে কি হয়? ত্যাগ-তপস্যা করে তাঁকে লাভ কর।

গৃহস্থের কাছে সাধু খুব সাবধান হয়ে থাকবে। এমন ভাবে থাকবে—যাতে গৃহস্থের সাধুর উপর কখনও কোন সংশয় না হয়। সাধুর খুব সাধন-ভজন করা উচিত। তাদের এরূপ করতে দেখলে গৃহস্থের কোন-না-কোন দিন মনে হবে—এরা ভগবানলাভের জন্য কত পরিশ্রম কচ্ছে, আর আমিই বা কি কচ্ছি? সাধুদের দেখে যদি তার ক্ষণিকের জন্যও একটু হুঁশ হয়, ভগবানের দিকে মন যায়, তা হলে তার কল্যাণ হবেই।

বাবুরই বাগানের জিনিস। মালী তার কাছে ঐ সব অতি যত্ন করে নিয়ে গিয়ে দেয়। মালীর ওটা দাস্যভাব। সংসারের সব জিনিসই ভগবানের, আমরা যে তাঁর মালী। তুমি প্রভু, আমি দাস, এইরূপ ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস-সম্পন্ন হয়ে তাঁর জিনিস তাঁকেই ভক্তি করে অর্পণ করাকে দাস্যভক্তি বলে।

তোমরা রামায়ণ-মহাভারত পড়, যেমন লোকে ইতিহাস পড়ে থাকে। আর এই আট বছরের ছেলে বিমলকে দেখ, রামায়ণ পড়ছে আর হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমায় বলে—'দেখুন মহারাজ, রামের রাজত্বে আমি ছিলাম হনুমান, না মহারাজ?' আমি দেখে আশ্চর্য্য! ও কি বুঝেছে ওই জানে!

রামচন্দ্র হলেন ভগবান। তাঁর সঙ্গে কি জীবের তুলনা হয়? জীব তাঁকে সব সমর্পণ করবে। যতটুক দেবে, ততটুক পাবে। এক আনা দাও, এক আনা পাবে, চার আনা দাও, চার আনা পাবে, ষোল আনা দাও, ষোল আনাই লাভ হবে।

যার মা বলে—ভগবানলাভ কর, জগৎ মিথ্যা, সে মুক্ত মা। বাপ-মা নিজেই সংসারের দুঃখভোগ করছে, আবার ছেলেদের দুঃখভোগ করায়। যে বাপ-মা ভাগ্যবান, তারা ছেলেকে স্পষ্ট বলে যে, বিয়ে করলেই দুঃখ—সংসারে কত জ্বালা দেখতেই পাচ্ছ; তুমি বুঝে বিয়ে কর। সেই বাপ-মা মুক্ত। সকলেই যদি এ রকম বুঝতো, তা হলে আর ভাবনা কি ছিল। বুঝে না, তাই গোলযোগ হয়।

যে পরকাল মানে না, সে আবার ধর্ম্ম করবে কি? সে ত নাস্তিক, অবিশ্বাসী হবেই। পরকাল আছে বলেই ত দান-ধ্যান করে। যে পরকাল মানে, সে ত ধার্ম্মিক।

কোন পর্ব্বে অথবা তাঁর (ঠাকুরের) উৎসবে ভাল ভাল জিনিস ভোগ দিতে হয়। তোরা বলবি—টাকা কোথায়? এত খরচ হচ্ছে সে সময় জোটে, আর সৎকাজে টাকা জোটে না! তখন তোদের সব খরচের দিকে নজর পড়ে। তোরা মুখে ঠাকুর-ঠাকুর করিস, জনে জনে সব ছবি রাখিস, আর কেবল নকল—এই ত তোদের ভক্তি! আমার অমন ভক্তি নেই। তোদের ঠাকুর চিরকালই কাঁচের ছবির মধ্যে থাকবে। শালারা সব বাহ্যিক ভক্তি দেখাচ্ছে!

৺বিশ্বনাথকে যা মনে কর, তাই। পাথর মনে কর, পাথর হবে; আর ভগবান মনে কর, তা'হলে ভগবান হবে। মোট কথা, কপটতা করো না। তোমাদের মনে অসরল ভাব আছে বলে কোন ফল হয় না। ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস করলে নিশ্চয়ই কল্যাণ হয়।

যে ভগবানকে চাইবে, তার হৈচৈ বা গুলতোনি করা ভাল লাগবে না।

খামকা মন খারাপ করিস কেন? এই মনকে ভাল করতে কত তপস্যা করতে হয়; আর তোরা যখন-তখন একটা গোলমালের সৃষ্টি করে মন খারাপ করে বসিস। মনকে দুর্ব্বল করা বড় খারাপ। মনে খুব জোর আনবি। যার ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে, তার সংসারের দুঃখ-কষ্টে মন বিচলিত হয় না। (সাধন-ইঙ্গিত)

এ জগতের জিনিস ভোগ করার তপস্যা চাই বৈ কি। তপস্যা ভিন্ন হয় না, এ তো প্রায়ই দেখা যায়।

## কাম-কাঞ্চন

দুনিয়ার লোক কামিনী আর কাঞ্চন নিয়েই ব্যস্ত।

মানুষ কি আহাম্মক! মানহানির জন্য আদালতে নালিশ করে, কত টাকা খরচ করে, কিন্তু গরীব লোক গেলে কিছু দেয় না।

খাওয়া-পরার কষ্ট না হলেই হল। অর্থ বেশী হলে ভগবানের স্মরণ-মননে বাধা উপস্থিত হয়। দু-চার জন এমন ভাগ্যবানও থাকেন— যাঁরা বুঝতে পারেন, অর্থই অনর্থ ঘটায়। আর পরিবার বল, ভাই বল, বন্ধু বল, অর্থ দিয়ে কিছুতেই তাদের মন যোগাতে পারবে না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

যেখানে মেয়েদের ব্যাপার, সেইখানেই গোলমাল। সেইজন্য সাধু, ভক্ত—যারা ভগবানলাভ করতে চায়, ঐ সব থেকে দূরে থাকবে।

অর্থের দ্বারা ভগবানলাভ হয় না—ঘর-বাড়ী হয়, যাগযজ্ঞ হয়। ভগবান হলেন প্রাণের জিনিস। জমীন, জরু, রূপেয়া—এই তিনটি হল বন্ধনের কারণ। এ তিনটি না ছাড়লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

কামিনী-কাঞ্চন—এ দুটি ভয়ানক বন্ধনের কারণ, সংশয় আনে। পার্থিব ভালবাসার কথা ছেড়ে দাও, এ দুটি ভগবানের পথে যেতে দেয় না; যেখানে থাকে—বিবাদ করায়। যে এ দুটি ফেলে দিতে পারে, সে জীবন্মুক্ত। এও মায়ার খেলা।

সৎকাজ যে করে, সে সৎলোক বৈ কি। বিশেষ, টাকার মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন। যার অর্থ আছে সে যদি গরীব-দুঃখীকে না দেয় তা হলে ভগবানের কাছে দোষী। যার অর্থ নেই তাকেই সাহায্য করা উচিত।

মানুষ বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্রতে আসক্ত হয়ে যায়। ভগবান ত ছেলে-স্ত্রী ফেলে দিতে বলছেন না, তবে আসক্ত হওয়া খারাপ। আসক্ত হলেই কষ্ট পাবে।

ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিলে কি হবে? একটু সংযম নেই; বছর বছর ছেলে-মেয়ের বাপ হচ্ছে, এ দিকে বাইরে বড় ভালমানুষ—যেন কিছুই জানে না। এদের কি কোন কালে ধর্ম্ম হয় রে?

বেশ্যারা সব সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকে, আর যে-কেউ কাছ দিয়ে যায়, তার ওপর মায়া ঢেলে দিতে চেষ্টা করে। তাদের বদ্-মায়া ইন্দ্রিয় চঞ্চল করে দেয়। ওদের মোহিনী শক্তি—পুরুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আছে। ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়।

দুনিয়ায় টাকাই এক আত্মীয় রে! টাকার জন্য লোকে সব করতে পারে। ছেলে বাপের গলায় ছুরি লাগায়—এমনি টাকার মায়া! সব আত্মীয়-স্বজন, এমন কি নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত—ঐ টাকার কাছে সবাই ছোট। ঐখানে গোলমাল হলে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটে যায়। আজকাল লোকে ভগবানের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে টাকার উপাসনা করে। দিনরাত কেবল টাকা! টাকা! ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ঐ।

মহেন্দ্র মাষ্টার, রাম বাবু, দেবেন বাবু—এঁরা তাঁর হুকুমে সংসার করেছিলেন। ইটিলী মহাপবিত্র স্থান। দেবেন বাবু বেশ কথা বলেছিলেন, আমাকে বলতেন—ভিরকুটবীচি পেটে গেলেই উল্টো বুদ্ধি হয়ে যায়। আমি প্রথম বুঝতে পারি নি। মনে করতুম, ভিরকুটবীচি কি বলে? তারপর জিজ্ঞাসা করায় বললেন, যতদিন খাবার না থাকে, টাকা-পয়সা না থাকে, ততদিন ভগবানে মন থাকে। আর যেই দুটো খাবার সংস্থান হয়ে গেল, আর ভগবানকে মনে নেই। তাই বলতেন—ভিরকুটবীচি (অর্থাৎ চাল)। দেবেন বাবুর কত কষ্ট ছিল, পয়সা ছিল না। তারপর পরের চাকরী করতে হতো।

দেখ, স্ত্রীলোক থেকে সাবধান। দেখেছি অনেক বড বড় সাধুর স্ত্রীলোকের পাল্লায় পতন হয়েছে। ওরা প্রথম নানারকম ধর্ম্মভাব দেখিয়ে শেষে সাধুর সর্ব্বনাশ করে। ঠাকুর তাই বলতেন—ভক্তিমতী সৎ স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করবে না। তোমার অল্প বয়স ও ভাল চেহারা, তাই বলছি, 'স্ত্রীলোক—সাবধান।'

মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর—একটু কাম, ক্রোধ আদি হবে বৈ কি। তার মধ্যে ঘৃণা করবার কিছু নেই। ওটা শরীরের ধর্ম্ম—স্বভাবের কর্ম্ম।

গৃহস্থেরা সাধুকে এমনি বেশ ভক্তি দেখায়, এমন-কি কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু টাকার কথা বললেই তাদের সব ভক্তি ছুটে যায়। তিনি (ঠাকুর) বলতেন—ঐ জায়গায় ভক্তের পরীক্ষা, গৃহস্থদের ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি আছে কিনা বুঝা যায়। যারা ভগবানের জন্য অকাতরে পয়সা খরচ করে, মনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ আনে না, তারাই ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের আসল ভক্তি। গৃহস্থদের পয়সার উপর মোহ। মুখে 'ধর্ম্ম, ভগবান' এ রকম অনেক বড় বড় কথা বলবে, আর ঠাকুরের নামে হয়ত কেঁদে ভাসিয়ে দেবে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠিত হয়।

মেয়েদের মধ্যে ছ'টা রিপু কিল-বিল করে খেলছে। জীব তাই দেখে মুগ্ধ হয়। সাবধান, একবার মায়া ফেললে আর উপায় নেই। ওরা মায়া চেলে দেয়। এই জন্য খুব সাবধান থাকতে হয়।

যদি ভেতরে জ্বর থাকে, তা হলে যা মুখে দেওয়া যায় তাই তেতো লাগে; নাড়ু, সন্দেশ কিছুই ভাল লাগে না। সেইরকম, লোকের ভেতরে রয়েছে কাম (বিষয়ভোগেচ্ছা); কাজেই জপ, তপ, প্রার্থনা সকলই তেতো লাগে। যখন ভেতরে জ্বর থাকে না, তখন সকলই মিষ্টি লাগে—জপ-তপে খুব মন বসে, মায়া আর বিক্ষেপ ঘটাতে পারে না।

হাজার জ্যোতিঃ দেখ, ব্রহ্মচর্য্য না রাখলে কিছুই হবার যো নেই।

আজকাল ভদ্র, অভদ্র নেই। অর্থই হলো সংসারের মূলাধার। যার অর্থ আছে, সেই বড় লোক (ভদ্র); যার অর্থ নেই, সেই গরীব (অভদ্র)।

ভগবান চান পবিত্র জীবন। জীবন সকলেরই সমান। তবে যার পবিত্র জীবন, ভগবান তাকে ভালবাসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'যার হৃদয় শুদ্ধ, সেখানে আমি প্রকাশ থাকি। ভগবান কোথায়? লোকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমি কিন্তু তার হৃদয়েই রয়েছি। সেখানে বজ্জাতি, অসদ্বুদ্ধি থাকে, তাই আমাকে দেখতে পায় না।'

বিয়ে করা নয় ত দুঃখ ডেকে আনা। কোন মুরোদ নেই, ঘর-বাড়ী নেই, সামান্য চাকুরে—তাও কখন থাকে, কখন যায়, এই অবস্থা; তাতে কোন্ সাহসে লোক বিয়ে করে? এই কর্ম্মফল।

টাকা ও যৌবন—এ দুটি কম নয়। যে এদের হাত থেকে পার হয়, তার উপর ভগবানের খুব দয়া, সে-ই ভব-সমুদ্র অনায়াসে পার হতে পারে।

# সদ্‌গুরু ও শিষ্য

এ জগতে ঠিক ঠিক গুরুও দুর্লভ, শিষ্য মেলাও দুর্লভ। যে শিষ্য গুরুবাক্য পালন করে, তার সংসারে কেউ শত্রু থাকে না। ভগবান তার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন। সে একদিন-না-একদিন ভগবানকে বুঝতে পারবে।

ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেন। যে শিষ্য টাকাকড়ি, মান-যশ চায়, তাদের কখন সদ্‌গুরুলাভ হয় না। যারা ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে, তারা সৎলোকের নিকট সাংসারিক কোন সুখের আশা না থাকলেও যায়। ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যের সংস্কার, মনের গতি, পূর্ব্বের কর্ম্ম ( ইত্যাদি ) বিচার করে কথা বলেন—যাতে তার উপকার হয়। সেইজন্য যার-তার কথা শুনে নাচতে নেই। এ এটা বললে, সে সেটা বললে—সকলের কথা শুনে নেচে এ ধারও হয় না, ও ধারও হয় না।

সদ্‌গুরুলাভ মহাভাগ্যের কথা—ভগবানের কৃপা চাই! সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে সদ্গতি হয়। ··· ত্যাগীর নিকট দীক্ষা নিতে হয়।

ধর্ম্ম সকলের হয় না। কেন না, গুরুর আজ্ঞাধীন থেকে তাঁর উপদেশ পালন করে জীবনযাপন করতে কটা লোক চায়? সকলেই স্বাধীন হতে চায়, অধীন হতে চায় না।

যিনি সৎ-গুরু তিনি ইষ্টের উপর ভক্তি-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন।

গুরু শিষ্যের খুব গুণ থাকলেও দোষ ধরেন; বাপ ছেলের গুণ থাকলেও দোষ ধরেন। কেন জান?—তার দোষটি দূর করবার জন্য (অর্থাৎ তাকে নির্দ্দোষ করবার জন্য)। যাতে আরও ভাল হয়, তাই তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা। তাই দোষ দেখিয়ে দেন।

অদ্বৈত-বুদ্ধি এলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। আমার গুরু বড়, তোমার গুরু ছোট বলে ঝগড়া-বিবাদ থাকে না। যত গোলমাল অদ্বৈতভাব না হওয়া পর্য্যন্ত। অদ্বৈতভাব এলে দেখা যায় যে, তোমার গুরু আমার গুরু এক। ভিন্ন রূপ মাত্র। ··· শুকদেবকে জনক বলেছিলেন, শেষে আর গুরু-শিষ্যভাব থাকবে না। তাই দীক্ষা-উপদেশের পূর্ব্বেই দক্ষিণা দাও।

সৎকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, অসৎকে যে গ্রহণ করে তারেই বলিহারি যাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার—এঁরা সব পরমহংসদেবকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এঁরা কেউ মূর্খ নন, সকলেই পণ্ডিত। কিছু-না-কিছু একটা বুঝেছেন, তবে ত মানেন। গুণ না থাকলে মানবে কেন? একদিন না হয় দুদিন জোর মানবে, কিন্তু তারপর ভক্তি-বিশ্বাস সব পালিয়ে যাবে।

হয় খুব মূর্খ, নয় খুব পণ্ডিত হওয়া ভাল। মাঝামাঝি হলেই যত গোল বাধে। স্বামীজী বলতো—যা পড়েছি, তা ভুলে গেলেই ভাল হয়। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা নিয়ে খুব তর্ক করতো। আগে বুঝতে পারে নি। শেষে বলেছিল—উনি যা বলতেন, সবই ঠিক। স্বামীজী সংশয় তুলে তর্ক করলে ঠাকুর কিন্তু খুব খুশী হতেন। তিনি বার বার বুঝিয়ে দিতেন—কখনও বিরক্ত হতেন না। ঠিক ঠিক গুরু এমনি হয়।

ঠিক ঠিক মাষ্টার ( শিক্ষক ) ভেতরে ভালবাসবে, বাইরে একটু কড়া হবে।

কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ পালন ও ভিক্ষা করে গুরুর সেবা করবে। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর কৃপাতে অচিরে শান্তি পাওয়া যায়, সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সেবা করা কি কম কথা রে? সেবাতে ভগবান পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন—আর মানুষ ত হবেই।

আমি কি তোদের হাতে খেলনার পুতুলের মত থাকবো, তোরা যেমন নাচাবি, তেমনি নাচবো? তা আমার দ্বারা হবে না। আহা! কত লোক ভগবদ্‌বিষয়ে আলোচনা করতে আসে, ঠাকুরের কথা শুনতে আসে! তাদের আসতে বারণ করবো? তাদের এই শুভ-ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে পারবো না। দেহ ত আজ না হয় দুদিন পরে যাবেই, তার জন্য ঈশ্বরীয় কথা ছেড়ে শরীরের যত্ন করবো? দুঃখ করিস নি, তা আমি পারবো না।

চৈতন্যদেব অত বড় ত্যাগী—ভগবান। লোকে অবতার বলে তাঁকে পূজো করে। তিনি কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন। পরমহংসদেব তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন। দেখ, অবতারপুরুষরাও গুরুকরণ করেছেন। গুরুকরণ শাস্ত্রের বিধান। সকলের গুরু করা উচিত। আবার দেখ, ঠাকুরের কি গুরুনিষ্ঠা, কি গুরুভক্তি! গুরুকে কত সম্মান করতেন—কখন ভুলেও তোতাপুরীর নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না, ন্যাংটা বলতেন!

দুই-তিন জন্ম রাজত্বের পর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হয়। অনেক সাধুকে দেখা যায়—বেশ ভজন করছে, কিন্তু দিন কতক পরে সে মঠ-ফঠ করে এক জন হয়ে পড়েছে। আবার গুরুর কৃপা হলে সহজও বটে।

সাধুর শিষ্য হওয়া ভাগ্য বৈ কি। সে তাঁর (গুরুর) কিছু কিছু গুণ অর্থাৎ দয়া-ধর্ম্ম পাবেই। সাধুকে ভালবাসলে কি হয় জানিস?—সাধুই হয়।

এ জগতে গুরু হওয়া বড়ই কঠিন। গুরু মন্ত্র দিলে শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রল; কিন্তু গুরু যদি সেরূপ উপযুক্ত না হয়, তা হলে তাঁর উপরওয়ালা এক জন আছেন, তিনি সব জানেন। তাঁর অগোচর কিছুই নেই। তিনি গুরু-রূপে অন্তরে উদয় হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

সাধু ও গুরুর নিন্দা করলে অকল্যাণ হবেই। গুরু সকলেরই সমান—রাজারও যেমন, ফকিরেরও তেমন। যার যে গুরু, তার কাছে সে

প্রধান। তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর—তাঁর উপর সংশয় করা উচিত নয়। হে জীব, আপন গুরুকে মান। গুরুর নিন্দা করো না।

সাধু হয়ে কারুর অকল্যাণ মানতে নেই। সকলেই তাঁর সন্তান। পরস্পর সদ্ভাব না থাকার জন্য এই দুঃখ, সেই জন্য কষ্ট পাচ্ছে। যে 'গুরুসে' ভগবানলাভ হয়, শান্তি হয়, আত্মা সুখে থাকে, সে কি কম গুরু? মানে না, তাই দুঃখ হয়। আবার দেখ, গুরু ভগবান ছাড়া হতে পারে না; কেন না, শিষ্যের কি দরকার, তা না জেনে শিষ্যকে ভিন্ন পথে চালিত করলে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হয়। ভগবান সব জানেন, তিনিই ঠিক পথে চালাতে পারেন। গুরু—সচ্চিদানন্দ।

কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুরকে ( রামকৃষ্ণদেবকে ) আপনার কি মনে হয়? আমি বললাম—তিনি সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ ছিলেন। আর কি ছিলেন? এই জবাবে তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, আর বলছেন যে, আমি truth ( ঠিক ) বলছি না। দশ অবতারের মধ্যে কি তিনি আছেন? না, শাস্ত্রে অন্য কোন অবতারের কথা বলছে? এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন একটু বিরক্তির সহিত বললাম যে, আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি যা বলবো, তাই আপনার কি বিশ্বাস হবে? আপনার যা মনে হয়, আপনি সেই ভাবেই তাঁকে মানুন। দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁর জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি। আমি জানি—তিনি ছাড়া আর আমার গতি নেই।

ত্যাগীর কাছে মন্ত্র নিয়ে একটুও যদি ধ্যান-জপ করে, তা হলে তার

কিছু ফল হবেই। কুলগুরুরা ভগবানেরই নাম দেয়, নামে কোন দোষ নেই; তাদের নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন করলে বস্তুলাভ হবেই। কিন্তু ওদের জীবনে ত্যাগ নেই, তাই শীঘ্র উন্নতি হয় না। সাধকের কাছে মন্ত্র নিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। ·· কুলগুরুকে ত্যাগ করতে নেই। ওরা কিছু আশা করে, তাই ওদের কিছু দেওয়া উচিত।

সাধন-ভজনের উপদেশ যার-তার কাছে নিলে অনিষ্ট হতে পারে। গুরু—যিনি শিষ্যের ভাব জানেন বা জানতে পারেন, তাঁর কাছে উপদেশ নিলে কল্যাণ হয়। নচেৎ ভাব নষ্ট হতে পারে।

## মায়া ও অবিদ্যা

ধন, মান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে ভগবানের উপর মন রাখা কি সহজ কথা? ঈশ্বর হতে যে-কোন জিনিস আমাদের পৃথক করে, তাই মায়া। মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে ভগবানের কৃপালাভ হয় না; সাধন-ভজন ও গুরু-কৃপা ব্যতীত এই মায়া কাটাতে পারা যায় না।

অসৎ-মায়া কেমন?—ভগবান মিথ্যা, জগৎ সত্য বলে মনে হওয়া। অসৎ-মায়াতে জীব কষ্ট পায়। মায়া দু রকম—সৎ ও অসৎ। সৎ-মায়া কেমন? জগৎ মিথ্যা, ভগবান সত্য—তাঁকে সত্য-স্বরূপ বলে বোধ হওয়া, কি করে ভগবানের স্মরণ-মনন করবে, কি করে তাঁর পূজা করবে, এই চিন্তা হওয়া।

## মায়া ও অবিদ্যা

নিজের মায়া নিয়েই মানুষ অস্থির, আবার পরের মায়া জড়াতে চায়। (অর্থাৎ নিজের বিষয়-ব্যাপার নিয়েই মানুষ ব্যস্ত, তার উপর অন্যের বিষয়-ব্যাপারে অনধিকার-চর্চ্চা দ্বারা বৃথা জড়িত হওয়া অনুচিত )।

উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে ডাকা, কিন্তু মান-সম্ভ্রম পেয়ে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, এই তাঁর মায়া।

মান-সম্ভ্রমের জন্য জীব কি না কচ্ছে—খবরের কাগজে নাম দিচ্ছে। যে জানে এসব কিছু নয়—মিথ্যা, সব মায়ার খেলা, সে ভাগ্যবান।

দেহ-মনের সুখ-দুঃখ ত আছেই, তবুও জীব তাঁকে দুঃখ জানায় না। তাঁকে দুঃখ জানালে ত্রিতাপ দূর হয়।

মায়া এমনি জিনিস যে, সত্যকে মিথ্যা বলে বোধ হয়, আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ হয়। সবই মায়ার খেলা।

কার ইচ্ছা নয় যে সুখে থাকে? সুখে থাকবার জন্যই ত কত ফন্দি, মতলব আঁটছে। ফন্দি করলে দুঃখ পাবে। এও এক ভগবানের মায়া। ভগবানের মায়া বোঝা কঠিন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'যে আমার মায়া চায়, সেই দুঃখ পাবে; আমার মায়ায় ভুলো না। আর যে আমাকে চায় সে সুখে

থাকবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কত রকম খেলা আছে। আবার বলেছেন —'যদি আমাকে ভগবান বলে মনে কর, তা হলে বেঁচে যাবে; তা না হলে নানারকম সংশয়ে দুঃখ পাবে।'

(জনৈক) গুরুভাইকে বললাম—"তোমার শরীর অসুস্থ বলে কাশীতে এসেছ; শরীর ভাল হয়ে আসছে, আরও কিছুদিন ৺বিশ্বনাথের দরবারে থাক।" তিনি বললেন—"ভাই, তা হলে মঠ চলবে না, সব গোলমাল হয়ে যাবে।" এখন দেখছো ত, সে চলে গেল, মঠ কি চলছে না? কারুর জন্য কি কোন কাজ আটকায়? যার কাজ, সে করিয়ে নেয়। এক জন গেলে আর এক জনকে করতে হয়। স্বামীজী চলে গেল—কই, তাতে ত মঠ-ফঠ ভেঙ্গে গেল না? ঐ রকম হওয়াটা মায়া।

ভগবান তোমাকে ছেলে দিয়েছেন, ভাল কথা। যাতে ভগবানের কৃপায় বেঁচে থাকে, সেই জন্য প্রার্থনা করতে পার। 'আমার আমার' করতে গেলেই দুঃখ পাবে। কিন্তু যদি ভগবানের সন্তান— এরূপ বোধ থাকে, তা হলে সে মরে গেলেও কোন দুঃখ হবে না। কেন না 'তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই নিলে—যত দিন সেবা করতে পেরেছি, করেছি।' তা হলে অনেক বাঁচোয়া। বেশী আসক্তি বা মায়া করতে নেই। ঐ মায়াই ত যত দুঃখ দেয়। আর যদি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস থাকে, ভগবানকে ডাকে—তা হলে ধাক্কা সামলাতে পারে।

জীব আগের দুঃখের কথা ভুলে যায়, তাই ত এত দুর্দ্দশা।

আগে কি কষ্ট ছিল, এখন কি অবস্থা হয়েছে—এ রকম করে দেখলে আর দুঃখ হয় না। তাঁর কৃপায় একটু সুবিধা হয়ে গেলেই জীব সব ভুলে যায়। মানুষ সঙ্গে সঙ্গে উপকার ভুলে যায়। জীব কি-না, তাই। নিজে যে অবস্থা থেকে এসেছে, সে কথা মনে থাকলে, যারা সেই অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি আসে। কিন্তু মানুষ এমনি যে, নিজের পূর্ব্ব অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে তাদের ঘৃণা করতে থাকে। তাই ঠাকুর বলতেন—উপকার কখনো ভুলো না, যত দিন বাঁচবে, কৃতজ্ঞতা রেখো।

তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—উপলক্ষ্য ভুলতে নেই, তা সে বড় লোকই হোক আর গরীব লোকই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। জীব ভুলে যায়, তাই ত এত দুর্দ্দশা। এ সব মায়ার খেলা।

যা গেছে তার জন্য বৃথা ভেবে লাভ কি? খামকা শরীর নষ্ট বৈ ত নয়। 'আমার আমার' করার জন্যই যত গোলমাল। ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়—সব মায়া।

তাঁর ( ঠাকুরের ) কথা কি মিছে? মায়া সৎকে অসৎ করে, অসৎকে সৎ করে। এ মায়ার হাত থেকে বাঁচতে গেলে সৎস্বরূপ ভগবানের স্মরণ নিতে হয়। ভগবানের অসৎ মায়া ছেড়ে যাবার জন্য লোকে সাধু হয়।

একটা-না-একটা চিন্তা থাকেই। দুনিয়াটা এই! কারও নিশ্চিন্ত

হয়ে থাকবার যো নেই। ভগবান থাকতে দেন না। তাঁর মায়ার এমনি প্রভাব! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—আমার মায়া কাউকে ছাড়ে না। তবে আমার যে শরণ নেবে, সে বেঁচে যাবে।

সংসার করলে বদ্‌মতলব আসবেই। যার না আসে, তার উপর ভগবানের খুব দয়া জানবে।

সব জিনিসের টেক্স দিতে হয়, কিন্তু ধ্যান-জপের কোন টেক্স দিতে হয় না। মহামায়া এমনি মায়া লাগিয়ে দিয়েছেন যে, ধ্যান-জপ করতে ইচ্ছা হয় না।

আমরা ভগবানের অংশ। তোমার মধ্যে কি ভগবান নেই? অবশ্য আছে। পবিত্র না হওয়ার জন্য—জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের জন্য তাঁকে দেখতে পাও না।

কুকুর যেমন পরস্পর একত্রে খেলে বেড়ায়, যেন কত ভালবাসা, কিন্তু খাবার পেলে পরস্পরে ঝগড়া ও মারামারি করে। তেমনি মানুষ পরস্পর কত ভালবাসা দেখিয়ে কত মিষ্টি কথা বলে; কিন্তু যেখানে একটু স্বার্থ লেশমাত্র থাকে, সেখানে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই ত জীবে ধর্ম্ম দেখছি। এ সব মায়ার খেলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—কর্ম্ম (সাধন) না থাকার জন্যই সৎকে অসৎ বলে বোধ হয়। এ মায়ার খেলা।

সকলেই মনে করে সে এখন যেমন আছে, চিরকালই সেইরূপ থাকবে! কিন্তু মৃত্যু যে ঘাড়ে চেপে আছে, কাল হাঁ করে আছে, বুঝতে পারে না। এরই নাম মায়া।

বাপরে! সিদ্ধাই দেখলে মা বসুন্ধরা ভয় পান, কেঁপে ওঠেন! সিদ্ধাইকে তিনি (ঠাকুর) ঘৃণা করতেন। কিন্তু লোকে তাই চায়,—জানে না, ওটা মায়া, ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়।

## পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা

দশ জনের সঙ্গে মিশে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করার চেয়ে সেই সময়টা ঘুমান ভাল। যাদের ভাল হবার ইচ্ছা নেই, তারাই ঐরূপ করে। তারা ত নিজেরা ভাল হবেই না, যারা হতে চায় তাদেরও হতে দেবে না। অমুক—সে ঐ রকম করেছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি? আবার মজা আছে—পরনিন্দা করলেই ঐ দোষগুলো তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে।

সাধু ভক্ত কি অন্য কাকেও নিন্দা বা ঘৃণা করতে নেই। সকলেই তাঁর সন্তান। ...তাঁকে একদিন যে ভালবেসেছে, সেই ভাগ্যবান। তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

সৎলোকের নিন্দা করতে নেই। যদি কোন বড় লোকে

সৎলোকের নিন্দা করে, তাহলে কতকগুলি লোককে সৎসঙ্গ হতে বঞ্চিত করা হয়। কারণ, বড় লোকের কাছেই বেশী লোক আসে। ঐরূপ করা অতি খারাপ। আর যদি সৎ-এর প্রশংসা করে, তা হলে পাঁচ জন সৎসঙ্গ করতে চাইবে। কারণ তারা বুঝবে—এ লোকটাও যখন তাকে ভালবাসছে, তখন তার সঙ্গ করা উচিত।

পরের দোষ দেখা মহাপাপ—সৎ-কর্ম্মহীন হলে পরের দোষ সহজেই নজরে আসে।

কর্ম্ম না থাকার জন্য গুণীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই নজরে আসে। এই দেখ না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন; অর্জ্জুন ভগবান বলে কত স্তব-স্তুতি করলেন; কিন্তু সন্ধির জন্য যখন দুর্য্যোধনের কাছে গেলেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা করাতে দুর্য্যোধনকেও বিশ্বরূপ দেখালেন। দুর্য্যোধন মনে করলে আমাকে ভেল্কি দেখালে। দুর্য্যোধন মানলে না, নাশ হয়ে গেল। আর ভগবান ব্যাস এমন কলম 'ডাল্‌লেন' যে আজ পর্য্যন্তও দুর্য্যোধন গাল খায়।

আপন দুঃখ যেমন বোঝ তেমন পরের দুঃখ বুঝতে হয়। সাধারণ গৃহস্থেরা কেবল পরের দোষ খুঁজে বেড়ায়। কোথায় দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করবে—না তার দোষ ধরতেই ব্যস্ত।

পরের দোষ দেখতে দেখতে দোষই কেবল নজরে আসে। যাঁর কাছে

উপকার পেয়েছ, তিনি যদি হঠাৎ কোন অন্যায় করে ফেলেন, তার দোষ কখনও দেখা উচিত নয়। তখন তার গুণটা সামনে ধরলে অনেক বাঁচোয়া; তা না হলে পরে ভয়ানক অনুতাপ হয়। অত দিনের উপকারটা সামান্য কারণে ভুলে গেলাম ভেবে পরে মনে দুঃখ হবে। তাই কদাচ অপরের দোষ ধরতে নেই।

মিছামিছি লোকের উপর সংশয় করা ভারী খারাপ। তাতে নিজেরই অনিষ্ট হয় রে! আবার সংশয়ের যাতনাও ভোগ হয়।

তাঁর (ঠাকুরের) নিষেধ—বাপ-মা বা গুরুর নিন্দা শুনতে নেই, করতেও নেই।

সাধু রাত্রে কি করে না করে তাই watch (লক্ষ্য) করতে আসবে? এটা ভারী খারাপ। সাধু স্বাধীন, তার ইচ্ছামত সাধন-ভজন করবে; ভাল না লাগলে না করবে—এ সব দেখার তোর দরকার কি? সাধু কারও তোয়াক্কা রাখে না; তাকে watch করে কি করবে?

তিনি (ভগবান) যাকে ভাল বলেন বা কোন বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করেন, তার নিন্দা করলে অকল্যাণ হবে। ভগবানও তার প্রতি রুষ্ট হন।

পরের দোষ দেখতে নেই, গুণই দেখতে হয়। সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে। কারও দোষ চাপা পড়ে থাকে।

জীব অপরের নিন্দা করে সুখ পায় কেন? নিজেকে বড় করার জন্য।

যার মন ভগবানের জন্য কাঁদে, সে কি তুচ্ছ দুটো উঁচুনীচু কথায় কান দেয় রে? সংসারেতে এই সব লেগেই আছে। তোমরা লাল কাপড় পরে যদি এই সব না ছাড়, তবে হলো কি?

সন্ন্যাস নিয়ে পরচর্চ্চা, পরনিন্দা নিষেধ আছে। এক দেশের লোক যথেষ্ট খেতে পাক, আর এক দেশের লোক না খেয়ে মরুক—এরূপ ভেদবুদ্ধি করা হিংস্রকের কাজ। ···মান্য পাবার জন্য গেরুয়া পরা খারাপ। আগে সেই জিনিসের মর্য্যাদা বোধ হলে তারপর ব্যবহার করা উচিত। যা ইচ্ছা তাই করলে স্বেচ্ছাচার হল—ধর্ম্ম নয়।

## বিষয় ও বিষয়-বুদ্ধি

আমরা এমনি পাজি যে, যদি ভগবানকে ডাকবার কখনও ইচ্ছা হল, ত অমনি খতাতে বসি—আমি যদি ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করি, তা হলে আমাকে খাওয়াবে কে, আমার পরিবারবর্গকেই বা খাওয়াবে কে, আমি থাকবই বা কোথায় ইত্যাদি। কিন্তু একটু ভেবে দেখি না, পৃথিবীতে এত লোক যে ভগবানের জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে, তাদের কি কখনও কোন অভাব হয়েছে? ভগবানের জন্য

যে ত্যাগ করে, তাকে তিনি খেতে দেন, পরতে দেন, বল-ভরসা সব দেন। তার সমস্ত সুবিধা করে দেন—তাঁর নাম নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হল।

রোজগারী বাপ মরলে ছেলে দুঃখ করে—আমার কি হবে? স্ত্রী দুঃখ করে—আমার কি হবে? একবারও ভাবে না, যে গেল তার গতি কি হবে? কজন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—"হে ভগবান, ইনি যদি কোনও অন্যায় করে থাকেন, তবে ক্ষমা করুন।" তা করে না, যে যার স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত—এই হল সংসার।

এ সংসারে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে না পারলে তাকে বেকুব বলে। মহামূর্খ যদি টাকা রোজগার করে, তাকে খুব বুদ্ধিমান বলে। বিদ্যার আদর নেই।

যে সরল—কোন অহঙ্কার-অভিমান নেই, টাকা থাকলেও লোকে তাকে পাগল বলে। যার টাকা নেই, তাকে ত বলবেই। তারা হলো পাগল আর রাতদিন অহঙ্কার নিয়ে থাকিস, তোরা হলি কি না ভাল? ··· দেখছিস না, অহঙ্কার অভিমান একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—জানে এ কিছুই নয়; এ ভগবানের দয়া বৈকি! দেখছিস—সামান্য জিনিসটুকু পর্য্যন্ত দিতে আসে, মনে কোন সঙ্কোচ নেই। একেই বলে ঠিক ঠিক ভালবাসা।

কেউ কেউ বলতো—মশায়, সাধু পয়সা নেয়। ঠাকুর ঐ কথা

শুনে চটে যেতেন। বলতেন—শালারা বলে কি, সাধু বুঝি হাওয়া খেয়ে থাকবে? দুনিয়ার সব সুখ ত্যাগ করেছে, একটু আরামে থাকবে, তা দেখেও হিংসা হয়; এদের কি কোনরূপ গতি আছে? ঠাকুর এই জন্যই ত বলতেন—এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই আসে। ওরা সংসারী জীব—টাকা ওদের গায়ের রক্ত, দিতে হলে কষ্ট হয়।

মানুষ ধর্ম্ম বুঝবে কোত্থেকে? কেবল রাতদিন 'হা টাকা, যো টাকা।'

"টাকা ধর্ম্ম টাকা কর্ম্ম টাকাহি পরমন্তপ।
হা টাকা যো টাকা টক্ টক্ টক্ টক্॥"

বদ্-সংসারী লোকের সঙ্গ করবি না। ওদের হাওয়া গায়ে লাগাতে নেই। আমি কি বুঝতে পারি না? কারুর প্রাণে দুঃখ দিয়ে কথা বলতে নেই, তাই চুপ করে থাকি। তবে বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোদের কল্যাণের জন্য সাবধান করে দিই। সাধুর বদ্-সংসারীর সঙ্গ করতে নেই। ওরা নিজের মায়া সাধুর ঘাড়ে চাপায়।

## ঈশ্বর-বিশ্বাস

ভগবান নিশ্চয়ই আছেন; তবে তাঁকে জানবার ইচ্ছা নেই, সেই জন্য তাঁর অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি না। ভগবানকে লাভ করতে হলে দুঃখকষ্ট স্বীকার করে মান-অপমান, লোক-লজ্জা কাকবিষ্ঠার মত ত্যাগ করতে হয়, তবে তাঁর দয়া হয়।

সুখের সময় লোক কি ভগবানকে চায়? তখন ভাবে আমিই কর্ত্তা—বিধাতা। দুঃখের সময় ত ভগবানকে ভজনা করবেই। কিন্তু যে সুখের সময়ও ভগবানকে ডাকে সেই ত মানুষ।

"দুখ্‌মে সব হরি ভজে, সুখ্‌মে ভজে না কোই।
সুখ্‌মে হরি ভজে তব্‌ দুখ্‌ কাঁহাসে হোই॥"—(তুলসীদাস)

যে ভগবানকে মানবে সেই বেঁচে যাবে, আনন্দ পাবে, সুখী হবে। আর যে না মানবে সে দুঃখভোগ করবে।

পাশ করে ভাল চাকরী না জুটলে যেমন সমস্তই বৃথা বলে মনে কর, তেমনি আবার এটাও জেন, লেখাপড়া শিখে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি না হয়, তার লেখাপড়া সমস্তই বৃথা।

সকলের ভেতরই ভগবান আছেন। তোমার ভেতর কি ভগবান নেই? আমরা বুদ্ধি-ভ্রমবশতঃ বুঝতে পারি না। তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) বলেছেন—আমি হচ্ছি পূর্ণ, আর সব আমার অংশ।

ভগবানে মতি-গতি থাকলে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকলে কি হয়?—সে অসৎ কাজ করবে না (তাতে তার ও সমাজের কল্যাণ)। সেখানে উপরওয়ালা একজন আছেন। অসৎ কাজ করলেই ভুগতে হবে।

সংসারে জনে জনে কর্ত্তা হলে চলে না; এক জন সংসারে কর্ত্তা হলে সে সংসার ভালরূপ চলে। তেমনি ধর্ম্ম-জগতে ভগবানকে কর্ত্তা করে কাজ করলে ভালরূপ ফল পাওয়া যায়।

যাকে ভয় করতে হয়, তাকে আমরা ভয় করি না, আর যাকে ভয় করতে হয় না, তাকে ভয় করি! যে জানে ভগবান আছেন, সে কি অন্যায় করতে পারে?

দুঃখনিবারণ করার জন্য ভগবানকে ডাকে। ভগবান ত খোসামুদের জিনিস নয়। ভগবান মানো, বহুৎ আচ্ছা; না মানো বহুৎ আচ্ছা। তাতে তাঁর কি আসে যায়?

ভগবানকে আশ্রয় করলে সব শক্তি আসবে। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান। ... জীবমাত্রেরই সুখ-দুঃখ আছে। তাই অবতারেরা শরীরধারণ করে কত দুঃখভোগ করেছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে, সুখ-দুঃখে যেন তোমায় না ভুলি ও সব সহ্য করতে পারি।

তাঁকে লুকিয়ে কি কাজ করবে? তিনি লোক-চক্ষুর অগোচরে, তবু সব জানতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

তিনি কোন নিয়ম-বিধির (মায়ার) অধীন নহেন। আবার (লীলাচ্ছলে জীবরূপে) নিজ মায়ায় বদ্ধ হলে স্বাধীনও নহেন। তাঁর কোন নিয়মের 'ইতি' করা যায় না; আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে হয় না। 'তদ্বৎ' হলে তবে তাঁকে অথবা তাঁর ভক্তদের বুঝা যায়। নিয়মবিধি* তোমার-আমার জন্য (জীবের জন্য)।

ভগবানের উপদেশ আর জীবের উপদেশ বহু তফাৎ—ভগবানের সিদ্ধান্তই ঠিক। ভগবানের আরাধনা কর—ভজনা কর। তাঁর জোরেই জোর। তাঁকে না মান, তাতে তাঁর কি?

সময়ে সব হয়, অসময়ে কিছু হয় না। ব্যস্ত হলে চলবে না, ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। ঐ অবস্থায় ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে স্থির থাকতে পারলে পরে কল্যাণ হবেই হবে।

* এ স্থলে নিয়মবিধি—বিধিনিষেধ এবং আইনকানুন (law)—এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

# ঈশ্বর-দর্শন

যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন ইষ্ট ও গুরু এক বোধ হবেই না। হাজার বিচার কর আর বুদ্ধি খাটাও, সংশয় আসবেই আসবে। কিন্তু একবার যদি কখনও আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায় এবং গুরু ও ইষ্ট এক বলে বোধ হয়। যতদিন তা না হয়, জানতে হবে তোমার গলদ আছে।

যে সাধু ভগবানকে লাভ করেছে সেই জানে ভগবান ও বৈরাগ্য কি জিনিস। সাধুর ভেক থাকলেই হয় না! ভগবানকে লাভ করাই প্রধান।

নিজে অনুভূতি করা, আর বই পড়া বহু তফাত।

জোর করে অদ্বৈত-ভাব কি হয়? তিনি (ঠাকুর) বলতেন—ফল বড় হলে ফুল আপনি খসে পড়ে যায়। ঘাসের উপর তিনি হাঁটতে পারতেন না। এমনি সর্ব্বত্র অভেদ ব্রহ্ম-বুদ্ধি—আত্মসাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার রাখা চাই, তবে ক্রমে উপলব্ধি হয়।

প্রহ্লাদ ভগবানকে লাভ করেছেন; পবিত্র শুদ্ধ জীবন দিয়েই কেবলমাত্র ভগবানকে বুঝতে পারা যায়। ভগবান নিশ্চয়ই আছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদের জীবন শুদ্ধ পবিত্র; তাঁর

বিশ্বাস ছিল—হরি সর্ব্বত্র আছেন, যে কাতরপ্রাণে ডাকে, তাকে দেখা দেন।

অমুকে বলে—ভগবান কোথায়? ভগবান কি আছেন? যারা যথার্থ ত্যাগী, ভাগ্যবান, তারা বলে—ভগবান যদি থাকেন, তা হলে আমরা তাঁর কাছে আগে যাব, কেন না, পবিত্র জীবন আমাদের, এ সংসারে কারও অনিষ্ট করি নি। আর তোমরা ভগবানের কাছে যেতে পারবে না, কেন না জগতে এইসব সুখের জন্য কত লোককে অত্যাচার-পীড়ন করেছ। স্বামীজী বলতো, ভগবান যদি নাই থাকেন, তাঁকে নাই পাই, তা হলেও এ সংসারের ঝঞ্ঝাট হতে বেঁচে গেছি। জগতের সব সুখ ত্যাগ করেছি, কারও অনিষ্ট করি নি। যে যথার্থ ত্যাগী, সে এই কথা বলতে পারে।

ভগবানকে কেউ ত দেখে নি। তবে তাঁর কর্ম্ম দেখে যে মানতে পারে, সেই ভাগ্যবান।

পাতাল-ফোঁড়া শিব হও; বসান-শিব হয়ো না। যদি শোনে যে, অমুক স্থানে পাতাল ফুঁড়ে শিব উঠেছেন, তবে হুড় হুড় করে সেখানে সব লোক দেখতে যায়। আর স্থাপিত (বসান) শিবের কাছে কজন লোক যায়? তাই বলছি, নিজে নিজে সাধন-ভজন দ্বারা সত্য উপলব্ধি কর।

আমি আর কি বলবো—ভগবান আছেন খুব সত্য। তাঁকে ডাকো—তাঁর দয়ায় তাঁর দেখা পাবে।

তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'জগৎ দেখে ভুলো না, জগৎ-কর্ত্তাকে জানবার চেষ্টা কর।'

কর্ম্মের দ্বারা ভগবান প্রকাশ হন। ভগবান কি দূরে আছেন? কর্ম্ম নেই, তাই দেখতে পাও না। তিনি সকলের অন্তরে—নিকট হতে নিকটে।

সকাম কর্ম্মে বন্ধন হয়; নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে সৎ-স্বরূপ ভগবান প্রকাশিত হন। কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হচ্ছে সাধন-ভজন করা, ভগবানকে ডাকা। তাঁকে ঠিক ঠিক ডাকলে দেখা দেন বৈ কি!

তুমি ৺বিশ্বনাথদর্শন করতে গিয়াছিলে? ··· হাঁ, রোজ যাবে। ৺বিশ্বনাথ আছেন—সত্য বলছি, আছেন। সাক্ষাৎ ৺বিশ্বনাথ রয়েছেন। তবে কারো কাছে প্রকাশ, কারো কাছে গোপন।

# নির্ভরতা

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন, তখন একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করলেন—কখন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে যাই? দুর্য্যোধন কপট-ভাবে দুর্ব্বাসা মুনিকে বললে—সন্ধ্যার পর দেখা করতে যাবেন। কারণ দুর্য্যোধন জানত যে, দুর্ব্বাসা মুনি অতি কোপন-স্বভাব। পাণ্ডবেরা ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে জীবনধারণ করছে; সন্ধ্যার সময় আহারাদি শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা অতিথি-সৎকার করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু দুর্ব্বাসা মুনি অত না বুঝে মনে করলেন, পাণ্ডবেরা হয় ত দিনের বেলায় শিকারে যায়, সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র থাকবে, তাই দুর্য্যোধন তাঁকে সন্ধ্যার সময় যেতে বললে। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার সময় ষাট হাজার শিষ্য নিয়ে দেখা করতে গেলেন। দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখবামাত্র যুধিষ্ঠির ত চিন্তিত হলেন—আজ বুঝি পাণ্ডবকুল ধ্বংস হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখে দুর্ব্বাসা মুনি নদীতীরে সন্ধ্যা করতে গেলেন এবং বলে গেলেন, আজ আমি এখানে আহার করব। যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে 'আমার মহাভাগ্য' বলে আপ্যায়িত করলেন। সেদিন আবার দ্বাদশী, মুনি একাদশীর দিন থেকে উপবাসী আছেন। অথচ ঘরে কিছু খাবার নেই। যুধিষ্ঠির এরূপ অবস্থা স্মরণ করে সখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডাকে স্থির থাকতে না পেরে দ্রৌপদীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—আমার বড় ক্ষিধা পেয়েছে, ঘরে যদি কিছু থাকে ত দাও। দ্রৌপদী বললেন—সখা, ঘরে যে কিছুই নেই। তা যাই

হোক, দু-এক কণা শাক ছিল, তাই দিয়ে জল খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চলে গেলেন। এ দিকে দুর্ব্বাসা মুনির দেরী হচ্ছে দেখে, যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর খবর জানতে পাঠালেন। ভীম গিয়ে দেখে যে, দুর্ব্বাসা মুনি ঘুমুচ্ছেন। ভীমকে তিনি বলে দিলেন—আজ শরীরটা বড় ক্লান্ত, আজ আর কিছু খাব না, কাল উপবাসের পারণ করব। এ সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের খেলা! এইরূপ যাঁরাই ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁদের আর কোনও বিপদ-আপদ উপস্থিত হয় না। আরও বোঝা যায় যে, ভগবান যার উপর সন্তুষ্ট, সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

তাঁর উপর মন থাকলে সব ভয় কেটে যায়। ভগবানে মন থাকাই হল প্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিয়ে দেন, তা কি জীব বুঝবে? তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করতে হয়। বাইরে লোক-দেখানো না হয়। আন্তরিক প্রার্থনা হলে তিনি শোনেন।

স্বার্থ না থাকলে ভগবান ভার গ্রহণ করে থাকেন।

যুধিষ্ঠির মহারাজ পরম সত্যবাদী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। ·· পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, তাঁদের একটুও রাজ্যভোগ করার ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা কৌরবদের বললেন—দেখ, আমাদের পাঁচখানা গ্রাম দাও। শরীর যখন ধারণ করেছি, তখন শরীরকে কোনরকমে বাঁচাতে হবে, তার অন্য উপায় নেই। কিন্তু কৌরবেরা তা না দেওয়াতে

এত কাণ্ড হল। ভগবানের উপর নির্ভর করেছিলেন বলে পাণ্ডবেরা বেঁচে গেলেন। তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনি স্বয়ং ভার নেন।

কেউ কিছু করে না, কেবল বকাতে আসে। সাধুকে পরীক্ষা করে, বেকুবি দেখ! সাধুকে বিরক্ত করলে তার দুর্দ্দশা হবে। সাধু তোমার মনের মত কথা বলবে কেন? তা হলে সে গৃহস্থের হদ্দ হলো যে রে! সাধু ভগবান ছাড়া আর কারও তোয়াক্কা রাখে না। এইজন্যই সাধুরা গৃহস্থের সঙ্গে মেশে না। সাধুর খাওয়ার অভাব কি? যে পেটের দায়ে লাল কাপড় পরেছে, তার ভাবনা হবে। সাধুর ভাবনা হবে কেন? সাধু যেখানে থেকে তাঁকে মনে করবে, তার কাছে সেখানেই খাবার আসবে। ভগবান নিশ্চয়ই সাধুকে খেতে দেবেন। তবে সামর্থ্য থাকতে ভক্তেরা ভগবানকে সামান্য বিষয়ে কষ্ট দেন না। ভগবানকে ঐ সব সামান্য বিষয়ের জন্য বিরক্ত না করাই ভাল মনে করি।

জীবের কোনকালে আশা মেটে না। ভগবান যথেষ্ট অর্থ দিলেও তার দুঃখ কোনকালেই যায় না। ভগবানকে দুঃখ জানালে তবে ত দুঃখ যাবে! ওরা কেবল মুখে ভগবান ভগবান করে। ভগবান কি জানেন না কার কি দরকার? যা দরকার তিনি সব জানেন, আর কর্ম্মমত তাকে তাই দিয়ে দেন। ভগবানে বিশ্বাস নেই, নির্ভরতা নেই, তাই ত এত দুঃখভোগ। এরূপ জীবের সঙ্গ করলে দুর্দ্দশা হয়। এরা নিজেও দুঃখভোগ করে, আর অপরকেও ভোগায়। জীব আশায় বেঁচে আছে। কিন্তু বেশী আশা করলে দুঃখ পেতে হয়; এইজন্যই ভগবানের ইচ্ছাতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভগবান অপার করুণাময়, তিনি আমা

অপেক্ষা বেশী বোঝেন ; অতএব তিনি দয়া করে যা দিচ্ছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। এরূপ বিচার করলে কোন দুঃখ থাকে না।

রোগ হলে কিংবা বিপদ-আপদ হলে অনেকে অস্থির হয়ে পড়ে। সে সময় খুব ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয় এবং ভগবানকে খুব ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত ডাকতে হয়। চিকিৎসাদি দ্বারা যতটুকু সম্ভব, সাধ্যমত রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। তিনি ( ঠাকুর ) বলেছেন—ঔষধে কাজ হয় বৈকি! দ্রব্যগুণ যাবে কোথা ? তাতেও যদি কিছু না হয়, তা হলে তুমি ভেবে কি করবে ? জানবে, এখন তাঁর হাতে।

ভক্ত ভগবানকে কষ্ট দেবে না। তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেবেনই, তবে তাঁকে কষ্ট দেবার কি দরকার ? ভিক্ষা করে খেয়ে এসে ধ্যান-জপ করলেই হয়। আবার মৌনী হওয়া কেন ?

যার ভগবানের উপর নির্ভরতা নেই সে আবার ধ্যান-জপ করবে কি ? তাঁর উপর নির্ভরতা না হলে কিছুই হয় না।

## পবিত্রতা ও সৎ আদর্শ

পবিত্র থাকলে ধর্ম্ম একদিন-না-একদিন বুঝতে পারবেই। সত্যের কাছে ভগবান প্রকাশিত হন, যেমন অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন।

কলিতে জীবনধারণ করে একটু মাছ-মাংস খেলেই বা তাতে এমন দোষ কি হয়! পবিত্র জীবনে কোন দোষ নেই। মাছ-মাংস খেয়ে তবু ভগবানকে ডাকছে, 'ভগবান ভগবান' কচ্ছে, আর তোমরা মাছ-মাংস না খেয়ে অপবিত্রভাবে জীবন কাটাচ্ছো। হে জীব! পবিত্র হও, পবিত্র হলে ভগবান দয়া করেন।

সত্রের বিনা পরিশ্রমের ভাত কি সকলের সহ্য হয়? অনেক সময় উল্টো হয়ে যায়। সত্রের ভাত হজম করা শক্ত। কারণ হাজার কামনা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। খুব ধ্যান-জপ করতে হয়, তবেই তার প্রভাব কাটে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তিনি (ঠাকুর) যে কি খুশী হতেন, তা বলা যায় না। তিনি নোংরাপনা ভালবাসতেন না। ভেতর-বার সাফ থাকা দরকার।

সাধুরা এই জগৎ থেকে চলে যাচ্ছে, বড়ই দুঃখের বিষয়। জগতের কি যে দুর্দ্দশা হবে, কে বলতে পারে! সাধু গেলেই অকল্যাণ। যে

সময় পড়েছে, সাধু থাকছে না। তিনি (ঠাকুর) বলতেন—সাধু না থাকলে ধ্বংস হবার লক্ষণ। সাধু থাকলে খুব জোর—অসৎলোক প্রবল হয় না।

মুসলমান যদি যত্ন করে দেয়, তা হলেও অক্লেশে খাবি; কিন্তু পবিত্র থাকবি। শ্রদ্ধার দান সাত্ত্বিক।

সত্যকে না জানলে কিছুই হবে না। সত্য জানবার চেষ্টা কর। যেখানে সত্যস্বরূপ ভগবান, সেখানে হিংসা থাকতে পারে না। যদি সত্যকে জানবার চেষ্টা না কর—সত্য প্রকাশ হবে না, হিংসাও যাবে না। যেখানে মিছে, সেখানে হিংসা। যেখানে সত্য প্রকাশ হয়, সেখানে এমন অবস্থা হয়, হয়ত এক ভাই রোজগার বেশী করে, এক ভাই রোজগার কম করে; বড় ভাই ছোট ভাইকে, কি ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে—তুমি বেশী টাকা উপায় করতে পার না বলে ভাবছো কেন? এ জগতে কদিন আছি? যখন সংসার করা গেছে তখন কোন রকমে ছেলেগুলো খেতে পেলেই হলো। এই হলো সৎ ভাই। সৎ স্ত্রী তার স্বামীকে বলে—তোমারই ত ভাই, কদিন আমরা জগতে আছি! সেখানে কলহ থাকতে পারে না। ধর্ম্মের স্রোত যখন প্রবল হয় তখন পরকেও ভাই বলে বোধ হয়। সেথায় ভক্তি, মুক্তি, বিশ্বাস প্রবল হয়।

## নিঃস্বার্থ প্রেম

জীব ভগবানকে শুধু ভালবাসাবশতঃই ডাকবে—এরূপ খুবই বিরল, সন্দেহ নাই। গোপীদের এই ভাব।

ভগবানে প্রীতি থাকলে বিষয়, মান, অপমান, লোক-লজ্জা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়। এ সব মিথ্যা—মায়ার খেলা। প্রীতিই হলো প্রধান।

বার মাস রোগীর সেবা করা কঠিন বৈকি। নিজের বাপ-মারই পারা যায় না—বিরক্তি আসে। যদি ঠিক ঠিক সেবা করতে পারে, তবে কল্যাণ হবে।

স্নেহ ( প্রীতি, ভালবাসা ) হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। ভগবানের দয়া না হলে স্নেহ হয় না। বিষয়ীদের স্নেহ লোক-দেখানো, সর্ব্বদাই স্বার্থে পূর্ণ। তাদের কি কখনও স্নেহ আসতে পারে? যাদের স্নেহ আছে, তারা ভাগ্যবান। কোন পিত্তেশ ( প্রত্যাশা ) না করে যে স্নেহ করে, তার উপর ভগবানের খুব দয়া বুঝতে হবে।

মানুষ সখের জিনিস বড়ই ভালবাসে। ঠিক সেই রকম ভগবানকে যখন ভালবাসবে তখনই ধর্ম্ম হবে।

আমরা মায়ার টানে ভালবাসি। ভালবাসা কি সোজা কথা?

অবতার মহাপুরুষেরা ভালবাসা কাকে বলে জানেন। সাধুরা তাঁকে জেনে জীবের দুঃখ দূর করতে ব্যস্ত থাকেন। কিসে জীবের কল্যাণ হয়, এই চিন্তা। এখন আর সেরূপ সাধু কোথায়? ভেক আছে কিন্তু সাধুত্ব কৈ? ঠিক ঠিক সাধু খুব কম।

তোরা ভালবাসা, ভালবাসা মুখে বলিস। ভালবাসা বহু সাধনার ফলে হয়। জীবের সাধ্য কি যে ভালবাসতে পারে? তাঁর দয়ায় জীবের ভালবাসা হয়।

পরের অনিষ্ট ও হিংসা করে জীব স্বার্থলাভের চেষ্টা করে; কেন না, স্বার্থসিদ্ধিতেই তার আনন্দ। যে পরের হিংসা বা অনিষ্ট না করে আনন্দ পায়, তার আনন্দই ঠিক আনন্দ; কেন না, তা স্বার্থশূন্য। ঐরূপ হতে গেলে ভগবানের বিশেষ দয়া থাকা চাই। তাঁকে ডাকলে তাঁর দয়া হয়।

## কৃতজ্ঞতা

মানুষ উপকার পেয়ে ভুলে যায়, তাই ত এত দুর্দ্দশা হয়। যে উপকার পেয়ে মনে রাখে, সেই মানুষ। যার দ্বারা কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তাকে কখনও ভোলা উচিত নয়। তা ভুললে দুর্দ্দশা হবে।

যার দ্বারা উপকার হয়, যদি তাকে উপকৃত ব্যক্তি মানে, তবে ত তার নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের ঘরে বাঁচোয়া। না মানলে সেই ভুগবে।

যার দ্বারা সৎ কাজ হয়, তাকে কি ভুলতে আছে ?

আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামীজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দুটি টাকা দিলে। আমি বললাম—ঐ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ ? স্বামীজী বললে—ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল, দু'টাকা কি বলছিস ; ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই*।

কাঁকুড়গাছিতে স্বামীজী রাম বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। রাম বাবু তখন পীড়িত। স্বামীজী অনেকের সাক্ষাতে রাম বাবুর জুতো এগিয়ে দিল। রাম বাবু বললেন—বিলে, করিস কি, করিস কি ? স্বামীজী উত্তরে বল্ল—রাম দাদা ! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি ?

## অহঙ্কার

'আমি অমুক' 'আমি খুব বড় লোক'—এই ভাব থেকেই মনে 'অহং' জেগে ওঠে। কিন্তু 'আমা অপেক্ষা অনেক বড় লোক আছেন, আমি অতি সামান্য, আমি যা কচ্ছি সে সমস্তই ভগবানের কৃপায়'—এরূপ বিচার করলে 'অহং' ক্রমে ক্রমে চলে যায়।

এ জগতে কেউ ছোট হতে চায় না, সবাই বড় হতে চায় ; তাই ত

* স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়া ভ্রমণকালে আহার অভাবে কাতর হইলে ঐ ফকির কাঁকুড় খাওয়াইয়াছিলেন।

এত গোলমালের সৃষ্টি। একজন একটু নীচু হলে সব গোলমাল মিটে যায়; কিন্তু তা কিছুতেই হবে না। বলে—আমি ওর থেকে ছোট কিসে? এরই নাম অহঙ্কার। যত অনর্থের মূল ঐখানে। যদি সংসারে শান্তি পেতে চাস, তবে ছোট হতে শেখ রে!

তিনি (ঠাকুর) বলতেন—সাধুর সব যায়, কেবল 'আমি সাধু' এই অভিমান যায় না। একটু ছোট বললেই চটে যায়। 'আমি ছোট কিসে?' তোরা 'মান মান' করে ব্যস্ত হোস। সাধুর আবার মান-অপমান কি রে? সাধুর কাছে মান-অপমান সব এক। মান ছুড়ে ফেলে দে।

নিজেকে বড় বলে মনে হলেই যত গোল। যার ছোট বলে মনে ধারণা, তার আর কিসের গোল?

'অহংসে' (অহঙ্কারের জন্য) জীব দুঃখ পাচ্ছে। তাঁর দয়া না হলে 'অহং' যায় না।

## নাম-মাহাত্ম্য

চৈতন্যদেব যা ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বেশ সোজা। তিনি বলেছিলেন—জীব হরিনাম করুক। হরিনাম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তখন বুঝতে পারবে ভগবান কি জিনিস। আর বুঝবে যে, জগৎটা মিথ্যা।

কলিতে যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা কিছুই নেই। কলির জীবকে ভগবান সে শক্তি দেন নি। কেবল হরিনাম করাই হচ্ছে কলির তপস্যা, আর অন্য গতি নেই। জীব হরিনাম করে না, তাই ত এত দুর্দ্দশা! চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য—শাস্ত্রবাক্য। সে কি মিথ্যা? হরিনাম করলে ভবরোগ দূর হয়। অবতারদের কথা না মেনেই জীব এত দুঃখ পায়।

## দাসত্ব

চাকরীর চেয়ে বরং ভিক্ষা করে খাওয়া ভাল। যে ভিক্ষা করে, তার যে দিন ইচ্ছা না হল, সে দিন ভিক্ষায় বেরুল না। কিন্তু চাকুরে লোকের তা হবার যো নেই; ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, চাকরীতে বেরুতেই হবে। স্বাধীন পেশা সব সে আচ্ছা।

সংসারে অর্থের জন্য দাসত্ব করে, কিন্তু ভগবানের জন্য কেউ দাসত্ব করতে চায় না; অথচ তাতে কোনই খরচ নেই। যে ভগবানের জন্য দাসত্ব করে সেই ভাগ্যবান।

# সদ্ব্যয় ও পরোপকার

কলিতে অন্ন-দানের চেয়ে পুণ্য নেই। এমন কি, একজন ভিখারীকেও এক মুঠো চাল দেওয়া ভাল, তাতে দাতারই কল্যাণ হয়।

ভগবান কাউকে অর্থ দেন, কিন্তু দান করবার ইচ্ছা দেন না। আবার যাকে দান করবার ইচ্ছা দেন তাকে অর্থ দেন না। যাকে দুইই দেন, বুঝতে হবে তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

ভগবান যতটুকু শক্তি দিয়েছেন, ততটুকু সৎকাজ কর—কারও যেন অনিষ্ট না হয়।

ভগবান বলছেন যতটুকু পার, জীবকে রক্ষা কর। জীবকে নষ্ট করতে নেই। জীবকে রক্ষা করতে করতে আমাকে বুঝতে পারবে, আমি কি জিনিস।

মহাপ্রভুর শিক্ষা—গরীবকে ভুলো না; গরীবকে রক্ষা করলে ভগবান খুশী হন। যে রক্ষা করে, তার কল্যাণ হবেই।

লোকে ভিক্ষা করতে এলে গালাগালি দিস্ কেন? ইচ্ছা হয়, খুশী হয়ে একমুঠো দিবি; যদি দেবার মুরোদ না থাকে, তবে মিষ্টি কথায় বলবি—দিতে পারবো না। দুটো মিষ্টি কথা বলতে কি পয়সা লাগে?

দিবি ত একমুঠো ভিক্ষা কিংবা একটি পয়সা, এই ত জিনিস—তা অত লম্বা লম্বা কথার কি দরকার? নিজে ত ভিক্ষা করিস্ না, তা ওদের দুঃখ কি করে বুঝবি? নিজে কখন যদি ঐ রকম অবস্থায় পড়িস্, আর ভিক্ষা করতে গেলে কেউ তোকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়, তা হলে তোর কি রকম দুঃখ হয়, একবার মনে মনে ভেবে দেখ।

খুব দুর্ভিক্ষের সময় ভগবান পরীক্ষা করেন, কে ঐ সময়ে সাহায্য করে। ঐ মাড়োয়ারী কাপড় দিয়ে এত লোকের লজ্জা নিবারণ করলে—এ কি কম ভাগ্যের কথা! দুর্ভিক্ষের সময় যার দুমুঠো খাবার আছে, তার একমুঠো দিয়েও সাহায্য করা উচিত। যে না করে, সে দেশের কাছে, ভগবানের কাছে দোষী।

অন্ন-কষ্টের মত কষ্ট নেই। লোকে পেট ভরেই খেতে পায় না, আবার ধর্ম্ম করবে কি? পেট ভরে দুমুঠো খেতে না পেলে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না।

তিনিই সব করাচ্ছেন। আগে থাকতে সব বন্দোবস্ত, জোগাড় করা আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেই তা আপনি এসে জুটবে। ... গরীবের প্রতি দয়া করলে নিজেরই কল্যাণ হয়। গরীবকে যে রক্ষা করে, ভগবান তাকে রক্ষা করেন, এতে কোন সংশয় নেই।

নিজের স্বার্থের জন্য সব খরচ করতে পারে, কিন্তু দেবতার জন্য পাঁচ পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠিত হয়। শাস্ত্রে আছে—দেবতা, সাধু আর

তীর্থস্থানের পাণ্ডাকে কিছু দিতে হয়। তিনি (ঠাকুর) বলতেন—ঠাকুরের কাছে, রাজার কাছে ও সাধুর কাছে কিছু কিছু নিয়ে যেতে হয়, শুধু হাতে দর্শন করতে নেই। ওটা হলো ভেকের মান্য।

তিনি (রামকৃষ্ণ) বলতেন, সাধুকে খাওয়ান খুব ভাল, বিশেষতঃ কাশীতে। সাধুর আত্মা সন্তুষ্ট হলে দাতার কল্যাণ হয়। কলিতে অন্নদানের মাহাত্ম্য আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস্তবিক সৎ পণ্ডিত লোক। নিজে খেটে উপার্জ্জন করে দান করছেন। যেমন কর্ম্ম, তেমনি নাম। খুব ত্যাগী। খাটুনির পয়সা ওঁরই সার্থক।

পর-সেবায় যিনি জীবন দিয়েছেন, যাঁর আপন-পর বলে কিছুমাত্র ভেদ নেই, যিনি পরের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝতে পেরেছেন তাঁর চেয়ে আর ভাগ্যবান কে? আমরা এমনই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি যে, বিপদ-আপদে কাউকেই দেখি না, পরের কুৎসা নিয়েই ব্যস্ত, পরের সুখে ঈর্ষা হয়, পরের উন্নতি যেন চোখে দেখতে পারি না; সে জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। যদি ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে পর-সেবা ইত্যাদি করা যায়, তা হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবান সন্তুষ্ট হলে বিবেক-বৈরাগ্য, শ্রদ্ধাভক্তি হয়।

স্বামী কি শান্তি দিতে পারে? শান্তি-দেনেওয়ালা এক ভগবান। তবে বিদ্যা-স্ত্রী স্বামীর কল্যাণের জন্য দান করে থাকে, স্বামীর জন্য

জপ করে। দেখ না, বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকেরা গোপনে গোপনে দান করছে—স্বামীর যাতে সুখ হয়, মঙ্গল হয়। ও রকম বিদ্যার ঘর কি আর আছে যাদের মেয়েরা সংসারের কল্যাণের জন্য দীন-দুঃখীর, সাধুসন্ন্যাসীর, দেবতার সেবা গোপনে গোপনে করে? আগে সব এমনি ছিল।

## সংশয় ও অবিশ্বাস

যত দিন না গুরুর উপর ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস হয়, তত দিন যার-তার কাছে উপদেশ নিতে যেতে নেই। তাতে গুরুর উপর সংশয় আসবার সম্ভাবনা। একবার গুরুতে সংশয় এলে, তা দূর করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পরকে কেন মানি? নিজের দুঃখ যায় না বলে, নিজের ওপর বিশ্বাস নেই বলে। নিজের ওপর যার বিশ্বাস আছে সে কি অপরের সাহায্যের আশায় বসে থাকে?

গুরুর কৃপা না হলে সংশয় যায় না। তাঁর কৃপা পেতে হলে অচল অটল ভক্তি চাই।

সন্দেহ দূর হতেই হবে। সন্দেহ না গেলে কিছুই হবে না। সর্ব্বদা ভগবানের নাম করলে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তিনিই সংশয় করান, আবার তিনিই তাহা দূর করেন।

রোগের সময় বাবা তারকনাথ, বাবা তারকনাথ কচ্ছে। অন্য সময় তারকনাথের নামটি পর্য্যন্ত লয় না, তাতে আর হবে কি ?

চিরকাল খারাপ কাজ করে এসেছে, তাই তাদের ভগবানে একবার বিশ্বাস হয়, আবার হয় না।

সকলেই কৃপা করুন, কৃপা করুন করে চেঁচাচ্ছে। বাস্তবিক ভগবানের কাছে কৃপা চায় কে ? যদি শরীর ভাল থাকে এবং টাকা-পয়সা থাকে, তা হলে সে নিজেই এক জন ভগবান হয়ে দাঁড়ায়। সে কি আর ভগবানকে মানে ?

তোমায় কি বলব—ভগবান আছেন কি না, তিনি সাকার কি নিরাকার—এই সিদ্ধান্ত করতেই যখন তোমার পঞ্চাশ বছর গেল, শেষে আর জপ-ধ্যান কবে করবে ?

কেউ এ জগতে কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। কেউ সৎকর্ম্ম করছে, আবার কেউ অসৎকর্ম্ম করছে। যে সৎকর্ম্ম করে, ভগবান তার প্রতি খুশী হন ও লোকে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আর অসৎ কর্ম্ম করলে লোকে গালি দেয়। যে ভগবানের বাক্য শোনে, তাঁর হুকুম প্রতিপালন করে, সে সৎ কর্ম্ম করবেই; আর যার ভগবানের বাক্য মিথ্যা বলে বোধ হয়, সেইই অসৎ-কর্ম্ম করবে।

তাঁর জিনিস শ্রদ্ধা করে নিবেদন করতে কষ্ট হয়, বিরক্তি হয়, এ কি কম দুঃখ ? ওরে, তোদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই বলেই ত এত দুঃখ পাস !

## সংশয় ও অবিশ্বাস

এ জগতে সকলেই ঠকাতে চায়। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ঠকাচ্ছে, আর অন্যের কথা ছেড়ে দাও। ঠকা-ঠকি চলছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ওরে, যে অপরকে ঠকাতে যায় সে নিজেই ঠকে। ঠকাবার আগে সে নিজেই ঠকেছে!

চরিত্রই প্রধান। চরিত্র ভাল না হলে ধ্যান-জপে কি হবে? খারাপ কাজ করে এসেছ বলেই অশুদ্ধ মন—ভগবানে সংশয় আসে।

মানুষের সংশয় লেগেই আছে। সংশয় যাওয়া কি মুখের কথা? মানুষের সংশয় দূর করবার জন্য ভগবান শরীর ধারণ করেন।

আগের লোকেরা সংসারে পরস্পর মিলে-মিশে থাকতো—অবিশ্বাস করতো না। তাই সুখে থাকতো। আজকাল লেখাপড়া শিখে যত সংশয় হয়েছে—মিলে-মিশে আর থাকতে পারে না, তাই দুঃখও ভোগে।

# প্রার্থনা

ঠিক ঠিক প্রার্থনা করলে তিনিই টেনে নেন। তিনি ( ঠাকুর ) আমাকে ও রাখাল মহারাজকে প্রার্থনা করতে বলতেন। প্রার্থনা করলে বুঝতে পারা যায়—ভগবানই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ভগবান চান—পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবনের মূল্য তিনি বোঝেন।

যে ভগবানকে ডাকবে, ভক্তি করবে, তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, সে বুদ্ধিমান। তাঁকে অন্তরে অন্তরে নিজের অবস্থা জানাও, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। তাঁকে জানতে চাইলে, তিনিই কৃপা করে জানিয়ে দেবেন।

গুরুর কাছে, ভগবানের কাছে কামক্রোধ দমনের জন্য খুব প্রার্থনা করতে হয়। গুরুকে ভগবান মনে হলেই কাজ হল।

তাঁকে দুঃখ জানাবে বৈ কি। সংসারে ত তিনিই লাগিয়েছেন। তাঁর সংসারের জন্য খাটছি এইরূপ মনে করবে। তাঁকে দুঃখ জানাতে দোষ কি ?

ভগবানই কর্ম্মে লাগিয়েছেন, আবার তিনিই কর্ম্ম কাটতে পারেন। ভগবানকে অন্তরে জানাও, অবশ্য তিনি জানিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ডাকবে, না সাধুর কাছে এসে

মিছিমিছি বকা, এতে কি কোন ফল হবে? সন্ধ্যার সময় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ভগবানের নাম নিতে হয়। তাঁর কাছে সংসার-দুঃখ দূর করবার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। ··· সাধু এ সব লোকের সঙ্গ করবে না।

## সত্যকথা

সত্যকথা বলতে টেক্স লাগে না, খাজনা দিতে হয় না, তখন সত্যকথা বলবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? যারা একটা সত্যকথা বলতে জানে না, তারা আর ধর্ম্ম করবে কি?

যে ভয় করে, সংশয় করে, তার সংসারে কি ধর্ম্ম-জগতে কোথাও উন্নতি হয় না। এতে মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যিনি সত্যলাভের জন্য জগৎ আছে কি না আছে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে পড়েন তিনিই বীর, তিনিই শ্রেয়োলাভ করেন।

যারা একটা সত্যকথা বলতে পারে না, তারা আবার ধ্যান-জপ করবে কি? যারা ধ্যান করতে পারে না, তারা গরীব-দুঃখীকে যতটুকু পারে সাহায্য করুক—সেবা করুক। তাতে ভগবান খুশী হন।

হে জীব! সত্যকে ভালবাসবার চেষ্টা কর, সত্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর। ভগবান সত্যস্বরূপ—সেখানে মিথ্যা, হিংসা যেতে পারে না; সেখানে কোন ভেদ নেই।

# ব্যাকুলতা ও অনুরাগ

সংসারে ছেলে-মেয়ে ধন-দৌলত সব থাকতেও যাঁর ভগবানের জন্য অভাব বোধ হয়, তিনিই ভাগ্যবান। যে অভাব বোধ করে, সেই ভগবানকে ডাকে। এই সংসারে সাধারণ দেহ-সুখ নিয়েই ব্যস্ত। যতটুকু ভগবানকে ডাকা যায়, ততটুকুই ভাল।

দুঃখ জানাতে শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর ধন-জন কিছুরই অভাব ছিল না, তথাপি কি যে অভাব বোধ করতেন, তা আমরা কি বুঝবো?

হাবাতে সন্ন্যাসী, হাবাতে সংসারী হোস্ না। প্রত্যেকে আপন আপন আশ্রমের আদর্শ হতে চেষ্টা কর। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী হয়েছিস কি জন্য? বাপ-মাকে কাঁদিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে এসেছিস ঈশ্বরলাভের জন্য ত! সাবধান! তোদের এক-মুহূর্ত্তও বৃথা না যায়। তোদের যতক্ষণ শরীর থাকবে, ক্ষণকালের জন্যও অলসতাকে প্রশ্রয় দিবি না; তপস্যায় লেগে থাকবি। তোদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন। আড্ডা দিয়ে গুলতোনি করে বেড়ালে ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বরলাভ করতে হলে সাধন-ভজন চাই। নিঃসহায়, নিরালম্ব হয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বেড়িয়ে পড়। একটা নির্জ্জন স্থান দেখে তপস্যায় লেগে যা। সন্ন্যাসীকে নির্ভীক হতে হবে। সব মায়া পরিত্যাগ করতে হবে। দেহেরও মায়া পরিত্যাগ করতে হবে। পূর্ণ ত্যাগী না হলে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয় না।

'প্রীতিসে' ( প্রীতির সহিত ) সৎ কাজ করা আর বাধ্য হয়ে কাজ করা অনেক তফাত। যে প্রীতিসে কর্ম্ম করে, তার উন্নতি হবেই। প্রীতি-ভক্তিতে ভগবান বাধ্য হন। 'প্রীতিসে' প্রীতি বাড়ে।

ব্যস্ত হলে চলবে কেন? যদি ব্যস্ত হতে হয়, তবে ভগবানের জন্য হওয়া উচিত। বাজে কাজে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি?

## ভগবদিচ্ছা ও কৃপা

ভগবানের যুক্তি এক রকম, মানুষের যুক্তি আর এক রকম—অনেক রকম। ভগবান মানুষের যুক্তি অনুসারে চলতে পারেন না, তিনি ইচ্ছাময়।

ভগবান কাউকে বড় করেন, আবার কাউকে ছোট করেন। তার অর্থ কি? সংসারেই দেখা যায়, ধনী লোক মৃত্যুর সময় বিষয়-সম্পত্তি তার উপযুক্ত সৎপুত্রের হাতে দিয়ে যায়; কারণ সে জানে—এ ছেলেটা নিজেও খাবে, অপর ভাইদেরও দেবে; লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের দিয়ে যায় না—তারা নিজেরাও খাবে না, অপর ভাইদেরও দেবে না। সেই রকম, ভগবান এমন লোককে শক্তি দিয়ে বড় করেন, যার দ্বারা অপরের উপকার হবে।

ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকলে তিনি বাধাবিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—

কর্ম্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন ?

ভগবান কি গাছের ফল যে তাঁকে ইচ্ছামাত্রই পাবে ? তাঁকে পেতে হলে তাঁর কৃপা চাই, দয়া চাই। তাঁর কৃপালাভ করতে হলে সাধুদের ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ পেতে হয়। ভগবান আছেন বলে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করে যেখানে বসে ডাকবে, সেইখানেই পাবে।

ভগবানের মায়া বোঝা কঠিন। ক্ষুদ্র জীব হয়ত মনে করে—লাফিয়ে গাছে উঠি, চন্দ্র-সূর্য্য ডিঙ্গিয়ে যাই ! কিন্তু তারা বোঝে না, ভগবানের দয়া ব্যতীত কিছুই হয় না। তাই ত জীবের এত দুর্দ্দশা। তাঁকে ছেড়ে কি কোন কাজ হয় ?

ঈশ্বরের দাস ভিন্ন আবার কার দাস হব ? ঈশ্বরের দাস হলে হিংসা ( অহং ) চলে যায়, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব হয়—মোক্ষ হয়।

ধ্যান-জপ করবার যে ইচ্ছা, সেও তাঁর দয়া বুঝতে হবে।

অর্থ থাকবে অথচ সদ্বুদ্ধি হবে—এ ভগবানের কৃপা চাই।

বড় হব মনে করলেই কি বড় হওয়া যায় ? ভগবান যাকে বড় করেন, সেই বড় হয়।

ভগবানের কৃপায় ভগবান পাওয়া যায়। সাধন-ভজন করলে বোঝা যায়, তিনি সাধন-লব্ধ নন। তাঁর কৃপাই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়।

তপস্যা না করলে তাঁকে জানতে পারা যায় না। যত পবিত্র হবে, তত তাঁকে বুঝতে পারবে। সাধন না করলে তাঁকে কি বোঝা যায়?

ভগবান যাকে আরাম দেন, তাকে দুঃখ দেবে এমন সাধ্য কার?

গেরুয়া কাপড়ের মূল্য কেউ দিতে পারে না। ভগবানের বিশেষ শক্তি ও কৃপা না থাকলে কেউ গেরুয়া পরতে পারে না। তবে যার কাছে ভগবান মিথ্যা, তার কাছে ওর কোন দাম নেই। আধ পয়সার গেরুয়া রং কিনে গেরুয়া পরলেই হলো? হিংসা, মান, অপমান, রাগ যাতে না হয়, এই জন্য ত গেরুয়া পরা। যে-সে পারে না।

ঠাকুর যার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন, সেই বেঁচে যায়। কার সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য নিজের চেষ্টায় রক্ষা করে? ওকে (জনৈক ভক্ত) দেখলে বড়ই আনন্দ হয়—একে যুবক, তায় স্ত্রীর বয়স আঠার বছর, ভাই-ভগ্নীর ন্যায় আছে। ঠাকুরই রক্ষা করছেন।

বিশ্বাস কথাটা বড় শক্ত। যাবৎ ভগবানলাভ না হয়, ততদিন বিশ্বাস হয় না। যখন লাভ হবে, তখন সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধ থাকলেও বিশ্বাস টলবে না। ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে ভগবানলাভ হয় না।

বাপ কোন ছেলেকে খাটিয়ে বিষয় দেয়, আবার কাউকে না খাটিয়ে বিষয় দেয়। তেমনি ভগবান কাউকে কর্ম্ম না করিয়ে দয়া করেন, আর কাউকে কর্ম্ম করিয়ে দয়া করেন—সে ভগবানের খুশী।

তাঁর দয়া হলে কত উপদেশ পাবে! কিন্তু জীবনে প্রতিপালন না করলে কেবল উপদেশ শোনায় লাভ নেই।

ভগবানের ভালবাসা ভিন্ন দুঃখ দূর হয় না। জগতে কত বড় বড় লোক আছে, কিন্তু তাদের ভালবাসায় শান্তি হয় না। এ জন্য চাতকের উপমা দিয়েছেন। সে নদীর জলে শান্তি পায় না। যদি ভগবান ভালবাসেন—জন্ম হয় ভাল, না হয় ভাল; গরীবের ঘরেই হউক আর ধনীর ঘরেই হউক, সে শান্তিতে থাকে। একেই বলে গুরু, ইষ্ট, ভগবানের ( দয়া ) ভালবাসা।

মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করলেন। ওঁদের 'অসৎ' গ্রহণ করবার ও 'সৎ' দেবার ক্ষমতা আছে। ত্যাগী না হলে ওঁদের মর্ম্ম বুঝতে পারে না।

তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, তা হলে গরীব-ঘরেও ভিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি সন্তুষ্ট না হলে, ধনি-ঘরেও ভিক্ষা পাওয়া যায় না। তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন, ভিক্ষার অন্ন পবিত্র। তাই সাধুরা ভিক্ষা করে।

টাকা-পয়সার জন্য তপস্যা করতে হয় বৈ কি। কেউ এ সংসারে

একমুঠো খেতে পায় না, আবার কেউ দশজন লোককে খাওয়ায়। অন্ন দেওয়া খুব ভাগ্যের কথা। দাসত্ব করে যে পাঁচজনকে অন্ন দেয়, সে ভাগ্যবান পুরুষ; তার প্রতি ভগবানের যথেষ্ট দয়া আছে জানবে।

ঠাকুর বলতেন, ত্রিশ বছরের এ দিকে রক্ত বন্‌-বন্‌ করতে থাকে, সব ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল হয়; ঐ সময় ভগবান যাকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষা পায়। ত্রিশ বছর পার হলেই রক্তের তেজ কমতে থাকে। সাধন-ভজন ঐ সময়ের মধ্যেই করা দরকার। বয়স হলে কিছু হয় না। বুড়ো বয়সে কি ধর্ম্ম হয় রে?

ভগবান যাকে টাকা দেন, তাকে হয় ত ছেলে-পুলে দেন না; আবার হয় ত যে খুব গরীব, তাকে ছেলে-পুলে দেন। যাকে দুই-ই দেন, বুঝতে হবে তার ওপর ভগবানের দয়া আছে।

যখন জন্ম হয়েছে, তখন সুখ-দুঃখ আছেই। তবে ওরই মধ্যে যতটা হয় ভগবানের নাম নেওয়া ভাল। বসে বসে 'হা দুঃখ! হা দুঃখ!' করলেই কি দুঃখ চলে যায়? কর্ম্ম করতে হয়, তাঁকে খুব ডাকতে হয়। তাঁর দয়া হলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়।

ধর্ম্ম এক শরীরে হয় না। এ শরীরে কিছু হলো, পরে কিছু হলো। লোকে ভাবে, বুঝি এক জন্মেই হয়েছে। আবার তাঁর দয়া হলে, হয়েও যেতে পারে; তা আর অসম্ভব কি?

তপস্যা করলে কি ভগবান পাওয়া যায় ? তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

তাঁর দয়া হলে তিনি পাপীকে বিনা প্রায়শ্চিত্তেই ( পাপের ফলভোগ না করিয়েই ) মুক্তি দিতে পারেন। কাকে-ঠোকরান ফলও আবার পূজায় লাগে। তবে ডাকার মত ডাকিয়ে নেন। এটাই প্রায়শ্চিত্ত। সব মন-বুদ্ধি-আদির মোড় ক্রমে ফিরিয়ে দেন, যেমন জগাই-মাধাইয়ের দিয়েছিলেন।

## সাধুদর্শন ও তীর্থমাহাত্ম্য

তীর্থস্থানে নিদেনপক্ষে একটা শীত, একটা গ্রীষ্ম কাটান দরকার। বেশী দিন না থাকলে তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। আজকাল রেল কোম্পানীর কৃপায় যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়েছে ; এখন আর তীর্থ করতে কোন কষ্ট নেই। আগে রেল ছিল না, পায়ে হেঁটে তীর্থ করতে যেত ; যাবার আগে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেত। সে সময় বড় কষ্ট ছিল ; তাই লোকের ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। কষ্ট না পেলে ভগবানকে মনে হয় না। এই দেখ, এখন সুখে গাড়ী চড়ে আসে, একটা হৈ হৈ করে চলে যায়—ভক্তি-বিশ্বাস কিছুই নেই ! এখন তীর্থের নাম করে বেড়াতে বেরোয়, দু-চার দিন থেকে চলে যায়—তীর্থের মাহাত্ম্য কি বুঝবে ? এই কাশী-ক্ষেত্র দেখছো, আগেও দেখেছি; কত পরিবর্ত্তন হয়েছে ! তীর্থগুলো এখন বদমাইসের আড্ডা হয়েছে, তাই ভাল

লোকেরা বিশেষ থাকতে চায় না। ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি নিয়ে তীর্থে থাকতে হয়, তা না হলে অধঃপতন হয়। যত লোক পাপ করে যায়, সেই সমস্ত পাপ বিশ্বাস-হীনের ঘাড়ে চড়ে তাকে দুঃখ দেয়।

কারুর শরীর গেলে গঙ্গাতীরে কর্ম্ম ( শ্রাদ্ধাদি ) করা ভাল। কাশী যেমন তীর্থ, তেমনি গঙ্গা। এই সব জায়গায় কর্ম্ম করলে অনেক কল্যাণ। আর হিন্দু আমরা, আমাদের ঐরূপ একটা সংস্কারও রয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরকে যে না মানবে, তার কি হবে? তাঁর খুব মাহাত্ম্য। সেখানে মা কালী রয়েছেন, বিষ্ণু রয়েছেন, দ্বাদশ শিব রয়েছেন, মা গঙ্গা রয়েছেন—নিশ্চয়ই তীর্থ-ভূমি। আর তিনি নিজে অত দিন সেখানে থাকলেন, কত তপস্যা করলেন! কত সাধু, মহাত্মা ওখানে এসেছেন আর যত সব ভক্ত সব ত ওখানেই হলো, ওখানেই ত সব। দক্ষিণেশ্বর বাদ দিয়ে ঠাকুরের কোন কথা লেখাই চলে না; যেমন বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণের কথা লেখা, আর অযোধ্যা ছেড়ে রামের কথা লেখা নিষ্ফল।

স্ত্রী-পুত্রকে বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করাতে নিয়ে এসেছ, ভাল কাজ করেছ। কিন্তু এবার যখন কাশী আসবে, একলা এস। এখানে কিছুদিন সাধন-ভজন করতে চেষ্টা করবে। ঠাকুর বলতেন, নির্জ্জনে সাধন করতে হয়।

তুমি রবিবার অথবা ছুটীর দিন দক্ষিণেশ্বর কিংবা মঠে যাবে; কিছু ফল, মিষ্টি নিয়ে যাবে। ঐ সব জায়গায় গেলে বেশ উদ্দীপনা হয়, মন

পবিত্র হয়। ছুটী বা অবসরের দিন ঐ ভাবে কাটান ভাল বৈ কি! সকল সময় কি কাজ ভাল লাগে?

কাশী তপস্যার জায়গা, সখের স্থান নয়। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে লোক আসে, তবে থাকতে থাকতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, কারণ কর্ম্ম করে না। তীর্থস্থানে মিথ্যাকথা বলা, জোচ্চুরি করা উচিত নয়।

কাশী ছেড়ে যাবি কোথায় রে? এখানে যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা বিরাজ কচ্ছেন! বদরী-কেদার যেতে হলে কত কষ্ট-অসুবিধা ভোগ করতে হয় রে! তোর গুরুর জীবন দেখ না। তিনি এক স্থানে কেমন জীবন কাটালেন। আচ্ছা, ইচ্ছে হচ্ছে একবার ঘুরে আয়। আবার কাশীতেই আসবার চেষ্টা করবি। হেথায় সাধন-ভজন করলে অল্পতেই সিদ্ধি হয়। এ সত্য কথা। এখানে সাধন-ভজন কর, বিশ্বনাথের কৃপা পাবি। অন্যত্র যাবার দরকার কি? এখানে আর কিছু না হোক, দুখানা গেরুয়া কাপড় দেখলেও মনটায় উদ্দীপনা হয়।

মহাপ্রভুর পুরী-তীর্থবাস আর সংসারীর তীর্থবাস বহু তফাত। উনি শ্রেষ্ঠ অবতার; উনি জ্ঞান-ভক্তি দিতে পারেন। ... একসঙ্গে খেলেই যদি সকলে পরমহংস হত তা হলে আর ভাবনা ছিল না। পুরীতে যতক্ষণ বাস, ততক্ষণ ঐ সংস্কার থাকে। পুরী থেকে এলেই সেই জাতি, কুল, মান, শীল ইত্যাদি নিয়ে সংসারীরা ভেদাভেদ করে।

সাধুদর্শন, এ তীর্থ সে তীর্থ, কি বিগ্রহদর্শন ইত্যাদি প্রথমতঃ কিছুদিন

করে বেড়াতে হবেই। তা বেশ। তবে আদর্শটি ভুল না হয় এবং নিজের ভাব নষ্ট না হয়,—সেটি লক্ষ্য রেখে সব করতে হয়। নচেৎ সে স্থানে না যাওয়াই শ্রেয়ঃ। 'আপন ভাবে আপনি থাক, যেয়ো না মন কারু ঘরে।'

কাশীদর্শন করবে, এখানে ( কাশীতে ) তাঁকে নিয়েই সব। এখানে এসে ৺বিশ্বনাথদর্শন করতে হয়। ··· প্রত্যক্ষ দেখছি—জগৎটা মিথ্যা; তোমার কথা শুনব কেন? একমাত্র বিশ্বনাথই সত্য।

ঠাকুর বলেছেন—'ওরে, সাধুরা চার ধাম ঘুরিয়ে তবে চেলাকে কৃপা করেন। এখানে চার ধাম ঘুরতে হয় না। কোথায় যাবি? এখানে প্রসাদ পাচ্ছিস।' তখন আমার একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল।

## শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

মহাপ্রভুর উপদেশ—ত্যাগী হও, ভিক্ষে করে খাও, তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর কর। কয়েকজন মাত্র তাঁর এই হুকুম প্রতিপালন করেছিলেন। কার ইচ্ছা যে, সংসারের ভোগ-সুখ সব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ভিক্ষে করে খায়? তবে যার উপ্রর ভগবানের কৃপা হয়, সেই পারে।

চৈতন্যদেব জীবের দুঃখে কেঁদে বলেছিলেন—সংসারী জীবের গতি কোন কালে নাই। আরও বলেছিলেন—হে জীব! যদি সুখে থাকতে

চাও, তবে আমার কথা শোন। যতদিন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা চৈতন্যদেবের কথা শুনেছিল ততদিন সুখে ছিল, ভাল ভাল লোক জন্মেছিল, খাবার কোন কষ্ট ছিল না। এখন তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছে; ভাল ভাল লোক জন্মায় না, দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়েছে। বছরে বছরে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন হচ্ছে এবং কত লোক মারা যাচ্ছে, তবু হতভাগ্য জীবের চৈতন্য হয় না। এখনকার কর্ম্ম লোকের খারাপ, তাই কষ্ট পাচ্ছে। দেখ, চৈতন্যদেব স্বয়ং অবতার, তাঁরই কথা উড়িয়ে দিয়েছে। বলে—আমি মানি না। আর তোমার-আমার কথা কে শোনে ?

মহাপ্রভুর শিক্ষা—"নিজের ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা।" সাধন-বিষয় গোপন রাখতে হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, যাকে দেখলে আপনা-আপনি মন প্রফুল্ল হয়—সেই ভক্ত। আর যাকে দেখে আপনা-আপনি মন কুণ্ঠিত হয়—সে ঈশ্বরবিমুখ।

চৈতন্য মহাপ্রভু—ভগবান বল, বিষ্ণুর অবতার বল—লেখাপড়ায় খুব পণ্ডিত; তিনিই ভিক্ষে করে খেয়েছেন, তা জীবের কা কথা! তিনি মেয়েদের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন। যে সাধু হবে, সে ঐসব ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখবে।

## আচার্য্য ও প্রচারক

ভগবানের কৃপালাভ না হলে কি কেউ নেতা হতে পারে? তিনি যাকে নেতা করেন, সেই নেতা হয়।

অবতারদের কৃপায় কত পরমহংস হয়। অবতারেরা শরীর ধারণ করে দেখিয়ে দেন—তোমরা জগতে এসে কি কচ্ছ? তোমরা এই কর, তা হলে তোমাদেরও উন্নতি হবে।

## পিতৃমাতৃ-ভক্তি

জগতে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন মা। পরিবার গেলে পরিবার পাওয়া যায়, কিন্তু মা গেলে মা পাওয়া যায় না। কাজকর্ম্ম করে ঘুরে ফিরে এসে মার সঙ্গে কথা বললে প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়। ঐহিক সুখ ত্যাগ না করলে মাতৃ-ভক্তি হয় না। মার চেয়ে বেশী ভালবাসেন—ভগবান।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, মুক্তিদাতা, কর্ত্তা, বিধাতা। তিনিও সংসারে জন্মগ্রহণ করে পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন, তাঁদের ভরণ-পোষণ করেছিলেন। হে জীব! তোমরাও পিতা-মাতাকে ভক্তি কর, পূজা কর। যে পুত্র ঐরূপ করে, সেই ভাগ্যবান।

লোক ধর্ম্ম করবে কি?—গর্ভধারিণীকে টাকা দিতে কষ্ট হয়, যাঁর দয়ায় জগৎ দেখেছে। ঠাকুর বা সাধু-সেবার কথা ছেড়ে দাও। মা ছেলের জন্য কত কষ্ট করেন, তা সব ভুলে যায়।

যে বাপ-মাকে মানে না, তার ধর্ম্ম কোনকালে হবে না। এমন সব অকৃতজ্ঞ ছেলে-মেয়ে আছে যে, বাপ-মার অসুখের সময় ফেলে চলে যায়। হয়ত সেই বাপ-মার সঙ্গতি আছে, ছেলেকে উপায় করে খাওয়াতে হয় না। তাঁরও আদেশ রয়েছে যে, বাপ-মার জন্য চাকরীও করতে পার। চাকরী করে খাওয়ান দূরে থাকুক, খালি দেখা-শুনা করবে—এই সামান্য কষ্টটুকুও পারে না। তার ধর্ম্ম কি হবে? কর্ম্ম না থাকার জন্য এই দুর্দ্দশা। কর্ম্ম (তপস্যা) থাকলে বুঝতো।

উপকার করলে ভুলে যায়। দেখ না, যে বাপ-মা প্রাণ দিয়ে সন্তান লালন-পালন করে, কিন্তু শেষে সেই সন্তানই বাপ-মা ভুলে যায়, অন্যের কথা দূরে থাক। এরই নাম কলি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান রামচন্দ্রের জীবন যে জানে, সে বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবেই। এঁরা জীবের শিক্ষার জন্য বাপ-মাকে পূজা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি যত অবতার তাঁদের হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এঁরা বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানতেন। যে বলে আমি বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি না—সে পশু।

# কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

দোষ-গুণ সকলেরই আছে। তা না হলে জন্ম হবে কেন? সৎ কি অসৎ কর্ম্ম—যাই কর, তার ফলভোগ করতে হবে। তবে অসৎকর্ম্মের চেয়ে সৎকর্ম্ম করাই ভাল; সৎকর্ম্ম ভগবানের দিকে নিয়ে যায়।

কর্ম্ম না করলে কি চলে? ভগবানই আমাদের কাজের মধ্যে রেখেছেন—তিনিই ইচ্ছা করলে আমাদের কর্ম্মের পাশ কেটে দিতে পারেন। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেই কি কর্ম্মপাশ কাটে? আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার যো কি? সেইজন্য আমাদের তাঁরই কর্ম্ম জেনে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কাজ করতে হবে।

গুণ গ্রহণ করবার ক্ষমতার নাম পাণ্ডিত্য। ভগবান সকলের গুণ গ্রহণ করেন। আর যিনি ঐরূপ করেন, তিনিও তাঁর দাস—পণ্ডিত।

ভগবানের দয়া না হলে ঠিক ঠিক কর্ম্ম হয় না। তিনি যাঁর প্রতি কৃপা করেন, তাঁকে দিয়ে কর্ম্ম করিয়ে নেন। হিংসা করলে কি হবে—যিনি কর্ম্মী, তিনিই বড় হন। 'অমুকের মত বড় হব' মনে করলেই কি বড় হয়? তাঁরা কত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছেন, তবে না বড় হয়েছেন! কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে ভগবান ঘৃণা করেন। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। যে বেশী কর্ম্মী, তাঁকেই বেশী করে খেতে-পরতে দেন। কর্ম্মতেই বড় করে, আবার কর্ম্মতেই ছোট করে। মানুষ কি আর ভাল-মন্দ আছে?—কর্ম্মই হল প্রধান। কর্ম্মের জন্য কেউ বা পূজা পাচ্ছে, কেউ

বা গাল খাচ্ছে। যাঁরা কর্ম্ম করে পূজা পান, তাঁরাই ধন্য। যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, তাঁরা বলেন কর্ম্ম না করলে কি চলে? ভগবানই কর্ম্ম লিখেছেন—তিনিই আবার কর্ম্ম কাটেন। 'করম্‌সে' করম্‌ কাটে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। কর্ম্মের দ্বারাও ভগবানকে বুঝা যায়।

যার ভোগ আছে সে ভুগবেই। বাধা দিলে কি হবে? মাঝে থেকে অপরের বিষ-নজরে পড়া। ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাক, তা হলেই কল্যাণ হবে।

ভগবান জীবের কর্ম্ম দেখেন, জন্ম দেখেন না। বামুনের ঘরে জন্মে যে সৎকর্ম্ম না করে, তাতে কি হবে? নীচ-ঘরে জন্মে যে সৎ কর্ম্ম করে, ভগবানকে ভক্তি-বিশ্বাস করে, তার জন্ম সার্থক।

জীব কর্ম্ম করতে বাধ্য। সৎ কাজ করলে নিজেরও কল্যাণ, পরেরও কল্যাণ। আর অসৎ কাজ করলে নিজের এবং অপরের সকলেরই অকল্যাণ।

কর্ম্মের দ্বারা জীব হয়, কর্ম্মের দ্বারাই দেবতা হয়।

কার দ্বারা ভগবান কি কর্ম্ম করান তার কি কিছু ঠিক আছে?—

পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারেও কর অধোগামী।
( সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি )

ভগবানকে প্রাণভরে ডাকলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। বাজে গল্প না করে ভগবৎ-চর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা কর, নিজেরই কল্যাণ হবে। এমন কর্ম্ম করতে হয়, যাতে ভগবান খুশী।

যতদিন বাঁচতে হবে, ততদিন কর্ম্ম করতেই হবে। কর্ম্ম না করে উপায় নেই। সাধুরা ভগবানের কর্ম্ম করেন, গৃহস্থেরা সংসারের কর্ম্ম করেন; তবে যদি ভগবানে মন থাকে, তা হলেই বাঁচোয়া।

মানুষ সবই এক, কেবল কর্ম্মেই পৃথক করেছে। ভগবানকে যতটুকু দেবে, ততটুকু পাবে। চার আনা দাও, চার আনা পাবে; ষোল আনা দাও, ষোল আনাই পাবে।

অসৎ কাজ করলে ভয় আসবে—দুঃখ পাবে। সৎ কাজ করলে ভগবানের দিকে মন যায়, শান্তি পায়। সৎকর্ম্মী নির্ভীক হয়।

কর্ম্মের পথ ও মত কারুর মিল হয় না। তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক হতে পারে। যে কর্ম্মের পথ ও মত মিল করতে চায়, সে নির্ব্বোধ।

সৎকাজ যত হয়, ততই সুখের বিষয়। সৎকাজ করতে প্রথমে কষ্ট হয়, ভবিষ্যতে আরাম হয়। আর অসৎ কাজ করতে প্রথমে আনন্দ হয়, ভবিষ্যতে দুঃখ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন। খুব কাছে

আছেন অথচ জানতে দিচ্ছেন না যে তিনি ভগবান। "হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম কর, আর আমার দোহাই দাও, তা হলে আমাকে বুঝতে পারবে।"

'ঠাকুর ঠাকুর' বললে কি হবে?—কর্ম্ম কর। সব তাঁর (পরমহংসদেবের) নকল এখনি করছে। এটা ভারী খারাপ। আসল জিনিসের দিকে একেবারে লক্ষ্য নেই।

কর্ম্ম দেখেই লোকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করে। সৎকর্ম্ম করলে লোকে কেন বিশ্বাস করবে না? সৎকর্ম্মের নামে অসৎ কর্ম্ম কর, এই জন্যই ত লোকে অবিশ্বাস করে। মনের সব রকম জুয়াচুরি ছেড়ে দিয়ে যদি সরলভাবে কেউ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তা হলে তাকে বিশ্বাস না করে মানুষ থাকতে পারে না। স্বামীজী বলতেন—চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না। স্বামীজীর কর্ম্ম দেখে অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস হয়েছে। সেখানে জুয়াচুরি নেই, তাই লোকে তাঁর কথা বিনাবাক্যে মাথা পেতে নিচ্ছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—দয়া আমার কোথায়? যেখানে যার দ্বারা সম্ভব কর্ম্ম করিয়ে নিই। জীবের দোষ কি? অমুকে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে দেখে হিংসা হয়। কর্ম্ম করেছে, তাই ত গাড়ী-ঘোড়া চড়ছে। এমন কি কর্ম্ম করেছ, যাতে ভুগছো? আবার হিংসা করলে কর্ম্মফল ভুগতে হবে। গুরু দুই-ই বলছে—যেমন কর্ম্ম করবে, তেমন ফল ভুগতে হবে।

জীবের উপকারের জন্য যে বাসনা, তাতে বন্ধন হয় না। নিজের জন্য যে-কোন বাসনাই বন্ধন।

ভগবান কি কারও শত্রু হন? তবে খুব অত্যাচার করলে শাসন করেন। যেমন মা ছেলেকে শাসন করেন।

ভগবান লাভ হলে কেবল আনন্দ—সে যে কি আনন্দ, তা আর বলবার নয়! যত পাওয়া যায়, ততই পেতে ইচ্ছা হয়। সে আনন্দের সাগর! আর কি বলব! কর্ম্ম ( সাধন ) না করলে বুঝা যায় না।

তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন যে, সাধুরা শেষকালে জীবে দয়া নিয়ে থাকেন—যতটুকু জীবের কল্যাণ হয়; তখন নিজেদের বিষয় একেবারে ভুলে যান।

কর্ম্ম করলে কারও অহঙ্কার যায়, কারও অহঙ্কার বাড়ে। নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানের দয়া না হলে করা যায় না।

ভগবানকে কি সহজে পাওয়া যায়? কর্ম্ম চাই। লিখলে-পড়লে কিছুই হয় না। কর্ম্ম ( সাধন ) চাই। নিজের অন্তরে অনুভব করতে হয়—পড়াশুনার কর্ম্ম নয়, শুদ্ধকর্ম্ম ( সাধন ) চাই।

গুরু-মুখে—শাস্ত্র-মুখে শুনেছি যে, জীবাত্মা দুঃখ পায়। এমন কর্ম্ম করতে হয়, যাতে আত্মা সুখে থাকে।

মানুষ আপনার কর্মে আপনিই ভোগে—মনে করে, লোককে ভোগাবে কিন্তু নিজেই ভোগে। অপরকে ঠকিয়ে মনে করে সে বুদ্ধিমান। ঠকান-বুদ্ধি ভাল নয়।

সাধু হলে কি রোগে ছাড়ে? তার কর্ম্ম তাকে ভোগাবেই। আমি ত জ্ঞানতঃ কারও অনিষ্ট করি নি, ( অনিষ্টের ) চিন্তাও করি নি; দেখ না—কি রোগে ভুগতে হচ্ছে! প্রারব্ধ কাউকে ছাড়ে না।

## সৎ-সঙ্গ, সাধন-ভজন ও নিষ্ঠা

সৎ-সঙ্গ করলে কি হয় জান? সৎ-সঙ্গ করলে সদ্‌বুদ্ধি হয়, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস হয়, হিংসা-দ্বেষ চলে যায়, পরস্পরে ভাবের আদান-প্রদান হওয়ায় কু-ভাব চলে গিয়ে সু-ভাব আসে, জপ-ধ্যান করবার ইচ্ছা প্রবল হয়। সৎ-সঙ্গ—সৎ হবার উপায়। কথাতেই আছে, 'সৎ-সঙ্গে কাশীবাস' হয়। সকলে সৎ-সঙ্গের ফল একদিনেই বুঝতে চায়। তা কি একদিনেই বুঝা যায়? একটু একটু করে জমতে জমতে সৎটা প্রকাণ্ড হয়ে যায়, তখন লোকে বুঝতে পারে।

হাজার ত্যাগী হোক না কেন, মৃত্যুর সময় যা ভাববে, তাই হবে। সেই জন্য যতদূর সম্ভব, সৎ-চিন্তা করা উচিত; তা হলে মৃত্যুর সময় সৎভাবই মনে আসবে।

যত অবতার বলছেন—'সাধু-সঙ্গ কর।' ঠিক ঠিক সাধু ভগবান-লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

।

ভগবানের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি হওয়া বড় কঠিন। তাঁর কৃপা না হলে হয় না। সেই জন্য সাধুরা কি করে তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—বুঝতে হয়, তাঁদের জীবন দেখতে হয়, আলোচনা করতে হয়। সেই জন্যই যত অবতার বলছেন—'সাধু-সঙ্গ কর।'

সদ্‌গ্রন্থ—যাতে ভগবানের কথাবার্ত্তা আছে, তাতে সৎ-সঙ্গের কাজ করে। সকল সময়েই ত আর ভগবানের নাম করতে পারা যায় না, সেইজন্য ঐরূপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের স্মরণ-মনন করা হয়; যারা দিনরাত ভগবানের নাম করতে পারে, তাদের সহিত ভগবানের কি তফাত?

ভগবানের নাম যত করতে পারা যায় ততই ভাল। বেশী না করতে পারলে অন্ততঃ সন্ধ্যায় হাত-তালি দিয়ে ভগবানের যে-কোন নাম, যা ভাল লাগে করা উচিত।

সৎলোকের সহিত সদালাপ করলে ভগবান খুশী হন, তাতে সদ্বুদ্ধি হয়। বদ্ লোকের সহিত অর্থাৎ ভগবানে অবিশ্বাসী লোকের সহিত আলাপ করতে নেই, তাতে অসদ্বুদ্ধি জন্মায়, তাঁকে ভুলে যেতে হয়।

কিছুদিন জপ-ধ্যান করে ভগবানলাভ (আত্মানুভূতি) হল না বলে জপ-ধ্যান ছেড়ে দিতে নেই। ছেড়ে দিলেই তুমি ঘোর নাস্তিক হয়ে দাঁড়াবে। মনের অবস্থা যখন ঐরূপ হয়, তখন বড় বড় সৎলোকের কর্ম্ম দেখতে হয়, মনকে বোঝাতে হয়—তাঁরা যখন ঐ উপায়ে ভগবান লাভ করেছিলেন, তখন আমিই বা লাভ করবো না কেন? তাঁদের জীবন আদর্শ করে আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেতে হয়। অধ্যবসায়ে কি না হয়?

মুখে অনেকেই বলে থাকে যে, তারা ইচ্ছা করলেই তাদের কুসংস্কারগুলো নাশ করে ফেলতে পারে, কিন্তু সংস্কারনাশ করনেওয়ালা ত একটাও দেখি না। যার সংস্কারনাশ হয়েছে, সেই অন্যের সংস্কার নাশ করতে পারে। এই জন্য ঐরূপ সৎসঙ্গের দরকার হয়। কেবল সাধুদের কাছে যাতায়াত করলে তাঁদের সদ্গুণে কুসংস্কার আস্তে আস্তে চলে যায় এবং সুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠে। তবে শুধু বৈদ্যের বাড়ী গেলে কি হবে? ঔষধ এনে খেতে হবে, তবে না রোগ সারবে। কেবল সাধুর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি হবে? তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে তদনুরূপ কর্ম্ম করতে হয়, তবে ত হয়।

সকল বিষয়ে সংযম-অভ্যাস করতে করতে ভগবানের দয়া হয়। সংযম না করলে কি হয়? কিছু হয় না।

আপন খেয়ালে চললে মানুষ বিগড়ে যায়। ভগবানের বা সাধু-সজ্জনের উপদেশ মত চললে মানুষ বেঁচে যায়।

সৎসঙ্গের এমনি মাহাত্ম্য যে, কীটও নারায়ণের মাথায় ওঠে, কারণ সে ফুলের সঙ্গে থাকে। তাই ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—সৎসঙ্গ কর। সৎসঙ্গে ভগবানের দয়ালাভ হয়।

ত্যাগী পুরুষের উপদেশ পেলেও সংযমী না হলে কিছুই ধারণা হয় না।

শাস্ত্রে মন্ত্র তো অনেক লেখা আছে। তাতে কি হবে? মহাপুরুষের নিকট হতে ঠিক ঠিক উপদেশ গ্রহণ করলে জীবন মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়।

রাসলীলা বোঝা বড়ই কঠিন। ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত-শুদ্ধি না হলে বোঝা যায় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন—যদি আমার উপদেশ ঠিক ঠিক গ্রহণ কর, তা হলে তুমি বেঁচে যাবে। এতে যদি সংশয় হয়, তা হলে সাধু-সঙ্গ কর, বুঝতে পারবে।

হাজার টাকা যদি রোজগার কর, আর আত্মা যদি সুখে না থাকে—দুঃখ পায়, তা হলে টাকা রোগজার বৃথা। আত্মা সুখে থাকলে ভগবান সুখী হন।

মুক্ত আত্মাকে, পবিত্র আত্মাকে ভগবান ভালবাসেন। ভগবান বলছেন—হে জীব! যে আত্মা আত্মাকে (আমাকে) জানে, তার সঙ্গ কর। যে আমায় না জানে, তার সঙ্গ করো না।

তুমি যে নামে ইচ্ছা, তাঁকে ডাক না, তবে গুরুর আদেশ মত চলবে।

দিবাভাগে সাধুরা পেট ভরে খাবে। রাত্রিতে জল খাওয়ার মত খাবে। সাধুরা রাত্রিতে সাধন-ভজন করে। তখন নিস্তব্ধ থাকে—তাই ঐ সময় সাধন-ভজন করা উচিত; সাধুরাও তাই করে। গৃহস্থেরা দিবাভাগে কম খায়—এ সময়ে তাদের কাজ করতে হয়। রাত্রিতে তারা বেশী খায়, আর ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমায়। শরীর-রক্ষার জন্য খাওয়া ও ঘুমান চাই। ঠাকুর বলতেন—কলিতে অন্নগত প্রাণ। রাত্রে চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমুলে যথেষ্ট হয়। রাত্রে ঠাকুর আমাদের জোর চার-পাঁচখানা প্রসাদী ছোট লুচির বেশী খেতে দিতেন না।

চণ্ডী-পাঠ খুব ভাল। কিন্তু পাঠ করবার সময় যেন কোনরূপ কামনা না থাকে। খুব ভক্তি নিয়ে পাঠ করতে হয়। গৃহস্থের চণ্ডী-পাঠ সাবধানে করা উচিত। যদি ঠিক ঠিক চণ্ডী-পাঠের নিয়মগুলো মানতে না পারে, তা হলে অমঙ্গল হয়। আর যদি শুদ্ধমনে নিয়ম-মত পাঠ করতে পারে, তা হলে কল্যাণ হবেই।

বড়লোকের সৎ হওয়া খুব দরকার, তা হলে অনেক লোক—দীন দরিদ্র অন্ন পায়। এ জন্য সৎসঙ্গ করতে হয়। কিন্তু বড়লোকের সৎসঙ্গ জোটে না, যত অসৎ লোক তার বন্ধু হয়, আর তাকে বিগড়ে দিয়ে মাঝখান থেকে নিজেরা আমোদ করে নেয়। এই সঙ্গ-দোষে বড়লোকের প্রায়ই ধর্ম্ম হয় না। যুবা বয়স থেকে যদি বুঝতে পারে,

সৎপথ ও সৎসঙ্গ আশ্রয় করে, তাহা হলে কল্যাণ হয়। টাকার ত কোন অভাব নেই, তাই ইচ্ছা হলেই অনেকেরই কল্যাণ করতে পারে।

বেশী রাত্রি জাগলে—চিন্তা থাকলে রোগ ত হবেই। চিন্তা থাকলে কি খাওয়া যায়? চিন্তা বড় খারাপ। চিন্তাতেই দুঃখ দেয়। তবে সৎ আর অসৎ চিন্তায় প্রভেদ আছে। সৎ চিন্তা উন্নতির পথে নিয়ে যায়, আর অসৎ চিন্তা অবনতির পথে নিয়ে যায়। চিন্তা করতে করতে মানুষ খতম হয়ে (মরে) যায়। তাঁর কথা কি মিথ্যা? দুটো খাওয়ার সংস্থান থাকলে দাসত্ব করা খারাপ। তা হলে বেশী চিন্তা করতে হয় না। রোজগার করেও কি সুখ আছে? মনের স্ফূর্ত্তি না থাকলে শরীর ভাল থাকে না, যা খায় তা হজম হয় না, নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মনে স্ফূর্ত্তি থাকলে শরীর আনন্দে থাকে, যা খায় তা হজম হয়—বল হয়।

যদি সাধন-ভজন করার ইচ্ছা থাকে, তবে নির্জ্জনে চলে যা। গুলতোনীর মধ্যে থাকিস্ না। ওতে কিছু হবে না। তৈরী ভাত খাবে, আর আড্ডা দিয়ে বেড়াবে? আহাম্মকেরা বোঝে না যে, এতে কত অপকার হয়। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিস্—তা ভুললে চলবে না।

ভগবানের যেমন জাত নেই, সাধুরও তেমন জাত নেই। সাধুর দ্বারা ভগবান প্রকাশ হন। সাধুর দোষ ধরতে নেই। তার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কেমন, তাই দেখতে হয়। সাধু লোকলজ্জা, বিষয় ছেড়ে ভগবান পাবার জন্য ফকির হয়েছে। সংসারী আর সাধু—বহু তফাত!

রামচন্দ্র, মহাবীর—এ সব সৎ-মায়া। এ মায়ায় কি ক্ষতি করে? মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। তাঁদের বিষয় ভাববে বৈ কি! এ সংসারের বাজে বিষয় ভেবে কি হবে?

ধ্যান-বিঘ্ন (চিত্তের লয়-বিক্ষেপ) দূর করতে হলে মনটাকে খুব দৃঢ় করে আসনে বসতে হয়। এ ভাবেও নিগ্রহ না হলে আলস্য নষ্ট করার জন্য চোখে জল দেবে অথবা অন্যত্র সামান্য একটু ঘুরে এসে পুনরায় আসনে বসবে। নিজ আসনে বসে তন্দ্রাদি বিঘ্ন দূর করাই ভাল—তাতে ভাব (স্রোত) নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম। জপান্তে ঘুম আসে, মেরুদণ্ড টনটন করে। তখন একটু উঠে পায়চারি করবে—ফের বসবে। এ হচ্ছে সাধন করবার নিয়ম। তা না হলে মন বসে না। শরীর বেশী গরম হলে নিদ্রায় কারো কারো শারীরিক ক্ষতি হয়।

অন্তরে ত্যাগ খুব ভাল—লোকে জানতে পারে না যে ত্যাগী, তাতে অভিমানাদি বিঘ্ন আসতে পারে না। তবে এ বড় শক্ত। বাহিরের ভোগটা কখন যে চুপে চুপে অন্তরে ঢুকবে, তা ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়। প্রথমতঃ অন্তর্ব্বহিঃ-ত্যাগ অভ্যাস করা সহজ নয়। প্রকৃত বৈরাগী—উত্তম অধিকারীকে শেষে আর কিছু আটকাতে পারে না। তাঁরা বালকবৎ ত্যাগ, ভোগ সকলই করেন—কিছুতেই লিপ্ত নন।

ভগবান বলছেন—নির্ব্বোধেরা দোষকে গুণ দেখে, আর গুণকে দোষ দেখে। এই হল সংসারের খেলা। এই জন্য সৎসঙ্গের দরকার।

এইটি বিচার করে নেওয়া উচিত। সদ্বুদ্ধি হলেই ভগবানকে মানবে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হবে। অসদ্বুদ্ধি হলে নিজের মেজাজ (বুদ্ধি) খারাপ হয় ও কষ্ট পায়।

সাধু না হলে সাধুর দুঃখ বোঝা যায় না। সাধুরা কত কষ্ট করে; তবে ভগবানের দয়া পায়।

এই বিড়ালই বনে গেলে আবার বন-বিড়াল হয়। সৎসঙ্গ করতে করতে মানুষই দেবতা হয়। ৺কাশীধামে এসেছ, তর্ক করার দরকার নেই, ধ্যান-জপ কর। ধ্যান-জপ এমনি গোপনভাবে করতে হয়, যেন স্ত্রীও জানতে না পারে যে, ধ্যান-জপ করছে। রাত্রি ৩টা হতে ৬টা অবধি বেশ প্রশস্ত সময়, আর সন্ধ্যায় করবে।

সাধু-সঙ্গ প্রথম সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে, শেষে ক্রমশঃ বুঝতে পারা যায়—সৎসঙ্গের কি ফল! ঠাকুর বলতেন—এ দিকে যতটা উন্নতি হোক-না-হোক, ওদিকের জন্য যতটা পারিস্ উন্নতি করে নিবি। জীবনে অনেক ঢেউ আসবে—কখন অবিশ্বাস, কখন নাস্তিকতা, কখন হতাশ ভাব। কিন্তু খুব সাবধান, গুরুদত্ত নামটি ছেড়ো না। সাধনা করতে করতে বায়ু স্থির হয়ে কুম্ভক হয়ে যায় এবং মনটা খুব শান্ত হয়। ঐ অবস্থা সাধনার শেষ নয়। আরও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

সাধুরা সকলে সুখের জন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে এসেছে। সাধুকে দিক্ কর কেন? কত কষ্ট করে তবে না একটু আনন্দ পাচ্ছে! তোমরাও

উপদেশ নিয়ে কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করলে, সংযমী না হলে কি বুঝবে?

নাক টেপা-টেপি করলে কি হবে? ধ্যান-জপ কর, আপনা-আপনিই কুম্ভক হবে। এদিকে নাক টেপে, ওদিকে মহা অসংযমী! তাই ত কিছু হয় না।

একটু কঠোর—কষ্ট স্বীকার না করলে কিছুই হয় না। সেইজন্য লোকে চারধাম করে আসে। চারধাম করে এলে গুরুর উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, তাঁর মহিমা বুঝতে পারা যায়। গুরু কৃপা করলে জগতে যা না হবার তাই হয়। ধ্রুব পাঁচ বছরের বালক, তার মা ও গুরুর কৃপায় ভগবানলাভ করলে, আবার একটা ধ্রুবলোক হয়ে গেল।

সাধন-ভজন করতে পার তো খুব ভাল কথা, আর না পার—খাও দাও, কারুর অনিষ্ট করো না, হিংসা করো না। হিংসাই পাপ। সংসার-সম্বন্ধেই হোক আর ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই হোক, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কর। হিংসে ছাড়।

নিজের বাপ-ভাইয়ের উপরই প্রীতি হয় না, তা ঠাকুর-দেবতার ও গুরুর উপর হওয়া কি কম কথা? যার হয় সে কত বড় ভাগ্যবান! একটা নিষ্ঠা চাই। লেগে থাকতে হয়—আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই। তা হলে উন্নতি হবেই।

মানুষ আশায় বেঁচে আছে—সংসারে মহাজ্বালা—মহাকষ্ট। দশ

জন অসৎ আর এক জন সৎ হলে, সে মারা যায়। দশ জন সৎ আর একজন অসৎ হলে, সে সৎ হয়। সঙ্গগুণ এমন—ভাল হলে লোকে কিছু বলে না, মন্দ হলেই মুশ্‌কিল।

সংস্কার যায় কিসে?—ভগবানের নাম-গুণ-গান, সাধু-সঙ্গ, ধ্যান-জপ ইত্যাদি করলে।

তিনি নিরাকার ত আছেনই, সাকারও আছেন। আমি সাকারবাদী। কোন খ্রীষ্টান ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে—তাঁকে যে সাকার বলছেন, তাঁকে কি দেখা যায়? আমি বললাম—খুব জোর করে বলছি, হাঁ, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা হয়, যেমন তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে। সময়ে সময়ে তোমার মনে গোল হয়, কার ধ্যান করবে। কাকে তুমি বিশ্বাস কর? যীশুখৃষ্ট এবং ঠাকুরের উপর বিশ্বাস আছে? বরাবর কাকে বিশ্বাস করে এসেছ? তোমরা খ্রীষ্টান, যীশুখ্রীষ্টকে মান। বেশ, তাঁকেই ধ্যান করবে। তাতেই তোমার সব হবে। এক জনকে ধরে থাকলে তোমার সব হবে।

খুব সাধন-ভজন ছাড়া আর কি করবে? আমাদের মধ্যে কালী (অভেদানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি খুব কঠোর করতেন—এখনও করেন। বিবেকানন্দ স্বামীর ত তুলনা নেই। এইসমস্ত জীবন দেখলে জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝতে পারা যায়; বুঝলেই আর কিছু বখেড়া (গোল) থাকে না। দ্বেষ-হিংসা দূরে গিয়ে মনটা বড় হয়।

তপস্যা করবে কি ? তপস্যার কথা মুখে এনো না। তপস্বীদের শরীর, মনের গঠন আলাদা। তবে যতটুকু ভগবানের নাম করা যায়, ততটুকুই ভাল, ঐ ছাড়া তোদের আর গতি নেই।

মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা? ভগবানের বিশেষ কৃপা। তোদের যখন তা জুটেছে, তখন হৈ-চৈ করে বৃথা সময় নষ্ট করিস নি। গান গাইতে পারিস্, গানের ভেতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মেলবার চেষ্টা কর না। গান কি কম? দেখ না, মীরাবাই গান করে ভগবানলাভ করলে! এ রকম অনেক মহাপুরুষ আছেন।

জপ-ধ্যান করতে করতে আলস্য, জড়তা, তন্দ্রা এসে থাকে—ওটা শরীরেরই ধর্ম্ম। এইসব জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে; না হয় একটু-আধটু পায়চারি করলে আলস্য চলে গেলে তখন আবার বসবে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐসব আপদ চলে যায়।

ভগবান জীবকে শক্তি দিয়েছেন। যে ঐ শক্তি সৎ দিকে নিয়ে যায়, সে সৎ হয়; আর যে ঐ শক্তিকে অসৎ দিকে নিয়ে যায়, সে অসৎ হয়।

সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যান-ভজন করবে। এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে, আর তাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে। এ সময়ের তুল্য সাধন-ভজনের সময় আর নেই। দিবসের অপর ভাগে তেমন মন স্থির হয় না।

নির্জ্জনে একা সাধন-ভজন করতে হয়। অধিক লোকের মধ্যে সাধন-ভজন হয় না। তাতে উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়ে থাকে। মঠে জীবন-গঠন করবার পক্ষে বড় সুবিধা। মঠের মত জীবন-গঠন করবার এমন স্থান আর নাই। চিত্তের দৃঢ়তা হলে তারপর সাধন-ভজন একাকী করবে। সাধুর থাকবার জন্য চিরদিন মঠ নয়। নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ হয়ে কিছুদিন না থাকলে সাধুর ভাব ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে না।

শুধু বই পড়ে বড় বড় কথা বললে কি হবে? অমুক অমুক-কথা বলেছে, সে সে-কথা বলেছে; তোমার কি অনুভব হয়েছে বল দেখি? বিদ্যা-শিক্ষা করা ভাল। কিন্তু সাধন-ভজন না থাকলে বিদ্যাই অবিদ্যা হয়ে যায়। বই মুখস্থ করে লেকচার দেব, কাগজে লিখব—এসব পাগলামি ছেড়ে সাধন-ভজনে লেগে যাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করে কাটিয়ে দাও। ঠাকুর স্বামীজীকে ত অত ভালবাসতেন, তবুও স্বামীজীকে কত কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল শুনেছ ত? আর তোমরা সাধন-ভজন না করে শুধু কতকগুলো বই পড়ে স্বামীজীর মত হতে চাও? আমার কাছ থেকে কৃপা চাচ্ছিস্, আমি কৃপা করবার কে? তোর ভাল না লাগে কাল থেকে তুই আসিস না। স্বামীজীর নাম শুনেছিস ত—যাকে পৃথিবীশুদ্ধ লোক মানছে? তিনিও ঠাকুরের কৃপায় স্বামীজী। কৃপা করবার মালিক ঠাকুর। তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা কর। তিনি কৃপা করবেন।

তিনি (ঠাকুর) বলতেন—বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে ভাব নষ্ট হয়। জোর করে কি ভাব হয় রে? ওটা সাধনের জিনিস, খুব সাধন করে লাভ করতে হয়।

## সৎকথা

সৎ-লোককে সকলেই ভালবাসে। সৎসঙ্গ কল্যাণকর। অহরহ সৎসঙ্গ করবে। সৎসঙ্গই মানুষকে সংসারের সুখ-দুঃখের পারে নিয়ে যায়। সাধু, ভক্ত, ধনী ও দোকানদার—এরা সব ঠাকুর-দেবতার ফটো রাখে। সাধু ও ভক্ত সেই ফটো পূজা করে অর্থাৎ সেই চিত্রের ভাব হৃদয়ে ধারণ করে জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে এবং জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করে কৃতার্থ হয়। আর অপরে ঘর সাজাবার জন্য রাখে; তাদের জ্ঞান, ভক্তি কিছুই হয় না। দেখ, একই জিনিস ব্যবহারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিচ্ছে। ভগবান বলছেন—হে জীব! জিনিসের প্রকৃত ব্যবহার শিখতে হলে সাধু-সঙ্গ করতে হয়, তবে ত জিনিসের ব্যবহার ঠিক ঠিক শিখতে পারা যায়। জোর করে বলছি—সাধু-সঙ্গ চাই।

সৎ-চিন্তার ফল সৎ-ই হয়ে থাকে। এজন্য সদা-সর্ব্বদা সৎ-চিন্তা করা উচিত। অসৎ চিন্তা একেবারেই করবে না। সেজন্য সাধু-সঙ্গ, ধ্যান-জপ করতে হয়—সৎ পুস্তক পড়তে হয়। এইসবে মন বসে গেলে ওসব (অসৎ কর্ম্ম, চিন্তা আদি) হতে অনেক বাঁচোয়া। জীব একটা-না-একটা কর্ম্ম করবেই, না করে থাকতে পারে না। তাই তার অসৎ অপেক্ষা সৎ-কাজ করাই ভাল। অসৎ কাজ করলে যা ফল হয়, অসচ্চিন্তাতেও তাই ফল হয়।

# স্বামীজী

বিবেকানন্দ স্বামী আরাধনা ক'রে—নিজ জীবনে দেখে (উপলব্ধি করে) তবে উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল—'আগে বুঝি, তারপর বুঝিয়ে দেব। নিজে না বুঝলে পরকে বুঝান যায় না।' কিন্তু এখন যা দেখছি—এরা যা সব হয়েছে, নিজে না বুঝেই সবাইকে বুঝাতে যায়। কতকগুলো বই পড়ে ভাবে—সব বুঝে ফেলেছে। সাধন নেই। ওরে, আগে নিজে বুঝ, তবে ত অপরকে বুঝাবি! স্বামীজীর কথা লোকে মেনেছিল—তার অনুভব ছিল, তাই। আর তোদের কি আছে? লোকে তোদের কথা শুনবে কেন? সেই আচার্য্য হতে পারে যে 'চাপরাস' পেয়েছে—এ ঠাকুরের কথা। স্বামীজী তা পেয়েছিল, তিনি দিয়েছিলেন। আর এদের সব 'চাপরাস' নেই, আচার্য্য হতে যায়—তাই ত পতন হয়, ঝট্ করে 'অহং' এসে পরে।

বিবেকানন্দ স্বামী সব কাজেই খুব চালাক ছিল। সব কাজেই লাগতো—পেছপাও হতো না, আর সফলও হতো। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন ঐ গুণ হয় না।

•

রাম বাবু (৺রামচন্দ্র দত্ত) স্বামীজীকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিছলেন। স্বামীজী ঠাকুরের কাছে যাওয়ামাত্র ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠলেন, ভাব হয়ে গেল। রাম বাবু স্বামীজীকে বললেন—'তোমায় দেখে ভাব হয়েছে।' এর পর ঠাকুর স্বামীজীর কথা যখন-তখন বলতেন, আর তাঁকে দেখবার জন্য পাগলের মত হয়ে যেতেন। লোক পাঠিয়ে

খবর নিতেন—স্বামীজী কেমন আছে; আর একবারটি দেখা করবার জন্য বারবার অনুরোধ করে পাঠাতেন। স্বামীজী যে কি তা ঠাকুরই জানতেন, তাই স্বামীজীর জন্য অত ছট্‌ফট্ করতেন; বলতেন, 'ওকে আমার কাজের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি।'

ঠাকুর একদিন স্বামীজীর বুকে হাত দিবামাত্র স্বামীজী বেহুঁশ হয়ে গেল। স্বামীজী চীৎকার করে বললে—'কর কি, কর কি! আমার মা-বাপ আছে।' ঠাকুর বললেন—'থাক থাক, এ-ই পাবার ঠিক ঠিক অধিকারী। এ এর নিজের সংস্কার নয়—বাপ-মার সংস্কার।'

একঘর লোক বসে থাকতো, বড় বড় লোক—কেশব সেন প্রভৃতি। তাদের সামনেই ঠাকুর স্বামীজীকে বলতেন—'তোকে পেলে আমি আর কাউকে চাই নে।'

ঠাকুর বলতেন, "ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কোনও খুঁত নেই। যেমন দেখতে, তেমনি গাইতে-বাজাতে, বলতে-কইতে, বুঝতে-বুঝাতে—মহাপবিত্র, মিথ্যা কখনও জানে না।'

ঠাকুর কারো জন্য মা-কালীর কাছে ভক্তি ছাড়া কিছু চাইতেন না। স্বামীজী একদিন বললে—'আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা-কালীর কাছে কিছু বলতে পার না, কিন্তু ভীষ্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে চক্র ধরতে হয়েছিল, তেমনি আমার জন্য মা-কালীর কাছে তোমায় বলতে হবে। তোমাকে বলতুম না, কিন্তু কি করি ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে

পারি না।' ঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—'আচ্ছা, তুই মার কাছে যা—যা ইচ্ছা তাই চা'গে যা।' স্বামীজী কালী-ঘরে গেল, কিন্তু কেমন যে মন হয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো—'বিবেক-বৈরাগ্য দাও।' কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলে, ঠাকুর বললেন—'কি চেয়ে এলি?' স্বামীজী বললে, 'বিবেক-বৈরাগ্য চাইলুম।' ঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—'আমি জানি তোর দ্বারা টাকা-কড়ি চাওয়া হবে না।' তারপর ঠাকুর বললেন—'যা, মার ইচ্ছায় তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না।' পরে ঠাকুর সকলের কাছে আনন্দ করে বলতেন, 'দেখ, নরেনের ভাই-বোনের খাবার কষ্ট, তা ও মা কালীর কাছে বিবেক-বৈরাগ্য চেয়েছে।'

স্বামীজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্য কাঁদতো; কেউ বুঝতে পারতো না, ঠাকুর বুঝতে পারতেন। একদিন স্বামীজী খুব জোরে চীৎকার করে কাঁদছিল, ঠাকুর বুঝতে পারলেন—কি জন্য কাঁদছে। স্বামীজীকে ডেকে বললেন—'তুই এই জন্য কাঁদছিস?' স্বামীজী বললে—'হাঁ।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তোকেই দেব, তুই আগে আমার জন্য খাট—কষ্ট কর। তোর জন্য আমি এতদিন কষ্ট করলুম, তুই আমার জন্য কষ্ট কর। আমি যা খেটেছি, তার তুই এক আনা খাট—তোকে গদি করে দেব।'

স্বামীজী একবার বুদ্ধগয়ায় পালিয়ে গেল। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে সব জানালে। ঠাকুর বললেন—'কোথাও কিছু নেই,

সব এইখানে। তোরা ভাবিস নি'—এই বলে একটা দাগ কাটলেন। স্বামীজী দু-এক দিন পরে ফিরে এল।

ঠাকুরের 'অভাবের' পর সকলে স্বামীজীকে বলতো—'ঠাকুর তোমায় এত বড় বলেছেন, তুমি কি কিছু বুঝলে?' স্বামীজী বলতো—'তিনি বড় বলেছেন—সে কথা খুব মানি; কিন্তু এখনও বুঝি নি। আগে বুঝি, তারপর তোমাদের বুঝিয়ে দেব।'

গুরু-ভাইরা অনেকে বাড়ী ফিরে গিছলো। স্বামীজী তাদের ধরে ধরে ফিরিয়ে এনে বললে—'তিনি তোদের যে ভালবাসতেন, সে কি সংসার করবার জন্য?' এমনি করে ক্রমে ক্রমে সকলকে টেনে আনলে।

ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল; তাতে স্বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু সেজে প্লে (অভিনয়) করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে ঐ বেশেই নেমে আসবার জন্য বলতে লাগলেন। স্বামীজী ইতস্ততঃ করছে দেখে কেশব বাবু বললেন—'উনি যখন বলছেন, নেমে এস না?' তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে বললেন—'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।'

ঠাকুর একদিন কেশব বাবুকে বললেন—'দেখ কেশব, তোমার বক্তৃতা দেবার একটা শক্তি আছে, আমার নরেনের অমন আঠারটা শক্তি আছে।' কেশব বাবু খুব আনন্দ করে বললেন—'এ তো ভাল কথা, আমিও তাই

চাই ; নরেন আমার চেয়ে ছোট হবে কেন ?' ঠাকুর বললেন— দেখছিস, কেশবের মোটে হিংসা নেই ।'

স্বামীজীকে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নি। তিনি নিজে ভাল ভাল জিনিস স্বামীজীকে খাওয়াতেন, আর বলতেন—'ওকে খাটতে হবে।'

ঠাকুর স্বামীজীকে তামাক সাজতে বা শৌচের জল আদি দিতে বলতেন না, দিতে দিতেন না, বলতেন—'ওসব কাজ করবার অন্য লোক আছে।' তিনি জানতেন ওর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে।

স্বামীজী রাতভোর ধ্যান-জপ করতো। আর গান-বাজনায় গুরুভাইদের আনন্দ দিতো। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি অনেকে স্বামীজীর কাছে গান-বাজনা শিখেছিল।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগল—"ঠাকুর কি 'পাগলাপনা' করে গেলেন !" স্বামীজীর কর্ম্মটা চিকাগোয় প্রকাশ পেল, তখন সবাই বলতে লাগল—'ঠাকুরের কথাই ঠিক।'

যখন স্বামীজী ওদেশ থেকে ভারতে ফিরে এল, সঙ্গে সেভিয়র সাহেব, গুডউইন সাহেব এরা সব ছিল। আমি দেখতে গেলাম ; ভাবছি— স্বামীজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হওয়ায় অহঙ্কার হয়েছে। স্বামীজী মনের ভাব বুঝতে পেরে হাত ধরে বললে—'তুই আমার সেই লাটু ভাই,

আর আমি সেই নরেন।' তখন বুঝতে পারলুম—স্বামীজীর মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে, আর ভিতরে একটুও 'অহং' নেই।

স্বামীজী বললে—'আয়, আমরা বসে খাই, তুই একপাশে বসে যা। বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা বলছি—দেখ এরা কেমন হুজুগে।' খাওয়া-দাওয়ার পর বললে—'দেখলি, ঐ দেশের যত বাজে খবর নিলে, কিন্তু এত কাজ হল যাঁর দোহাই দিয়ে, তাঁর খবর নিলে না। ভাই, আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমা-দ্বারা এত বড় কাজ হবে তা জানতাম না।'

বিলেত হতে আসার পরই বিলেতের পোশাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর, আর ২৷৷০ টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগল। এত যে মান—সব ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজীর কাছে এলে, আর কিছু না পারলে দুটি গান শুনিয়ে আনন্দ দিত।

গুরুভাইদের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা ঠাকুরের নীচেই। যা কিছু হয়েছে দেখছ—সব ওর দ্বারাই হয়েছে।

ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন—'আন্তরিক প্রার্থনা তিনি (ভগবান) নিশ্চয়ই শুনে থাকেন।' স্বামীজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'মশাই, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?' ঠাকুর বলেছিলেন—'হাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যেভাবে কথাবার্ত্তা কইছি, ঠিক এমনি তাঁকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।'

জনে জনে কি স্বামীজী হয় রে? তা হলে আর ভাবনা ছিল না। অমন লোক কখন জন্মায়! স্বামীজী কি কর্ম্ম করলে একবার ভেবে দেখ! তোরা খালি নকল করবি; ওতে কি উন্নতি হয় রে? আসল বিষয়ে নকল করিস না, ঐ বিষয়েই যত গোল বাঁধে। স্বামীজী কত তপস্যা করেছে, ঠাকুর নিজে করিয়েছেন, আমরা স্বচক্ষে সব দেখেছি। সাধে কি বড় হয়েছে! তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—'ওকে আমার কাজের জন্য টেনে এনেছি।' আর সকলের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—'আর সবাইকে দেখি কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড় জোর কেউ একটা বড় ( উজ্জ্বল ) তারা, কিন্তু নরেন আমার সূর্য্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হয়ে যায়।'

ঠাকুর বিবেকানন্দকে যে কি ভালবাসতেন, তা মুখে বলা যায় না। তিনি বলতেন, 'ওকে অনেক কাজ করতে হবে, একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে পারবে কেন?' আরও বলতেন, 'ওর মধ্যে জ্ঞান-অগ্নি জ্বলছে, ও যা খাবে সব হজম হয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না।' তাই দেখতাম মাড়োয়ারীরা কিছু দিয়ে গেলে আর কাউকে খেতে দিতেন না, স্বামীজীকে দিতেন; আর সকলকে ঐ কথা বলে বুঝাতেন। একদিন মাংস রান্না হচ্ছে, ঠাকুর সেদিকে বেড়াতে গিয়ে বললেন—'কি হচ্ছে রে?' মাংস রান্না হচ্ছে, নরেন খাবে—এই কথা শুনে আর কিছুই বললেন না। তিনি জানতেন স্বামীজীর ওতে কোনই অনিষ্ট হবে না।

ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন দেখ, আর তাঁদের উপদেশ পালন করতে

চেষ্টা কর। ঠাকুরের উপদেশ যত সরল দেখ, তত সহজবোধ্য নয়—খুব গভীর। আমরা কিন্তু অত বুঝতাম না। তিনি উপদেশ দিয়ে যেতেন, আমরা শুনে যেতাম, কিন্তু তার মধ্যে কত গভীর মানে আছে তা বুঝতাম না। স্বামীজীই তা বুঝিয়ে দিলে। স্বামীজী যখন ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে কি গভীর মানে আছে তা বুঝিয়ে বলতো, আমরা অবাক হয়ে যেতাম। আমরাও সে উপদেশ শুনেছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে যে অত 'ভাব' আছে, তা তিলেকও ভাবি নি। তাই বলি, ঠাকুরের উপদেশ শোন, আর বিবেকানন্দের জীবন দেখ—কল্যাণ হবে।

একদিন ঠাকুর নরেনদের বাড়ীতে গিছলেন—নরেনকে দেখতে। সঙ্গে ছিলাম। নরেন বললে—'আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। আপনারা যখন টালার মোড়ে, তখন আপনাদের দেখতে পেলাম; তাই বেরুলাম না।' এই কথা শুনে ঠাকুর বললেন—'এ সব কাকেও বলিস নি···।' স্বামীজীর ধ্যান করতে করতে এই অবস্থা হয়েছিল—দূরে কে কি কচ্ছে সব দেখতে পেত।

বৈষ্ণবরা নিতাইর খুব নাম করে, বলে—'প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।' এটা ঠিক করে। নিতাই চৈতন্যদেবের হুকুমে দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলিয়েছিলেন। জগাই মাধাই কলসী-ভাঙ্গা ছুঁড়ে মারলে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু সেদিকে একেবারেই নজর নেই—প্রেমে মত্ত। নাচতে নাচতে বললেন—'মেরেছিস বেশ করেছিস, একবার হরি বলে নেচে আয়।' সেরূপ নরেনেরও নাম কর। কারণ নরেন না থাকলে ঠাকুরকে ধরতে পারতো কে? সেই তো ঠাকুরকে ঠিক

ঠিক বুঝেছিল, আর সেই তো সবাইকে বুঝিয়ে দিলে, বহুলোকের কল্যাণ করলে।

স্বামীজী সকলকে বুঝিয়ে দিলেন—'ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁকে পাওয়া গেল ত খুব ভালই হল; আর যদি তাঁকে না পাওয়া যায়, তবুও পবিত্রভাবে জীবনটা কাটাতে পারা যাবে। তা ছাড়া, সংসারে কত পাপ-তাপ, সে-সব থেকে তো বেঁচে যাওয়া যাবে। পবিত্রভাবে জীবনকাটান—সেটাই যে মহালাভ। আর শাস্ত্রও বলছে—পবিত্র জীবন তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়।'

স্বামীজী একদিন হাসতে হাসতে বললে—'দেখ, ইউরোপ-আমেরিকা পর্য্যন্ত নাম ছড়িয়ে ফেলেছি; সাহেবরা আমাদের ধর্ম্ম নিচ্ছে। লাটু কি বলিস?' আমি বললাম—'স্বামী, তুমি আর নূতন কি করেছ? শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব যা করে গেছেন, তুমি তার উপর দাগা বুলিয়েছ মাত্র। এর বেশী কিছুই কর নি।' স্বামীজী বললে—'ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস।'

আমেরিকার কোন ধনীর সুন্দরী মেয়ে স্বামীজীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। স্বামীজী বললে—'বল কি? আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে সব স্ত্রীলোক মাতৃসমান। আমি ব্রহ্মচারী, আমি কি বিয়ে করতে পারি? আর আমার গুরু কামিনী-কাঞ্চন কখন স্পর্শ করেন নি।' দেখ, কি সংযম, কেমন ত্যাগ!

স্বামীর মঠে থাকতাম। স্বামী নিয়ম করলে—ডম্‌বেল ( dumbell ) ভাঁজতে হবে। আমি ভাবলাম—এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে! আমি বললুম—তোমার ডম্‌বেল ভাঁজতে পারবো না। স্বামীজী হাসতে লাগলো।

একজন বললে—'লোকে বলে, আপনি নরেন্দ্রকে ভালবাসেন। তাই তার অহঙ্কারে পা পড়ে না।' ঠাকুর বললেন—'ওটা ওর অহঙ্কার নয়, ওর নাম তেজ, ওর মনটা নীচে নামেই না।'

আমি যদি বলি স্বামী বিবেকানন্দের মত হব, আর তখন যদি কেউ আমার 'কর্ম্মটা' দেখিয়ে দেয়, তা হলে আমি যাই কোথা? স্বামীজীর মত বড় কি করে হব? আমি যে সময়ের মধ্যে বড় হব, সে সে-সময়ের মধ্যে আরো বড় হবে। তাই তার সঙ্গে আমার যতটা প্রভেদ তা চিরকালই থেকে যাবে। তবে হাঁ, আমি যদি স্বামীজীর চেয়ে খুব জোরে যেতে পারতুম—ডবল জোরে, তা হলে কালে হয়তো তার সমান হতে পারতুম, কিন্তু সে বহুদূরের কথা।... ঠাকুরের নীচেই স্বামীজী কঠোর ( তপস্যা ) করেছে। অমন কঠোর আমাদের মধ্যে আর কেউ করে নি।

# কেশব সেন

কেশব সেন অত বড় লোক—যিনি রাণীর (কুইন ভিক্টোরিয়া) কাছে মান্য পেয়েছিলেন, ঠাকুরের কাছে হাত-জোর করে বসে থাকতেন। ঠাকুরের কথার উপর তাঁর বিশ্বাস কত! তিনি হিংসুক (অহঙ্কারী) ছিলেন না। ঠাকুর তাঁকে শিবপূজা করতে বলায়, তিনি তা করেছিলেন।

কেশব বাবু তাঁর কথা খুব বিশ্বাস করতেন, আর জানতেন যে, ওঁর কথা মানলেই কল্যাণ হবে। একদিন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চুপ করে রইলেন। কেশব বাবু বললেন, 'আর কিছু বলুন।' ঠাকুর বললেন—'আর বললে তোমার দল-টল থাকবে না।' তখন তিনি বললেন, 'তবে থাক।' তিনি (কেশব বাবু) জানতেন আর কিছু বললেই তাঁর মন বদলে যাবে, আর দল রাখতে পারবেন না।

ঠাকুর বলতেন—'কেশবের মান নেবার ইচ্ছা আছে।' তিনি কেশব সেনকে একদিন বলেছিলেন—'তুমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বল।' কেশব বাবু বললেন, 'আপনার কাছে আর কি বলবো! আপনার কথা নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে নিজেও আনন্দ পাই, আর দশজনকেও আনন্দ দিই।'

যখন কেশব বাবু বিডন পার্কে লেকচার দিতেন, বুড়োরা বলতো—'ব্রাহ্ম কেশব এসেছে।' তিনি ভগবানের সম্বন্ধে বলতে বলতে নিজেও

কেঁদে ভাসতেন, আর অপরকেও কাঁদাতেন। তারপর বুড়োরা বলতো—'কেশব যা বললে সব ঠিক।'

ঠাকুর একবার ব্রাহ্মদের বেলঘোরের বাগানে গিছলেন। কেশব বাবু ভক্তদের নিয়ে বসেছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় বললেন—'কেশবের লেজ খসেছে।' তাতে অন্য ব্রাহ্মরা চটে গেল। কিন্তু কেশব বাবু তাদের বললেন—'চুপ কর ; এর মধ্যে অর্থ আছে।'

কেশব বাবু নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে পূজা করেছিলেন। তিনিই প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কাগজে লিখতেন। তাই পড়ে ঠাকুরের কথা লোকে জানতে পারে, আর তাঁর সন্তানদের ভেতর অনেকেই তাঁর কাছে যায়।

রাম বাবু (ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত) ঠাকুরকে নিয়ে উৎসব করতেন। কেশব বাবু একদিন রাম বাবুকে বলেছিলেন—'রাম, এ জিনিস দৈবাৎ কখন হয় ; গ্লাসের ( glass case ) মধ্যে রেখে দূর থেকে নমস্কার করতে হয়, এ লাট করবার জিনিস নয়।'

ঠাকুর কেশব বাবুকে ধ্যান করতে দেখে বলেছিলেন, 'এর ফাৎনা নড়ছে,' অর্থাৎ ঠিক ঠিক ধ্যান হচ্ছে।

যোগীন মহারাজ খবরের কাগজ হাতে করে ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে আসছ ?'

যোগীন মহারাজ বললেন—'দক্ষিণেশ্বর হতে; আমি অমুকের ছেলে।' ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের লোক বুঝতে পারতো না। তাই তিনি অবাক হয়ে বললেন—'এখানকার কথা কি করে জানলে?' যোগীন মহারাজ বললেন—'কেশব বাবু কাগজে আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন।' তাই শুনে ঠাকুর একদিন কেশব বাবুকে বললেন—'আমি কি মান-ভিখারী ইদানীং সাধু! যা করেছ—করেছ, আর লিখ না।'

ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁকে (কেশব বাবুকে) জিজ্ঞেস করতেন—'সমাজে লোকজন কেমন হচ্ছে?' কেশব বাবু বলতেন—'মশায়, আপনার কৃপায় সমাজে লোক ধরে না।' তখন এত ভিড় হতো!

কেশব বাবু 'পয়সার জন্য' ব্রাহ্ম হন নাই; তখন হিন্দুসমাজে ধর্ম (?) ছিল না, তাই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। ছোটকাল থেকে ধর্ম-ধর্ম করতেন। পরমহংসদেব স্বীকার করলেন—কেশব বাবু ঠিক ঠিক ধার্মিক। একটি লোক জগৎ মাতিয়ে দিল, কত বড় শক্তি! কেশব বাবুর অনেক follower (অনুগামী) ছিল, এখনও আছে। তাঁর সঙ্গ পেয়ে কত লোক বেঁচে গেল—ধর্মে মতি হল।

# আদর্শ জীবন

সংসারে মা বেঁচে থাকলে খাওয়া-দাওয়া ও নানা বিষয়ে নানারকম আবদার করা যায়। তাই, মার মনে কষ্ট দেওয়া ভাল না; মাকে খুব ভক্তি করা উচিত। দেখ না, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, আমাদের ঠাকুর, স্বামীজী—এঁরা সবাই মাকে খুব ভক্তি করতেন। মাকে যে ভক্তি না করবে, তাকে ভুগতে হবে।

•

কোন কোন মা আছে—তারা ছেলেকে সংসারে বেঁধে রাখতে চায়। ছেলে যদি ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করতে চায় তবে কেঁদে-কেটে তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে বলে। নিজে ত ভুগছেই, আবার তাকেও ভোগাতে চায়; এরা সব 'অসৎ' মা। তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'এদের কথা না শুনলে দোষ হয় না।' আর যারা 'সৎ' মা, যদি ছেলে ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করতে চায় তা হলে তারা খুব খুশী হয়ে আশীর্ব্বাদ করে, আর বলে 'আমার মহাভাগ্য যে তুমি ভগবানকে ডাকতে চাইছ'; আর সংসারের সব দোষ দেখিয়ে দেয়। এই হ'ল ঠিক ঠিক মা। এমন আজকাল খুব কম, বিরল।

মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে একমনে ভগবানকে ডাকা। আর ছেলেপিলে বেশী হওয়া ভাল নয়—সংসারে দুঃখ বাড়ে, ব্যস্ত করে তুলে। সংসারে নানারকম শোক, তাপ, রোগ—এই সব অনিবার্য্য। এ কারণ উদাসীন ভাব হওয়া খুব ভাল; কোন কিছুতেই গ্রাহ্য নেই,

—এক রকমে দিন কেটে গেলেই হল ; ব্যস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। তবে উদাসীন ভাব হওয়া কঠিন, উহা সাধন করতে করতে হয়। যত ভগবানের দিকে মন যাবে তত সংসারে মন উদাসীন হবে। সংসারে থেকেও তাতে উদাসীন থাকা কম কথা নয়। যে তা পারে, সে ত আদর্শ পুরুষ। সংসারে থেকেও জনক রাজা ঠিক ঠিক উদাসীন ছিলেন।

হিংসা করা পাপ—অহিংসাই মুক্তি। ভাল বিছানায় শোও, ভাল খাও, ভাল পর—যাই কর না কেন, যদি তোমার মনে হিংসা না থাকে, তবে ত তুমি মুক্ত পুরুষ। বুদ্ধদেব হিংসা ত্যাগ করেছিলেন, আর সবাইকে হিংসা ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তোমরা জীব তাঁর কথা মানলে না, তাই তো দুঃখ ভুগছো। যাঁরাই বড় হয়েছেন—অবতার, মহাপুরুষ হয়েছেন, তাঁরা সকলেই হিংসা ত্যাগ করেছেন ; আর জীবকে হিংসা ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। যে তাঁদের কথা শুনবে তার কল্যাণ হবেই—জোর করে বলছি।

ভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে বললেন—'হে উদ্ধব, এখন যাও তপস্যা করগে, তবে আমার গুণ বুঝতে পারবে যে আমি কি জিনিস! এখন বুঝালে বুঝতে পারবে না, আগে তপস্যা কর।' জীবের মহাশিক্ষা, —তপস্যা না করলে তাঁকে বুঝা যায় না, তিনি নিজে বলেছেন। জীবশিক্ষার জন্য তিনি নিজেও তপস্যা করেছিলেন।

মুখে শুধু 'ঠাকুর-ঠাকুর', 'স্বামীজী-স্বামীজী' করলে কি হবে? শুধু ঠাকুর-স্বামীজীর উপদেশ পড়লে কি হবে? ঠাকুর-স্বামীজী যা

করতে বলেছেন তা না করলে কেমন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? মিথ্যা কথা বলবে, জুয়াচুরি করবে, কত অন্যায় কাজ করবে, এদিকে লোকের কাছে 'ঠাকুর-ঠাকুর' করে দেখাবে আমি কত বড় ভক্ত হয়েছি! ফাঁকি দিয়ে মান, যশ ও অর্থ হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম হয় না। ধার্ম্মিক হতে হলে সৎসঙ্গ করতে হয়; সাধু যা বলে তা পালন করতে হয়—তবে ত ধর্ম্ম হয়।

এক গুরুর শিষ্য সব আলাদা আলাদা মঠ করে, আর কতকগুলো চেলা বানিয়ে যায়! তাদের শরীর গেলে চেলারা পরস্পর ঝগড়া করে। বলে—'আমি অমুকের চেলা; তার চেয়ে ছোট কিসে? ভালর জন্য মঠ করে যায়, শেষে এইসব গোলমালের সৃষ্টি হয়। নিজের নিজের মঠের উপর সকলেরই ঝোঁক পড়ে—এটি হচ্ছে মায়ার নিয়ম। মঠ করে যায় লোকের সাধুসঙ্গের সুবিধার জন্য, আর যারা নূতন ধর্ম্মপথে এসেছে তারা একটা ভাব পাবে বলে, গুরুর কাছে থেকে ধর্ম্মশিক্ষা করবে বলে। একবার ধর্ম্মভাব দৃঢ় হলে তখন আর মঠের দরকার হয় না, কিন্তু তার আগে খুব দরকার। কিন্তু প্রায় সে-সব ভুলে গিয়ে ভোগের দিকে মন দেয়, আয়েসী হয়ে পড়ে। আর কর্ম্ম (সাধন) থাকে না বলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা এসে পড়ে। কর্ম্ম না থাকায় বুঝতে পারে না—কখন এরা ঢুকেছে; আর বুঝলেও তাড়াবার শক্তি নেই। কি দিয়ে তাড়াবে? তপস্যা কই? এ জন্য অনেকেই (সাধুরা) মঠ করে না। জানে মঠ করা নয়—ঝগড়ার সৃষ্টি করা।

'আমি ডাক্তার', 'আমি অমুক', 'আমি ধনী'—এ ভাব যত হবে,

ততই অহং-টা জেগে উঠবে। কিন্তু 'আমা অপেক্ষা অনেক বড় আছে; তাঁর কৃপাতেই আমার যা কিছু হয়েছে'—এ ভাব থাকলে অহং দূর হয়ে যায়, কাছে আসতে পারে না। তবে সামান্য যা একটু থাকে, সেটা কর্ম্ম করবার জন্য। যার 'অহং' একেবারে গেছে, তার দ্বারা কোন কর্ম্মই হতে পারে না। কিন্তু এ অহং কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—'লোহার খড়্গ পরশমণি ছুঁয়ে সোনা হলে আর তার দ্বারা হিংসা চলে না।' কিন্তু তার আকারটা সেই থাকে, বধকার্য্য করা যায় না। ঠিক তেমনি অহং-টা থাকে, কিন্তু তা অনিষ্ট করতে পারে না। মোট কথা, অন্তরে অহঙ্কার অভিমান না থাকলেই হল। সদা মনে রাখতে হয়—'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী'; আর এই ভাবটা দৃঢ় করবার জন্য মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ করতে হয়।

লম্বা লম্বা 'বাৎ ঝাড়লে' ( কথা বললে ) কি হবে? ভগবানের কাছে জুয়াচুরি চলে না। সরলভাবে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে তিনি সন্তুষ্ট হন—দেখা দেন। লম্বা লম্বা কথায় মানুষ ভুলতে পারে, তোমার নাম-যশ খুব হতে পারে, লোকের কাছে খুব মান পেতে পার, কিন্তু ভগবান তোমার অন্তরের খবর সব জানেন, তোমার মূল্য কত তিনি জানেন, তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। ভগবান মানুষের অন্তর দেখে বিচার করেন, আর মানুষ—তার অন্তর্দৃষ্টি নেই, সে বাহির দেখে বিচার করে—এই তফাৎ। যে ভগবান সাক্ষাৎকার করতে চায়, সে ঐসব মান-যশের দিকে মন দিবে না, লম্বা লম্বা 'বাৎ ঝেড়ে' ( কথা বলে ) বাহবা নিতে যাবে না; সরলভাবে তাঁকে ডাকবে, একান্তে সাধন করবে। একান্তে সাধন খুব দরকার, তবে ত ইষ্টলাভ হয়। ইষ্টলাভ হলে তাঁর

হুকুমে প্রচার করতে হয়। প্রচার করবার শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। প্রার্থনা কর, ডাক—তাঁর 'হুকুম' মিলবে।

সকলেই হুকুম ( আদেশ ) করতে চায়, হুকুম মানতে কেউ চায় না। আরে, আগে হুকুম মানতে শেখ, তবে ত হুকুম করবার শক্তি হবে। স্বামীজী বলতো—'সর্ব্বদা দাস হতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হতে পারবে।'

সকলেই ঠাকুরকে আদর্শ করতে পারে। তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ গুরু, আদর্শ শিষ্য—সব মতের সব পথেরই তিনি আদর্শ। তিনি শাক্তের আদর্শ—তন্ত্রশাস্ত্রে যত সাধন আছে সব করেছিলেন, আর সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ—অমন হরিভক্তি দেখতে পাওয়া যায় না; তিনি হরির দর্শনলাভ করেছিলেন। তিনি শৈবের আদর্শ—কারণ তিনি শিবের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তিনি রামভক্তের আদর্শ—কারণ তিনি রাম-সীতার দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি বেদান্ত-সাধকের আদর্শ—কেন না তিনি বেদান্ত-সাধনার চরম ফল নির্ব্বিকল্প সমাধি তিন দিনে লাভ করেছিলেন। আবার তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমানেরও আদর্শ—কেন না, তিনি ঋষি কৃষ্ণের ( যীশু-খ্রীষ্টের ) আর মহম্মদের দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি সকলের আদর্শ—কারণ তিনি সকল মতের সাধন করেছিলেন, আর সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। সব দেখে শুনে তিনি বলতেন—'যত মত, তত পথ; সব সত্য।' তোমাদের মত খালি মুখে বলেন নি। তিনি জগদ্‌গুরু; এমনটি আর দেখা যায় না। তাঁকে যে মানবে, আদর্শ করে চলবে, সে এই ( সংসার ) দুঃখ হতে বেঁচে যাবে; আমি জোর করে বলছি—হাঁ।

শ—র সব হয়ে গেছে, তার সঙ্গ করলে কল্যাণ হবে। কত কঠোর করেছে। নিমপাতা খেয়েছে কাম জয় করবার জন্য। সাধুরা নিমপাতা খায় কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষুধা দমন করবার জন্য। শ—ও তাই নিমপাতা খেয়েছে। তুমি শ—কে খাওয়াবে মনে করেছ, খুব ভাল কথা। তবে কি জান, আমার বড্ড ভয় হয় পাছে অসুখ করে। ওর দ্বারা কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে—দেখতে পাচ্ছি। ওর শরীর সুস্থ থাকার খুব দরকার।

৺জগন্নাথের মত অমন তীর্থ আর কোথা পাবে বল ? সব একাকার, জাতি-ভেদ নেই—একি কম কথা ? আর যত লোককে খাওয়াতে ইচ্ছা কর, প্রসাদ কিনে খাওয়াতে পার ; টাকা দিলেই বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যাবে। অন্য কোথাও অতটা সুবিধা নেই। আবার কত বড মন্দির—দেখতেও সুন্দর, সমুদ্রের ধারে! সাধু-মহাপুরুষদের স্থান। এদিকে গৌরাঙ্গদেব, আর কত শত বৈষ্ণব-ভক্ত সারাজীবন সেখানে কাটিয়ে গেছেন—মহাপবিত্র স্থান। আমি জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, বেশী ঘুর্‌তে-টুর্‌তে পারবো না, আর যা খাই যেন হজম হয়। জগন্নাথদেব তাই করে দিলেন। কলকাতায় উপেন মুখুয্যের ( 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ) কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পুরি আর আলুর তরকারি কিনে খেতাম। তাঁর দয়ায় বেশ হজম হয়ে যেত—কোন বখেরা ছিল না। গৃহস্থের বাড়ী খেতাম, তাদের সময়মত যেতে হতো ; না গেলে তারা বিরক্ত হতো। তাই তাদের ( গৃহস্থ ) বাড়ীতে খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

আর এই গঙ্গার ধারে বসে আছি ; বেশ মন বসে গেছে, কোথাও

খেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু গৃহস্থবাড়ীতে খাওয়া—ইচ্ছার বিরুদ্ধে খেতে হতো; তাই তাদের বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। তখন ঐ রকম পয়সা নিয়ে কিনে খেতাম—বেশ স্বাধীন, যখন ইচ্ছা হল কিনে খেলাম। কারো কথা শুনতে হবে না। তবে এখন শরীর খারাপ হয়ে গেছে—অত সহ্য হয় না। তারপর যখন অমনি পুরি খেয়ে থাকি, একদিন শা— বাবু আমায় বিশেষ করে বললেন তাদের বাড়ীতে থাকতে। আমিও রামকৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতে গেলাম। তখন শা— বাবুকে বললাম, "কিন্তু আমার খাওয়ার কিছু ঠিক নেই।" তাতে শা— বাবু বললেন, "মহারাজ, আমাদের এত বড় সংসার, এত খরচ হচ্ছে—এক পোয়া চালের অন্ন, আর এক পোয়া আটার রুটি না হয় ফেলা যাবে। খাবার আপনার ঘরে দুপুরে আর রাত্রে রেখে যাবে—আপনার যখন ইচ্ছা তখন খাবেন।" এখন দেখতে পাচ্ছি শা— বাবু ভাই-এর কাজ করেছেন।

এই ত বাসনা—যেন জন্মে জন্মে ভক্ত-সঙ্গ, সাধু-সঙ্গ পাই। তুমি আমার কাছে কোন সঙ্কোচ করো না। তাঁর কৃপায় আমার বেশ চলে যাচ্ছে। আমার কি মাগ-ছেলে আছে যে, তাদের খাওয়াতে হবে? যারা আমায় সাহায্য করে তারাও ধন্য হবে যে, সাধু-সেবা, ভক্ত-সেবা হচ্ছে, আর আমিও ধন্য হব। তুমি যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকতে পার; কোন সঙ্কোচ করো না। আমাদের কাছে সঙ্কোচ করলে দুঃখ পাবে। তবে টাকা-কড়ি খরচাদির জন্য এই সব ছেলেদের সাবধান করে দিই—যাতে বেফজল্ (বাজে) খরচ না করে। গৃহস্থেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপার্জ্জন করে, সে পয়সা

বেফজল্ খরচ করা কখনই উচিত নয়; তা হলে অকল্যাণ হবে, তাঁর (ঠাকুরের) কাছে দোষী হব। তিনি ও সব ভালবাসতেন না। আর গৃহস্থদের কোনই ঠিক নেই। কোন মাসে সাহায্য করলে, কোন মাসে হয়তো করলে না; তাই একটু হিসেব করে চলতে হয়। আমাকে এখন কাশীতেই কিছুদিন থাকতে হবে। এই ছেলেদের বলি—তোমাদের এখন যুবা বয়স, যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, কিন্তু আমি তা তো পারবো না, তাই একটু হিসেব করে চলি। আর কোনও উদ্দেশ্য নয়।

তোমাদের 'নিশ্চয়' বলা পাগলামী। এক ভীষ্মই কেবল 'নিশ্চয়' বলতে পারতেন। ভীষ্ম কি সকলেই হয় রে? ঐ একটাই হয়েছিল। আকুমার ব্রহ্মচারী। কি ত্যাগ! অমনটি আর দেখতে পাওয়া যায় না। অটুট ব্রহ্মচর্য্য থাকলে তবে 'নিশ্চয়'-বুদ্ধি হয়।

এখন ত তোরা রাজ-হালে আছিস রে। ঠাকুর-স্বামীজীর নাম নিয়ে যেখানে যাবি, সেখানেই খুব আদর-যত্ন পাবি। আমাদের যে কি দুঃখ গেছে, তা তোরা কি বুঝবি? এখন স্বামীজীর দয়ায় মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব নেই; আর কোন দিন হবেও না—যদি তাঁর উপদেশ মেনে চলিস। ঠাকুর-স্বামীজীর উপদেশ মেনে যে চলবে, তার কল্যাণ হবেই। এই যুগের ধর্ম্ম ঠাকুর বলে গেছেন, স্বামীজী প্রচার করেছে। ওঁরাই এ যুগের আদর্শ।

চৈতন্যদেব চোখের জল মিশিয়ে গয়ায় পিতৃ-পিণ্ড দিয়েছিলেন। দেখ, কি পিতৃভক্তি! যাঁরা আদর্শ হন, তাঁদের সবই আদর্শ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ঠাকুর বলেছিলেন—"তুমি ত্রেতার জনক নও, কলির জনক।" অত পয়সা, রাজা লোক, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সাধনা করে কাটিয়ে দিলেন। এখন আর মহর্ষির মত কটা হয় বল।

ঠাকুর তীর্থদর্শন করে ফিরে এলে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কাশীতে সাধু দেখলেন কেমন? ভাস্করানন্দ স্বামীকে কেমন দেখলেন?" ঠাকুর বলেছিলেন—"তাঁর চার-আনা আনন্দ লাভ হয়েছে। কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামী—হাঁ, পুরো, ওর পারে আর গাঁও নেই। ত্রৈলঙ্গ ও বিশ্বনাথ অভেদ, ওকে খাওয়ালেই বিশ্বনাথকে খাওয়ান হল। ত্রৈলঙ্গস্বামী মণিকর্ণিকায় আছেন; আমরা দেখতে গিয়েছি। হৃদয়কে ত্রৈলঙ্গস্বামী সঙ্কেত করে বললেন—'তিন বার মাটি কেটে গঙ্গায় ফেল। হৃদয় 'কিন্তু কিন্তু' করছে দেখে আমি বললাম—'শালা, হুকুম মান্। (তা না হলে) এখনি নাশ হয়ে যাবি।' আমার ভয় হলো পাছে আমায় বলে মাটি কাটতে। আমার শরীর দুর্ব্বল।"

রাম রাজা হবে শুনে ভরতের খুব স্ফূর্ত্তি। খুব দানধ্যান করতে লাগলো। এমন সময় শুনলে—দশরথের আজ্ঞায় রাম বনে গেছেন। তখন খুব দুঃখ হলো। দুঃখে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে। এদিকে আবার রামের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে দশরথ শরীর ছাড়লেন। ভরতকে সবাই এসে অযোধ্যায় নিয়ে গেল—রাজা করতে চাইলে; কিন্তু ভরত কিছুতেই রাজা হল না। পিতার সৎকার করে রামের অন্বেষণে বনে গেল। অনেক খোঁজার পর চিত্রকূটে দেখা পেলে। রামকে অনেক মিনতি করলে ফিরে আসবার জন্য, কিন্তু রাম পিতৃ-

আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন কি করে— রামের কাছে পাদুকা ভিক্ষা চাইলে। সেই রাম-পাদুকা মাথায় করে বয়ে নিয়ে গেল। সিংহাসনে পাদুকা বসালে, নিজে ছত্র ধারণ করলে, চামর ঢুলালে, আরও কত কি করলে। মনে কোন হিংসা নেই; এমনটি আর শোনা যায় না।

শঙ্করাচার্য্যকে মানতেই হবে। চৈতন্যদেবের গুরু দশনামীর একজন, আবার আমাদের ঠাকুরের গুরুও দশনামী। শঙ্করাচার্য্যের দশনামীর মধ্যে অনেক বড় বড় মহাপুরুষ হয়েছেন, আর এখনও হচ্ছেন। তাই শঙ্করাচার্য্যকে মানতেই হবে। তিনি সকলের আচার্য্য —গুরু।

ত্রৈলঙ্গস্বামী কি অমনি হয়? কত খাটনি খেটে তবে হয়েছে। তপস্যা চাই। তপস্যা—কঠোর তপস্যা, তবে যদি অমন হওয়া যায়।

রাম দত্ত তাঁর ( ঠাকুরের ) জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিলেন। রাম দত্তের দরুণ পরমহংসদেবের উৎসব হলো (?)। রাম দত্ত বলতেন—"তিনি যা বলেছেন সব ঠিক, তার উপর কোন কথা নেই।" এই কথার জোরের উপর দাসত্ব করে জীবন কাটিয়েছেন। সত্যবাদী—কোন নেশা ছিল না। মনিব খুব জানতো—এমন লোক দুর্লভ। মেহনৎ করে টাকা উপায় করে লোকজন খাওয়ান, কীর্ত্তন করা, ঠাকুরপূজা, তাঁর চর্চ্চা করা—এই নিয়েই মেতে থাকতেন। পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যান নি। অন্য লোক টাকা উপায় করে, আত্মীয়দের খাওয়ায়, টাকা

জমায়, কিসে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকবে, তারই চেষ্টা করে। কিন্তু রাম বাবুর তা ছিল না, তিনি ভক্ত আর ভগবান নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন —স্ফূর্ত্তি করতেন। ঠাকুরের ঐ উপদেশ সদাই বলতেন—"ভক্তের টাকা শাঁকোর জলের মত হবে, এ দিক দিয়ে আয়, ও দিক দিয়ে ব্যয়—সঞ্চয় নেই।" আর এটা তাঁর নিজের জীবনেও ঠিক ঠিক দেখেছিলুম। অমন ধর্ম্মী দেখা যায় না, খুব বিরল।

স্বামীজীকে রাম বাবু ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। স্বামীজী ব্রাহ্ম-সমাজে যাতাযাত করতো। রাম বাবু একদিন তাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। স্বামীজীকে দেখে ঠাকুরের ভাব হয়ে গেল। তারপর বললেন—'তুমি আবার এস।' এই রকমে স্বামীজীর মন বসে গেল।

সংসার নিয়ে অমন পবিত্রভাবে জীবন কাটান—বাহাদুরী আছে। রাম বাবুকে ঠাকুর বলতেন—"রাম, এ সংসার (অর্থাৎ রাম বাবুর সংসার) তোমার নয়—আমার।" আর বলতেন, রাম আমার আবদারে ছেলে, হুজুগে নয়; ভগবানের জন্য ঠিক ঠিক প্রাণ কাঁদে। ভগবান চাই-ই, সুখ পাই, দুঃখ পাই—রাম বাবুর এই ভাব।

পরস্পর দুঃখ দেওয়া-দেয়ী কচ্ছে, জানে না একদিন বুড়ো হতে হবে, মরতে হবে। দেখ একবার মায়ার খেলা! মানুষ ভুলে যায় যে, তাকে একদিন মরতে হবে, তাই অমন হীনবুদ্ধির কাজ করে। যে জানে তাকে একদিন মরতে হবে, আর এ সব দুদিনের খেলা,

সে কখনও হীন কাজ করতে পারে না। সে ভাবে 'কেন অশান্তি সৃষ্টি করি? যে কদিন বেঁচে আছি, সৎভাবে শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই ত ভাল। এখন তাঁর দয়ায় ভালয় ভালয় কেটে গেলেই বাঁচি।'

সকলেই যদি সাধু হবে, তো গৃহস্থ হবে কে? সাধু হওয়া সহজ কথা নয়; লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে একজন সাধু হয়। গেরুয়া পরলেই সাধু হওয়া যায় না। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য চাই, সংযম, ত্যাগ, তপস্যা চাই—তবে সাধু হওয়া যায়। তেমনি, গৃহস্থ হলেই হলো না। বিয়ে করে কতকগুলো ছেলে-পিলে হলে, আর খুব টাকা কামাতে পারলেই গৃহস্থ হল না। যে গৃহস্থ এই সব ধন-দৌলত ছেলে-পিলে থাকা সত্ত্বেও ভগবানের জন্য ব্যস্ত, ঐ সবে তার মন নেই, সেই ঠিক ঠিক গৃহস্থ। গৃহস্থ সৎ, শান্ত, জ্ঞান-পিপাসী হবে; আর সেই ঠিক আদর্শ গৃহী। আদর্শ গৃহী, আর সাচ্চা সাধু—এক।

ভগবানের জন্য ষোল-আনা ত্যাগ করার নাম হচ্ছে সন্ন্যাস। গীতাতে এ সব কথা আছে। গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না; অনেক ত্যাগ, তপস্যার দরকার। তোমরা হয়তো বলবে—এত যে সন্ন্যাসী দেখছি, তারা কি সকলেই ভগবানের জন্য ষোল আনা ত্যাগ করেছে? না—তা করতে পারে নি; তবে এরা চেষ্টা করছে তাঁর জন্য সর্ব্বত্যাগী হতে, তাঁকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে। তাঁর দয়া হলে এক মুহূর্ত্তে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে। আর দেখ, একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে

লোকে সন্ন্যাস নেয়। আর কিছু না হোক, সদ্‌ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কারো অনিষ্ট করতে যায় না। এটা কি কম কথা!

যুবা বয়সই সাধন-ভজনের ঠিক সময়; এ সময়টা আলস্যে কাটিও না, সাধন-ভজন করে তাঁকে লাভ কর, মানুষ হও। যদি সাধন-ভজন না করতে পার, তবে কোন সৎ কাজ কর, কারও অনিষ্ট করো না। পরচর্চ্চা করো না, তার চেয়ে ঘুমান ভাল।

যার সাধু স্বভাব সে কখন অসাধু ভাব আনতে পারে না। তার মনে কখনও অমন প্রবৃত্তি হয় না। সে কোন কাজ গোপন করে করতে চায় না, যা করে সব প্রকাশ্যে। সে নির্ভীক-চিত্ত সিংহের মত, দুনিয়ার কাউকেও ভয় করে না। আর কেনই বা করবে? কারো অনিষ্ট করে না, কারো চর্চ্চায় থাকে না, সৎ—কপটতা নেই, কেনই বা (ভয়) করবে?

ছেলের বাপ হলেই হল? তোমার যে ঘোর দায়িত্ব আছে— যে পর্য্যন্ত ছেলে সাবালক না হয়। ছেলের ভালমন্দ তোমার উপর নির্ভর করছে। বাপ-মায়ের দোষেই ছেলে খারাপ হয়। তারা কি জানে?—যেমন শিক্ষা পাবে, তেমনিই হবে। সেজন্য বাপ-মাকে খুব সাবধানে চলাফেরা, কথাবার্ত্তা কইতে হয়। কারণ বাপ-মাকেই ছেলে বেশী নকল করে। ছেলে সাবালক হয়ে গেলে—নিশ্চিন্ত; তখন সে নিজের কর্ম্মের জন্য নিজেই দায়ী, বাপ-মার আর কোন 'দায়' থাকে না। কিন্তু এ ঘোর দায়িত্ব কটা লোক বুঝে? ছেলেগুলো কোন

প্রকারে খেতে-পরতে পেলেই যথেষ্ট হল—এই ভাল। আরে, মানুষের আকার হলেই কি মানুষ হয়? মানুষের আকারে অনেক দানা-দৈত্যও আছে—পশু আছে। দশটা দানা-দৈত্যের মত ছেলের চেয়ে একটা 'মানুষ' ভাল। ছেলেদের আর দোষ কি? তাদের মানুষ করলে তবে ত মানুষ হবে? ছেলেকে মানুষ করতে হলে বাপ-মাকে আগে মানুষ হতে হবে—তবে হবে। এই দায়িত্ব-জ্ঞান কি অমনি হয়, কত সৎ-সঙ্গ করতে হয়, আদর্শ পুরুষদের জীবন দেখতে হয়, কত সব চেষ্টা করতে হয়, তবে হয়। যার এ দায়িত্ব-জ্ঞান আছে সেই মানুষ।

আমার ছবি 'অমুক' পূজো করছে। তা সে পূজো না করলে আমার আর স্বর্গে যাওয়া হবে না! আমার ছবি পূজো করে কি হবে? তাঁকে ( ঠাকুরকে ) পূজো কর, যাতে কল্যাণ হবে।

ত্রৈলঙ্গস্বামী কত যে কষ্ট ( তপস্যা ) করেছেন, তা তোমরা কি বুঝবে? তাঁকে যারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, পূজো করে, তাদের কল্যাণ হবেই। তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—"ত্রৈলঙ্গস্বামী সব্‌সে পার। শরীর সাধারণের মত, কিন্তু কর্ম্ম মানুষের মত নয়। শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ৺বিশ্বনাথ আর ত্রৈলঙ্গস্বামী অভেদ।"

মাষ্টার মহাশয় খুব পণ্ডিত লোক; ওঁর দরুণ কত লোকের কল্যাণ হয়েছে, আর এখনও হচ্ছে। 'কথামৃত' পড়ে কত লোকে ঠাকুরকে জানতে পাচ্ছে। মাষ্টার মহাশয়ের বয়স হয়ে আসছে, এখন তাঁর দয়ায় শরীর ভাল থাকলেই বাঁচোয়া। এ সব লোক যতদিন সংসারে থাকে সংসারের কল্যাণ।

## সৎকথা

সৎলোক অপরের দুঃখ দেখলে দুঃখিত হয়; আর যদি শক্তিতে কুলোয় তো যতটুকু পারে দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ-লোক অন্যের দুঃখে আনন্দিত হয়, হাসে; বলে—কর্ম্মফলে ভুগছে। জানে না—তারও একদিন অমনি দুঃখ হতে পারে। এ সব অতি নীচ জীবের কথা। মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে—পরস্পরের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করা, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা। মহাপুরুষদের জীবন দেখলে এ সব বুঝতে পারবে।

অবতার মহাপুরুষেরা হচ্ছেন মানুষের আদর্শ। তাঁরা কর্ম্ম করে দেখিয়ে দেন—কি করে মনুষ্যত্ব লাভ করতে হয়; আর সকলে তাঁদের উপদেশ মেনে, জীবন দেখে মনুষ্যত্ব লাভ করে। সব জীবনেরই একটা আদর্শ আছে। মহাপুরুষেরা সে আদর্শ জীবনে প্রকাশ করে আর উপদেশ দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন সে সব উপদেশ যে পালন করবে, আর তাঁদের জীবন দেখবে—সে-ই আদর্শ জীবন লাভ করতে পারবে। এ ছাড়া মনুষ্যদেহ ধারণ করে আর কি করবে? তাই বলি, যদি ভগবানের দয়ায় মানুষজন্ম পেয়েছ, জীবনটা এমনি তৈরী কর যাতে তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, আর জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতে পার।

আপনি বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে পড়েছেন। আপনাকে তাঁর সম্বন্ধে আর কি বলবো। জীবন-কালে লোকে বুঝতে পারে নি। সকলেই ভাবতো তিনি নাস্তিক। কিন্তু তিনি বিরাটের উপাসনা করতেন। আর এমন দয়াল দেখা যায় না। অনাথ গরীব ছেলেদের,

অসহায় বিধবাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য করতেন। এ সব দান এত গোপনে করতেন যে, কেউ জানতে পারতো না। নিরহঙ্কার, এত বড় বিদ্বান, এত টাকা, মান-সম্ভ্রম গ্রাহ্য করতেন না। ওসবের জন্ত তাঁর অহঙ্কার হতো না। লোকে যদি গরীব-দুঃখীদের সামান্ত সাহায্য করে তো নিজেই বলে বেড়ায়—'এত দিয়েছি, তত দিয়েছি; 'অমুককে এই দিলুম, তমুককে তা দিলুম।' অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। দান করবার আগে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়—দান করছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের ওসব ছিল না; তিনি দেব-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—"সে সামনের জন্মে আরও বড় শক্তি নিয়ে জন্মাবে।"

যে মেয়ে ধর্ম্ম-সাধন করে, শান্ত, দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করে, সে সৎ; সে মেয়ে ত দেবী—পূজার যোগ্যা। এমন সব দেবী-প্রকৃতি সকলের পূজা পায়; তারা কাউকে মায়া-মুগ্ধ করে না।

সাধনাই হল সন্ন্যাস; সন্ন্যাস নিয়ে কর্ম্ম ( সাধনা ) না করলে সব বৃথা হয়ে যায়। নিজ আত্মার যাতে সুখ হয়, আর বহু জনের কল্যাণ হয়, এমন সব কাজ সন্ন্যাসীর করা উচিত। সন্ন্যাসীর জীবনই হচ্ছে সকলের কল্যাণের জন্য। সেখানে অহঙ্কার, অভিমান একটুও থাকা ঠিক নয়। ওসব ভাব থাকলে লোক-কল্যাণ করা যায় না। বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁর দয়া ছাড়া ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-জীবন লাভ হয় না।

পরের উপকার করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। যে তা করে, সেই ধার্ম্মিক।

আর সেই সৎ—যে উপকার পেয়ে ভুলে যায় না। সংসারে দুঃখ, শোক নিত্যই লেগে আছে; মানুষ যদি পরস্পরের সাহায্য না করে, বাঁচবে কি করে? পরস্পরের সাহায্য করা, দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করা—এ হচ্ছে মানুষের ধর্ম্ম। যে এ নিয়ম না মানে সে অধম, পশু। কতক জীব আছে তারা ভারি স্বার্থপর। যখন দুঃখ, অভাব হয় তখন সাহায্য পাবার আশায় লোকের কাছে বিনয়-নম্রতা দেখিয়ে সাহায্য চায়। কিন্তু যেমনি কাজ মিটে যায়, সে দিক দিয়ে যায় না। দেখ, কি হীন স্বভাব! জানে না আবার দুঃখ হতে পারে, অভাব ঘটতে পারে, তখন সে আর সেখানে সাহায্য পাবে না। আর, এক জনকে এমন ঠকালে, অন্য লোকেও আর বিশ্বাস করবে না, সাহায্য করতে চাইবে না। যে উপকার পেয়ে ভুলে যায়, তার দুঃখ কোন কালে ঘুচবে না। ইহকাল, পরকাল—কোন কালই তার নেই।

শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে 'নিস্পরোয়া' হলেন, তখন তাঁর সব ভ্রম টুটে গেল, মান-ইজ্জতের মোহ ছুটে গেল। তিনি ব্রহ্মময় জগৎ দেখতে লাগলেন। শুকদেব হচ্ছেন সন্ন্যাসীর আদর্শ। তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ।

গুরু-কৃপায় যখন শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝতে পারবে, আর যখন তাঁর দয়ায় তোমার নিজের অনুভূতি হবে, তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে—এসব মান-সম্ভ্রম মিথ্যা, ভূয়া। আর প্রত্যক্ষই তো দেখছো—লোকে যাকে একদিন পূজা করেছে, এখন তাকে গালি দিচ্ছে, রাস্তা-ঘাটে অপমান করছে। এ মানের কি মূল্য আছে? তুমি লোকের জন্য প্রাণ দাও,

খুব খাটি, তারা তোমায় পূজা করবে; আর তা করতে করতে যদি একটু বেচাল হও, তা হলেই তারা তোমায় গালি দিবে। এ হচ্ছে জীবের ধর্ম্ম। তাই মহাপুরুষেরা ওসব মান-সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য করেন না, লোকের পূজার প্রতি কোনও আস্থা রাখেন না, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করে যান। তাঁদের লক্ষ্য ভগবানের দিকে থাকে, লোকমান্যের দিকে নয়। কারণ তাঁরা জানেন যে-লোক আজ পূজা করছে, কাল যদি একটা গল্‌তি ( ভুল ) হয়ে যায়, গালি দিবে। লোকে যদি বেশী মান্য করে, পূজা করে তা হলে মহাপুরুষেরা ভয় পান এই ভেবে—যদি অহঙ্কার এসে পড়ে তাহলে আর লোক-কল্যাণ করতে পারবেন না, আর নিজেরও হানি হয়ে যাবে। আর লোকে যত বেশী পূজা করবে—যদি একটা বড় রকম গল্‌তি হয়ে যায়, তা হলে তত গালি দিবে। কারণ তাঁরাও ( মহাপুরুষরাও ) তো মানুষ, আর মানুষের গল্‌তি হয়েই থাকে। আর যাঁরা যত বড় বড় কাজ করেন, তাঁদের তত বড় বড় গল্‌তি, ভুল-চুক হয়েই থাকে। এ তো মহাপুরুষদের জীবন দেখলেই বুঝা যায়। কিন্তু ওদিকে খেয়াল রাখলে কাজ করা চলে না। তাই নিষ্কামভাবে তাঁতে দৃষ্টি রেখে কাজ করাই হচ্ছে সব্‌সে আচ্ছা।

কম্বলি বাবার* দয়ার কথা মনে রেখ। তাঁর দয়ায় এখন হৃষীকেশে

* হৃষীকেশে 'বাবা কালেকম্বলিওয়ালে' সত্র ( মাড়োয়ারী সত্র ) স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ( যাঁর নাম কালেকম্বলিওয়ালে হয় একটা কাল কম্বলে সর্ব্বদা জড়িয়ে থাকতেন বলে ) কলিকাতায় ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করান। হৃষীকেশ সুন্দর তপস্যার স্থান হলেও ভিক্ষার সবিশেষ অসুবিধা থাকায় অধিক সাধু সেখানে এককালে থাকতে পারতেন না। উক্ত স্বামীজী বহুদিন তথায় তপস্যায় রত ছিলেন

অতএব তিনিও যে ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করেছিলেন ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে। মনে হয়, সেই কারণেই ঐ প্রকার অসুবিধা দূরীকরণ-মানসে তিনি কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় এসে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করে তিনি এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করেন তাঁর ঐ উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য। তিনি দিবারাত্র এককালে প্রায় এক সপ্তাহ কাল বড়বাজারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় বর্ষাকাল, আর কলিকাতার সেই অত্যধিক বারিপাত—এ সমস্ত অগ্রাহ্য করে, যেন সদুদ্দেশ্যে জীবন-পাত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আবার অন্নজল-গ্রহণ একেবারে ত্যাগ করেছিলেন। এই অবস্থায় দুই তিন দিন অতিবাহিত হবার পর ভক্ত মাড়োয়ারিগণ তাঁর সংবাদ জানতে পেরেছিলেন এবং অন্নত্যাগ করে এতদবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবার উদ্দেশ্য কি তাঁর নিকট জানতে চেয়েছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলেন—'আমি যা চাইব তা যদি দাও, তা হলে বলি। নতুবা আমি এতদবস্থায়ই থাকবো—অন্ন-জল গ্রহণ করবো না।' এইরূপে প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হতে চললেও, তিনি যা চাইবেন তা দিতে প্রতিশ্রুত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কথাই কাকেও বলেন নি। অবশেষে সাধু এই অবস্থায় শরীর ত্যাগ করলে সমূহ অমঙ্গল আশঙ্কা করে ধনী-মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ তাঁর আশা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন। তখন তিনি বললেন—'হৃষীকেশে সাধুদের ভিক্ষার বড় কষ্ট, সেখানে রুটি আর ডাল—এই সামান্য ভিক্ষার বন্দোবস্ত করে দাও, যাতে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানের উপাসনা করতে পারে।' এই নিঃস্বার্থ যাচ্ঞায় সকলেই এককালে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হলেন এবং খুব আনন্দের সহিত সেই কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হলেন।

তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলে তবে স্বামীজী অন্ন-জল গ্রহণ করেন। তৎপর মাড়োয়ারিগণ একটি সভা সংগঠন করে বহু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক হৃষীকেশে উক্ত 'সত্র' প্রতিষ্ঠা করেন।

পরে কালেকম্বলিবাবার ইচ্ছাতেই উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তীর্থ—গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদার ও বদরীর পথে ধর্ম্মশালাদি প্রতিষ্ঠা ও সাধু-ফকিরদের জন্য 'সিদা'-ভিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই তপস্যার গুণে ঐ সব দুর্গম স্থান এখন সুগম হয়ে গেছে।

সাধুরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানের নাম নিতে পাচ্ছে। হৃষীকেশে 'ভিক্ষা'র কোনই স্থবিধা ছিল না। সাধুরা ইচ্ছুক থাকলেও সেখানে ভিক্ষার অভাবের জন্য থাকতে পারতো না। সে দুঃখ কম্বলি বাবার দয়াতেই দূর হয়েছে; তাই এখন তোমরা সব সেখানে ভগবানের নাম নিতে পাচ্ছো। স্বামীজীর সঙ্গে হৃষীকেশে কম্বলি বাবার দেখা হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর খুব সুখ্যাতি করতো। কম্বলি বাবা যথার্থ ত্যাগী ও সৎকর্ম্মী ছিলেন।

চাতক পাখীর স্বভাব হচ্ছে—বৃষ্টির জল ছাড়া খায় না। তেমনি ঠিক ঠিক সাধু আর কারো ভালবাসা চায় না, এক ভগবানের ভালবাসা ছাড়া। তারা আর কিছুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না, কেবল তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হয়ে দেখে। যে সৌন্দর্য্যের এক কণা-প্রকাশে এত সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য যারা দেখেছে তারা কি এ সবে মুগ্ধ হয় রে?

স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতা, রাজ্য—কেউ-ই বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করতে পারলে না; কারো ভালবাসা, স্নেহ তাঁকে বাঁধতে পারলে না। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য তিনি কিছুতেই ভুললেন না; ভালবাসলেন এই বিশ্ব-জগতের সকলকে—যারা জরা, জন্ম, মৃত্যু-যাতনায় ভুগছে, আর ডুবলেন সত্যের মহিমায়।

লাল কাপড় পরলেই কি সাধু হওয়া যায় রে? যাদের ঈশ্বরের জন্য, পরের জন্য প্রাণ কাঁদে তারাই ঠিক ঠিক সাধু। সাধু হওয়া খুব কঠিন। যারা সাধু তারা নিজের জন্য ভাবে না, নিজের দুঃখ গ্রাহ্য

করে না—অপরের দুঃখের কথা একটু জানতে পারলে তা দূর করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, আর সামর্থ্য না থাকলে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে জানায়। যে সাধু সে তাঁর কাছে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে, দুঃখ জানায়। স্বামীজীকে সকলের কল্যাণের জন্য দুঃখ জানাতে দেখেছি; তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। সে যে কি ভাব, তা তোমরা কি করে বুঝবে? তার মুখে 'আহা, উহু' ছিল না; প্রত্যক্ষ দেখেছি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতো। কত কষ্টের পর আমেরিকা হতে ফিরে এসে মঠ করলে। মঠ হবার কিছুদিন পরেই কোথায় রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ হল, আর স্বামীজী 'রিলিফ' করবার জন্য টাকা চাইলে, কিন্তু টাকা আর আসে না। তখন বললে, 'আর এতদিনে যদি টাকা না আসে তা হলে মঠ বিক্রী করে দেব। আমরা সাধু, গাছ-তলাই হচ্ছে আমাদের স্থান; চলো ফের গাছতলা।' দেখ ব্যাপার! এই এত কষ্ট করে মঠ হল, কিন্তু জীবের দুঃখ দেখে থাকতে পারলে না; তাদের দুঃখ যদি একটু দূর হয়, সে জন্য মঠ বিক্রী করতে চললো। সে যে কি চিন্তা, কি ভাবনা, এই সব দুঃখীদের জন্য, তা তোমাদের কল্পনাতেও আসবে না!

যত অবতার আর সাধু হয়েছেন, তাঁরা সকলেই শুকদেবকে মেনেছেন। শুকদেব হচ্ছেন পরমহংসদের প্রধান। অমন জীবন আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বজীবকে অভয় দিয়েছিলেন।

মানুষকে যদি অর্থাদি খুব দিতে পার, তা হলে তোমায় খুব ভাল বলবে। বলবে 'দয়া যেন মূর্ত্তি ধরে এসেছে,' 'অমন লোক

জন্মায় না,' 'মানুষ নয় দেবতা'—এই রকম সব অনেক কথা। আর যদি তুমি ঐ দেয়া-দেয়ী বন্ধ করে দাও, তা হলেই তুমি খারাপ লোক হয়ে যাবে। এ হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি—স্বভাব। এইজন্য সৎলোক যাঁরা, তাঁরা লোকের নিন্দা-স্তুতির দিকে একেবারেই খেয়াল দেন না। তাঁরা সত্যকে কখন ত্যাগ করেন না; তাঁকে কেউ মন্দ বলুক বা ভালই বলুক, সে দিকে খেয়াল দেন না। লোকের মন-যোগান কাজ করতে গিয়ে সত্যকে ত্যাগ করেন না। তাঁরা লোকের প্রশংসা চান না, কেবল দেখেন যাতে আত্মার কাছে, ভগবানের কাছে দোষী না হন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর, কেশব সেন, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর—এঁদের জীবন দেখ। দেবেন্দ্র ঠাকুর রাজা লোক, কিন্তু ভগবানলাভের জন্য পাহাড়ে গিয়ে সাধনা করেছিলেন। এ কম কথা নয়। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি কলির জনক।' ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মত দাতা আজকাল বড় দেখা যায় না। কলিতে দানের চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই—বিদ্যাসাগর মশায় সেই ধর্ম্ম পালন করেছেন। কেশব সেন ইংলণ্ড পর্য্যন্ত মাতিয়ে দিয়ে এলেন। ভগবানের কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে যেতেন। খুব ধর্ম্মশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। এঁরা সব আদর্শপুরুষ। এক এক দিকে এক এক জনের বিকাশ; কারও একটু বেশী—এই তফাৎ।

শ— তোকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়েছে, এ মহাভাগ্যের কথা। ব্রহ্মচারীর স্বপাক খাওয়া উচিত। আমাদের হরি মহারাজ (স্বামী

তুরীয়ানন্দ ) ব্রহ্মচারি-অবস্থায় বার বছর স্বপাক খেয়েছিলেন ; তারপর সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে খেতাম। আমাদের মধ্যে তাঁর মত কঠোর তপস্যা কেহই করেন নি। খুব ভগবানকে ডাকবি। পবিত্রভাবে জীবন কাটাবি। সাধুর পোশাক পরে যেন লোক ঠকাস্ নি। পবিত্র থাকলে একদিন না একদিন তাঁর কৃপা হবেই।

## সাধন-ইঙ্গিত

'অভ্যাসযোগ' দ্বারা কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। এত দিনের কু-অভ্যাস —মনে করলে আর চলে গেল! সেরূপ মনের জোর তোমাদের নেই। তাই, তোমাদের অভ্যাস-যোগ দ্বারা তা করতে হবে—বিচার করতে করতে তবে কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হবে। যে-কোন কাজ করবার পূর্ব্বে বিচার করবে, বিচার খুব প্রয়োজন। বিচার না করলে বিবেকশক্তির উৎপত্তি হয় না। বিবেক-শূন্য মানুষ পশুর মত। বিবেকদ্বারাই ত সদসৎ জানতে পারা যায়, মায়ার খেলা ধরতে পারা যায়। বিবেক হলে তবে ত মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়। যার বিবেক নেই, মায়া তাকে ভুলিয়ে রেখে দেয়। তাই অভ্যাস-যোগ শিক্ষা করা দরকার।

গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান-জপ কর। বেশ জায়গা, শীঘ্র মন ইষ্টে বসে। সাধুরা তাই গঙ্গার ধার খুব ভালবাসে। গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান-জপ করলে দেহ-মন পবিত্র হয়, তাঁকে খুব শীঘ্র বুঝতে পারা যায়। গঙ্গায় স্নান, গঙ্গার জল পান, গঙ্গার ধারে বাস—এ তাঁর দয়া না হলে হয় না। যার তা হয়, জানবে নিশ্চয় তার কিছু সুকৃতি ছিল।

কর্ম্ম করবে না, কেবল ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে। সকাল ও সন্ধ্যা ধ্যান-জপের বেশ প্রশস্ত সময়। যার যে নামে রুচি ও যে মূর্ত্তিতে ধ্যান বসে—শ্রদ্ধা হয়, সে সেই নাম-জপ করবে, সেই মূর্ত্তি ধ্যান করবে। কর্ম্ম (সাধন) কর। জপ-ধ্যান করতে করতে রিপুদমন হয়—কাম, ক্রোধ ও লোভের দমন হয়। শুধু কি হয়? কর্ম্ম করতে হয়। চিত্ত স্থির হলো না বলে অত হাঁপাহাঁপি করিস্ কেন? অভ্যাস-যোগ দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। কর্ম্ম না করেই তোরা সব চাস্। আরে তা কি হয়? সব অবতার মহাপুরুষরা কর্ম্ম করে দেখিয়ে দিলেন সবাইর কর্ম্ম (সাধন) করতে হবে, তবে হবে। শ্রীদুর্গামূর্ত্তি ধ্যান করতে হলে প্রতিমায় যেরূপ মূর্ত্তি আছে ঐ মূর্ত্তি একমনে চিন্তা, ধ্যান করবে।

মনকে যদি কেউ আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে সে ভগবান হয়ে গেল। মন ক্রমাগত ছুটছে, সদাই চঞ্চল। মনের মত পাজি আর নেই। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললে, 'সখা, মন যে মানে না।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে স্বীকার করলেন যে, মন বড় পাজি। আর বললেন, 'হে অর্জ্জুন, অভ্যাস করতে করতে মন স্থির হবে।' যত মন বিষয়ের দিকে দৌড়ে যাবে, তত তাকে ধরে ধরে এনে ভগবানের দিকে লাগাতে হবে। এ রকম অভ্যাস করতে করতে মন স্থির হবে। এক ভগবান ছাড়া আর কিছু ভাববে না, তা হলেই কাম-ক্রোধাদি সব রিপুর দমন হয়ে যাবে। আর এদের দমন হলেই, মন স্থির হলেই, সেই সৎস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হবে। মন স্থির না হলে তিনি প্রকাশিত হন না।

সব বাসনাত্যাগ হলে তবে ব্রহ্মে মন যায়। ব্রহ্মে মন গেলে আর অহং-বুদ্ধি থাকে না। ত্যাগ অভ্যাস করতে করতে তবে বাসনা যায়।

ব্রহ্মচর্য্য মানে—ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে ভগবানকে জানতে পারা যায় না। কি দিয়ে জানবে ?—ধারণাশক্তি নেই। যারা ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের ধারণা-শক্তি জন্মায়। ধারণা-শক্তি হলে তবে ভগবানকে জানতে, বুঝতে পারা যায়।

যারা ঠিক ঠিক সাধন-ভজন করে, তাদের চোখ, মুখ দেখলে, কথাবার্ত্তা শুনলে বুঝতে পারি। এইজন্য তাদের আবার আসতে বলি। তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা বললে আনন্দ হয়, তাদের খাওয়ালে আনন্দ হয়।··· খুব চুটিয়ে সাধন-ভজন করে যা। রাত্রে কম খাওয়া ভাল, আর দুপুর বেলায় খাওয়াটা পেট-ভরা হওয়া চাই। শরীরের উপর মায়া না আসে। ভগবানলাভ করবার জন্য শরীররক্ষা করতে হয়।

জপে সিদ্ধি হয়—এ ঠিক কথা। যখন জপ ঠিক ঠিক জমে যায় তখন ধ্যান-ধারণা আপনিই হয়। মনে তৈলের ধারার মত নিয়ত জপ চলতে থাকে। তখন বাহিরে জপ ফুরায়—অন্তরে হতে থাকে। জপান্তে ধ্যান-ধারণার চেষ্টা করতে হয়—এতে ধ্যান স্থায়ী হয়, ধারণা বাড়ে।

'আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছেন, এ জগতে আর কেউ নেই'—একেই বলে ধ্যান। অভ্যাস করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে, এই ভাব দৃঢ় হয়; তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান হয়।

মন্ত্র নিয়েছে ত কি হয়েছে—বাকি সাধন করা চাই। মন্ত্র নিলেই সব কিছু হয়ে যায় না, সাধন করতে হয়—কঠোর সাধন। গুরু যেমন উপদেশ দেন, সেরূপ ঠিক ঠিক করতে হয় নিষ্ঠাপূর্ব্বক। কিছু হচ্ছে না বলে ছেড়ে দিতে নেই—লেগে থাকতে হয়। একনিষ্ঠ হয়ে লেগে থাকলে হবেই।

তুমি কাঁদ তা আমি জানি। পবিত্র হও, তা হলে সব বুঝতে পারবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—পবিত্র হবার শক্তি চাও, তাঁর দয়া হলে সব হয়ে যাবে। তিনি পবিত্র হবার শক্তি না দিলে, কেউ হতে পারে না। পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা—জপ কর।

জপে সিদ্ধি হয়, এ কথা ঠিক। চৈতন্যদেব এ কথা বলে গেছেন। জপ ঠিক ঠিক হলে ধ্যান আপনা-আপনিই হবে। তারপর ধ্যান যখন তৈলধারার মত চলবে, তখন বাহ্যিক জপ ফুরিয়ে যাবে, ধারণা হবে। তাই, জপান্তে একটু বেশী সময় ধ্যানাদি অভ্যাস করতে হয়—তবে ধ্যান স্থায়ী হয়।

মৃত্যু স্থান-কাল বিচার করে না। তার সময় হলেই হাজির হয়—কোন বাধা মানে না। তখন তোমার 'এখন ভগবানকে ডাকবো না, বুড়ো বয়সে ডাকবো'—এ কি করে বলা সাজতে পারে? যদি তুমি বুড়ো হবার আগেই মরে যাও, তা হলে এ জন্ম তোমার বৃথা গেল। আর দেখ, ভগবানের উপাসনার স্থান-কাল নেই, শুচি-অশুচি নেই; সব সময় সব স্থানে সব অবস্থাতেই করা যায়; তাতে কোন দোষ হয় না। যখন মৃত্যুর কিছুই ঠিক নেই, তখন তাঁর উপাসনারও কোন কিছু ঠিক থাকতে

পারে না। মনে কর, যখন আমি অশুচি অবস্থায় রয়েছি, তখন যদি মৃত্যু হয়; তা হলে তো আমার ভগবানকে ডাকা হবে না! তবে শুচি-অশুচি বিচার করতে কেন বলেছে? সেটা মনের একাগ্রতা আনবার জন্য, চঞ্চল মনকে একটা শুদ্ধ সঙ্কল্প দিয়ে স্থির রাখবার জন্য। সাধনপথে শুচি-অশুচি-বিচার খুব দরকার। কিন্তু সেটাই প্রধান নয়, তাঁকে ডাকাটাই হচ্ছে প্রধান।

ধর্ম্ম-সাধন গোপনে করতে হয়—যত গোপন হয়, ততই ভাল। লোক-সাক্ষাতে ধর্ম্মসাধন করা ঠিক নয়, অহঙ্কার আসতে পারে। যারা রাজসিক তারা লোক-সাক্ষাতে ধর্ম্ম-সাধন করে মান পাবার জন্য। ঠাকুর বলতেন—ধর্ম্ম-সাধন করবে মনে, বনে আর কোণে।

উদ্ধবসংবাদ খুব ভাল। ভাগবতের যেখানে বৈরাগ্যের কথা আছে, সেইসব যারা পড়বে, তাদের কল্যাণ হবেই।··· সকল সময় ধ্যান-জপ করা যায় না। তাই সেই সময় সৎপুস্তক পড়া উচিত, অথবা ধর্ম্মচর্চ্চা করা কর্ত্তব্য। মনকে কখন বাজে চিন্তা করতে দেবে না। তা করতে দিলেই সে তোমায় বিগড়ে দেবার চেষ্টা করবে। তাই তাকে একটা-না-একটা সৎ-অবলম্বন দিতে হয়। সৎ চিন্তা, সৎ পুস্তক-পাঠ, সৎ চর্চ্চা, সৎ কর্ম্ম—এই সব দিয়ে সর্ব্বক্ষণ মনকে ব্যস্ত রাখতে হয়, তবে তো কালে সৎস্বরূপের প্রকাশ হয়।

এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের মন কত রকম বদলাচ্ছে, তার ঠিকানা নেই। এই বেশ ভাল আছে, কখন যে বিগড়েছে জানতেই

পারা যায় নি। মনের এমনি চঞ্চল গতি যে, কখন কোথায় যায় ধরাই মুশকিল। ধান করতে করতে মনের উপর অধিকার আসে। তখন মনের চঞ্চল গতি সাধককে আর ঠকাতে পারে না। মন ধ্যান ছেড়ে পালালেই সাধক বুঝতে পারে, তখন ফিরিয়ে এনে ধ্যানে লাগিয়ে দেয়। এমনি করতে করতে মন স্থির হয়ে যায়, তখন আর বেশী দৌড়াদৌড়ি করে না; যে বিষয়ে লাগিয়ে দেয় সেইখানেই থাকে, অন্য চিন্তা আর করে না।

যে নামে অথবা যে রূপে তোমার ভগবানকে ডাকতে ভাল লাগে, সেই নামে আর সেই রূপেই তাঁকে ডাক। কিন্তু কেউ যদি তোমার ইষ্টদেবের বিষয় পুছে ( জিজ্ঞাসা করে ), তা হলে তখনই তার সঙ্গে কথা-কওয়া বন্ধ করে দিবে। এ সব ধর্ম্ম-জগতের 'গোপন' ( গুহ্য ) বিষয় প্রকাশ পেলে সাধকের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

## ইষ্ট-নিষ্ঠা

কেবল নিষ্ঠা, নিষ্ঠা—খুব নিষ্ঠা চাই; বুঝেছ? সব ভুলে যাও, কেবল তিনই ভিতরে বাহিরে থাকুন। তাঁকেই রাখ—আর সব ছাড়।

মুসলমানদের দেখ, কেমন জ্বলন্ত নিষ্ঠা! সমস্ত কাজ ফেলে তারা নেমাজ পড়তে ( উপাসনা করতে ) লেগে যায় রোজ। আবার তাদের কেমন সুন্দর একতা, সবাই একসঙ্গে নেমাজ পড়ে। আর তোমরা কি করছ? কেবল তাঁর নামে ভেদাভেদ করছ, বড়-ছোট নিয়ে মাথা

ঘামাচ্ছ ; তাঁকে ডাকবে কখন ? আরে, এ যে তিনিই নানা রূপ ধারণ করেছেন, তার মধ্যে আবার ছোট-বড় কি রে ! সবই তিনি। ভেদ-বুদ্ধি—ওসব হীন বুদ্ধি। ছি ! ইষ্টে নিষ্ঠাই হল প্রধান। ভেদ-বুদ্ধির দরকার কি ? যার ঠিক ঠিক ইষ্ট-নিষ্ঠা হয়, তার সব ভেদ-বুদ্ধি চলে যায়।

তুমি ভগবানকে ডাক, কিন্তু তোমার এত ভেদ-বুদ্ধি কেন ? মুসলমানের ভগবান, খ্রীষ্টানের ভগবান কি আলাদা ? ভগবান ত অনেক নয়—এক ; তার মধ্যে আবার ছোট-বড়, এর ভগবান, তার ভগবান—এ সব কি বুদ্ধি ? ও রকম হীন বুদ্ধি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তোমার ইষ্ট তোমার কাছে বড় ; তাদের ইষ্ট তাদের কাছে বড় ; ইষ্ট কিন্তু এক, কেবল নামের তফাৎ—ভাব নিয়ে কথা। যে ভগবান তোমার ইষ্ট, সেই ভগবানই তাদের ইষ্ট ; তারা এক নামে ডাকছে, তুমি আর এক নামে ডাকছ—এই তফাৎ। তবে ভেদ-বুদ্ধি কেন ? যে ভগবানকে চায়, সে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করবে।

তুলসীদাস, রামপ্রসাদ—এঁরা সব ইষ্ট-লাভ করেছিলেন ; রামপ্রসাদের কত বৈরাগ্য, কেমন প্রেম—মা-কালীকে ঠিক ঠিক মায়ের মত ভেবে গালি দিচ্ছে, আব্দার কচ্ছে। লোকে মানুষের কাছেই আব্দার-জুলুম করে, কিন্তু তিনি মানুষ নন—অশরীরী, তবুও তাঁর কাছে আব্দার-জুলুম কচ্ছে। কতখানি ভক্তি-বিশ্বাস হলে এমন করে। ইষ্টকে আপন হতে আপন ভাবতে হয় ; তিনি আত্মা—আত্মীয়ের চেয়ে বড়, আরো কত আপন।

কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) স্বামীজীর আদেশে বিলেতে গেল। যখন স্বামীজী লেকচার দিতে বললে, তখন ভয় পেয়ে বললে—"আমি পারবো না; কি করে বলবো?" স্বামীজী বললে—"আমি যাঁর মুখ দেখে বলেছিলাম, তুমিও তাঁর মুখ দেখে বল।" তখন আর ভয় রইল না—খুব ভাল বললে।

সত্যভামার মহিষী হবার ইচ্ছা হয়; রুক্মিণীর মনে মনে হিংসা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা জানতে পারলেন। একদিন তিনি সত্যভামার সঙ্গে বসে আছেন, এমন সময় দেখলেন হনুমান আসছেন। তখন সত্যভামাকে বললেন—"তুমি শীঘ্র সীতারূপ ধর, আর আমি রামরূপ ধরি—হনুমান অন্যরূপ দেখবে না।" সত্যভামা সীতারূপ ধরতে পারলেন না। এমন সময় স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণী এসে সীতারূপ ধরলেন। হনুমান রামরূপ ছাড়া অন্যরূপ দেখতে ভালবাসতেন না। বলতেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

গুরু-বাক্য ছাড়তে নেই। লোকে যাই বলুক না কেন, কখনও সংশয় করবে না। স্বচক্ষে না দেখে কোন কথা বিশ্বাস করা ঠিক নয়, আর কারো উপর সংশয় করা ভুল। সাধু মহাপুরুষরা সকলেই বলেছেন—'গুরুর হুকুম নিষ্ঠার সহিত পালন করলে কল্যাণ হবে। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা হলে তবে ইষ্টে নিষ্ঠা হয়। যার গুরুতে নিষ্ঠা নেই, তার ইষ্টে কোন কালেই নিষ্ঠা হবার আশা নেই, আর তাই কল্যাণেরও

আশা নেই। এ জগতে একমাত্র গুরুই ভরসা।' 'গুরু-বাক্য মূলাধার, গুরু-পদ ভরসা।' গুরুর ছবি পূজা করা যেতে পারে, তাতে শিষ্যের কল্যাণই হয়।

সময় মত পূজা না করলে অকল্যাণ হয়। অসময়ে পূজো করার চেয়ে না করাই ভাল। আমার তো খুব ইচ্ছা পূজো করি; কিন্তু শরীর সুস্থ নয়, পারি না। তোর এটা মনে রাখা উচিত যে, ঠাকুর এখনও জল পর্য্যন্ত খান নি। এত বেলায় কি পূজো হয় রে? তুই ভোগ দিবি, তবে ঠাকুর খাবেন। তোর যেমন ক্ষুধা পায়, তাঁরও তেমনি পায়। প্রত্যক্ষ তিনি রয়েছেন—অন্নগ্রহণ করেন দেখেছি। তাঁকে কষ্ট দিলে ভুগতে হবে।

উপলক্ষ্য না মানলে ভগবানও সন্তুষ্ট হন না; দেখ না, দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণ সখী বলে কতই ভালবাসতেন। তাঁরই বিপদের সময়—সেই বস্ত্র-হরণের সময় কতই তিনি অনাথ-নাথ, দীন-বন্ধু, বিপদ-বারণ, লজ্জা-নিবারণ বলে ডাকলেন, তিনি এলেন না। কিন্তু যেই দ্রৌপদী পাণ্ডব-নাথ, পাণ্ডব-সখা বলে ডাকলেন, তখনই তিনি এলেন। দ্রৌপদী যতক্ষণ 'উপলক্ষ্য' পাণ্ডবগণের নাম না করলেন, ততক্ষণ এলেন না। যেই পাণ্ডবগণের নাম করা, অমনি হাজির।

# কাম-কাঞ্চন

কাম দাবিয়ে রাখবে, বাড়তে দেবে না। যাতে কাম না জাগে, সব সময় সেই দিকে নজর রাখবে। কাম হচ্ছে শত্রু, সাধনপথে বিঘ্ন ডাকে। যে কাম জয় করেছে তার সব হয়ে গেছে।

কি রকম বুদ্ধি দেখ! সংসারের যত ময়লার মধ্যে জীবন কাটাবে, তবুও একটু জিতেন্দ্রিয় হয়ে ভগবানের দিকে যাবে না। একপাল ছেলে-পুলে নিয়ে গুয়ে-মুতে দিনরাত থাকবে, তবুও সংযম করে যে ভগবানকে ডাকবে, তা ডাকবে না। ঈশ্বরের পথে গেলে ইহকাল আর পরকালে সুখ ও আনন্দ পাবে, কিন্তু এমনি নোংরা বুদ্ধি যে কিছুতেই তা যাবে না। একেই বলে—অবিদ্যা মায়া। তবে অনেক ভগবতীও আছেন; তাঁরাই মেয়েদের আদর্শ, তাঁদের হচ্ছে দেবী-ভাব। আজকাল এমন খুব কম।

সৎভাবে জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কারো সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি না করে যাতে শান্তিতে জীবনটা কেটে যায়, তারই চেষ্টা করতে হয়। এক ছটাক জমির জন্য, দুটা টাকার জন্য তোরা ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি করিস্, মকদ্দমা করিস্; আরে, এ কথা ভাবিস না যে, তুই সংসারে কদিন বা এসেছিস আর কদিন বা থাকবি? যারা সৎ, তারা ভাবে—ক'দিন বা বাঁচবো, ঐ সামান্য জিনিসের জন্য কেন অশান্তি বাড়াই? আমি সংসারে যখন

এসেছিলাম, তখন কিছুই নিয়ে আসি নি; আর যখন যাব, তখনও কিছু নিয়ে যেতে পারবো না। কেন মিছামিছি অশান্তি কিনি—দুঃখ পাই! তাই, যারা বুদ্ধিমান তারা ঐ এতটুকু মাটির জন্য বা দুটা টাকার জন্য ঝগড়া করতে যায় না; তারা ঐগুলোর চেয়ে শান্তিটা বড় দেখে।

মদ যে সংসারে ঢুকেছে, সে সংসার নিশ্চয় শীঘ্রই উচ্ছন্নে যায়, তার আর সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য ও অর্থ—দুই-ই নষ্ট। এদিকে পেট ভরে খেতে পায় না, ছেলে-মেয়েদের একটা জামা কাপড় দিতে পারে না, কত কষ্টে দুপয়সা উপার্জ্জন করে কিন্তু মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। কি আহাম্মক দেখ! মদ খেয়ে মাতলামি করে, কত দুঃখ পায় তবুও ছাড়ে না। কি বেকুবী দেখ! আবার মাগীগুলো ( বেশ্যারা ) তার উপর মায়া চেলে দেয়, সব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তবুও তাদের কাছে যাবে; তাদের কথায় ভুলে যায়—বুঝে না ওসব ফাঁকা কথা। কি মায়া দেখ! ওরে, ওরা মায়াবিনী, ওদের কথায় ভুলিস নি, ভুলিস নি!

'হে ভগবান! তোমার মায়া থেকে রক্ষা কর!' ছেলে-বেলার বুদ্ধি ফেলে দে; ওদের মুগ্ধ করবার বড় শক্তি আছে। একবার মুগ্ধ হলে আর ছাড়তে পারবি নি, মারা যাবি। ওরা ( বেশ্যারা ) মায়া-জাল ফেলে মুগ্ধ করে রাখে; তখন বুঝতে পারা যায় না যে মুগ্ধ করেছে। তাই ওদের কাছ থেকে সাবধান, দূরে থাকবি।

ভোগ যতই বাড়াবে ততই বাড়বে, আর যতই কমাবে ততই কমবে।

আর ভোগ যত করবে, ততই অশান্তি বাড়বে। ভোগ-প্রবৃত্তি কখনই শান্তি দিতে পারে না, সুখ দিতে পারে না। ভোগ হতে যত মন নিবৃত্ত হবে, ততই সুখ পাবে। আর এ ছাড়া শান্তির উপায় নেই।

ইঞ্জিনিয়ার বাবুর শরীর গেছে—বড়ই দুঃখের বিষয়। আমি ত আগেই তোমাকে বলেছিলাম যে, এ শরীরের কিছুই ঠিক নেই—কখন থাকে, কখন যায়। তাই বলেছিলাম যে, টাকা জমাক। কতকগুলি নাবালক ছেলে-মেয়ে আছে, বুড়ো মা আছে, আবার একটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তুমি বলছ কিছু টাকা আছে, যা হউক এক রকম চলে যাবে। তা যাই হউক তাঁর জামাই ভু— যেন দেখাশুনা করে। তুমি আমার নাম করে লিখে দাও। ইঞ্জিনিয়ার বাবু সৎলোক ছিলেন; কাঁচা পয়সার মায়া ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। যে কাঁচা পয়সার মায়া ত্যাগ করতে পারে, সে কি কম লোক? পয়সার জন্য লোকে কি না কচ্ছে? সে যা হউক, সৎলোকের কোনকালেই কষ্ট হবে না, এ ঠিক।

তুমি বড়লোকের ছেলে—মহাজন; টাকার কোন অভাব নেই। খবরদার মদ-মাগী যেন না ঢোকে, তা হলেই একেবারে সর্ব্বনাশ। যদি সৎভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার, তা হলে তোমা দ্বারা অনেক গরীব-দুঃখীর কল্যাণ হতে পারবে, ভাল ভাল কাজ করতে পারবে। কিন্তু একবার বদ-খেয়াল হলে আর বাঁচোয়া নেই, তোমা দ্বারা অপরের কল্যাণ ত হবেই না, বরং অকল্যাণ হবে। তাই বলছি—ধনী সাবধান!

ঠাকুর এক জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি সাধ হয়?" সে বললে, "একটি ছেলে যেন হয়।" তখন ঠাকুর বললেন, "দূর শালা! এত সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালাম, সব বাজে হয়ে গেল।" দেখ, একবার মায়ার খেলা! অত ধর্মকথা শুনেও তার চৈতন্য হল না।

বিয়ের বিষয়ে বাপ-মার ছেলেকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। 'এই ত সংসার দেখছো, এই আমাদের আয়, যদি তোমার ইচ্ছা হয় বিয়ে করতে পার'—এই ভাবে ছেলেকে সংসারের সব অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। ছেলে রোজগারী না হলে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করাকে রোজগার বলা চলে না। ওতে তার নিজেরই পেট ভরবে না, তা অপরকে কি খাওয়াবে? দু-চার জনকে অনায়াসে খাওয়াতে-পরাতে পারে যখন এমন অবস্থা হবে তখন বিয়ে দেওয়া ভাল। আর বাপ-মার অগাধ সম্পত্তি থাকে, তা হলে বিয়ে দিতে পারে; কারণ সেখানে অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। যেখানে তার অভাব, সেখানে দু'চার হাজার টাকার লোভে কখনই বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যার সংসারে কষ্ট আছে, সে উপযুক্ত ছেলেকে তা বেশ করে বুঝিয়ে দেবে। তাতেও যদি সে বিয়ে করে, তবে বাপ-মার পক্ষে বাঁচোয়া, ছেলে আর তাদের দোষ দিতে পারবে না। দেখ না, এদিকে নিশ্চিন্ত মনে দুবেলা দুটো খেতে পায় না, কিছু টাকার লোভে ছেলের বিয়ে দিয়ে আরো দুঃখ কিনে নিয়ে আসে। মনে ভাবে ঐ টাকাটা পেলে সংসারের কিছু কষ্ট দূর হবে; কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যায়, তার আবার বছর বছর ছেলে হতে থাকে, তখন আরো কষ্ট বেড়ে যায়। নিজের বুদ্ধির দোষেই এই দুঃখ। চোখের সামনে অমন

হাজার হাজার ঘটনা নিত্যি দেখছে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি নেই ; তাই নিজে আবার তাই করছে আর দুঃখে ভুগছে।

'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কোনকালে গতি নাই'—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলতেন। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। ঠাকুরও বলতেন, 'খুব সাবধানে ওদের ( ঘোর সংসারীদের ) সঙ্গে মিশতে হয়, কথাবার্তা বলতে হয়।' ওরা সোজা সরল কথা বলতে জানে না। দিনরাত কপটতা, প্রবঞ্চনা নিয়ে থাকে ; সে স্বভাব কি আর ইচ্ছামত ত্যাগ করতে পারে ? তাই স্থান-কাল বিচার করে বল্—তাও পারে না। আর পারবেই বা কি করে ; সে বিচার-বুদ্ধি নেই। তবে সব সংসারীই কি অমনি ? তা নয়। এমন সব সৎসংসারী আছে, যাদের দেখলেও পুণ্য হয়।

ছেলে হলেই ত হয় না—বাঁচাই হল প্রধান। এই তো মাইনে পাও, তাতে যদি বছর বছর ছেলে হয়—খেতে দেবে কি ? ঠাকুর বলতেন—'দু-একটা ছেলে হবার পর ভাই-বোনের মত থাকবি।' অল্প ছেলে হলে তবুও দুমুটো পেট ভরে খেতে পাবে, ভাল-মন্দ পরতে পাবে ; কিন্তু অনেকগুলি হলে তা আর হয়ে উঠে না। যার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে অথচ কম মাইনে—সে ত ভেবে ভেবে মারা যায়, আর ছেলে-মেয়েগুলো অযত্নে না-খেতে পেয়ে মরে যায়। এ তো অসংযত ভোগের ফল ! সদাই চিন্তা—'কি করে খাওয়াব, কি করে মেয়েগুলোর বিয়ে দেব।' কিন্তু এদিকে ইন্দ্রিয়-সংযমের দিকে আদৌ লক্ষ্য নেই। এত অসংযমী হলে দুঃখ পাবে না তো কি হবে ? যদি এইসব দুঃখের

হাত থেকে বাঁচতে চাও—সংযমী হও। সংযমী হলে খেয়ে-পরে আনন্দ করে যেতে পারবে; আর নিত্য অভাব লেগে থাকবে না। ছেলে-মেয়েগুলো যদি শিক্ষা না পেল, মানুষের মত না হল, ভাল করে খেতে পরতে না পেল তো হল কি? তাদের মানুষ করাটাই হল আসল।

রোজ রোজ থিয়েটার দেখা ভারী খারাপ। ওতে আসক্ত হয়ে অনেকে উৎসন্ন যায়। যত সব বেশ্যামাগীরা নেচে নেচে ছোঁড়াদের ওপর মায়া চেলে দেয়, আর তাদের সর্ব্বনাশ করে। এখন তোমাদের যুবা বয়স; এই সময়টা বড় খারাপ। যে ঠিক থাকতে পারলে সে তো বেঁচে গেল। থিয়েটারে যে কিছু ভাল নেই, তা বলছি না। ভালও অনেক আছে—শিখবার জিনিস। কিন্তু ভাল-মন্দ বেছে নেবার শক্তি ক'জনের আছে? অত প্রলোভনের জিনিস সামনে—মন বেটা পাজি, যতই বুঝাও না কেন, সে সেই দিকে দৌড়াবেই। তাকে রোখবার শক্তি ক'জনার হয়? তাই প্রলোভনের কাছ হতে দূরে থাকাই ভাল। তোমাদের আপনার মনে করি বলেই বলি; রাস্তার লোককে কি বলতে যাই?

তুমি যে গরীব তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তার কি করতে পারি? বলছ—তিন-চারটি ছেলে হয়েছে, অর্থাভাবে সংসার চলে না। তা আমি কি করবো? আমি সাধু, আমার কাছে সোনা-করা বিদ্যে শিখতে এসেছ? তা বাপু আমার ও সব জানা নেই। কোথায় সাধুর কাছে এসে দুটো সৎকথা শুনবে, অবিদ্যা-মায়া হতে রক্ষা

পাবার উপায় জানবে, তা নয়—সোনা-করা বিদ্যে শিখতে এসেছে। দেখ ব্যাপার! মায়ায় ডুবে রয়েছে—তা ও আর কি করবে? তিনি কৃপা না করলে জীবের সাধ্য কি যে মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়।

অর্থ যেমন উপকার করে, তেমনি অপকারও করে। কামিনী আর কাঞ্চন হচ্ছে সব অনর্থের মূল। কামিনী না হলেও একজনের চলতে পারে, কিন্তু অর্থ না হলে চলা বড়ই কঠিন। এই অর্থের দ্বারা অনেক ভাল কাজ হয়—যেমন গরীব, দুঃখী, অনাথ এদের সাহায্য, প্রতিপালন করা যায়। এই রকম অনেক সৎকাজ করা যায়। কিন্তু যদি একবার দুষ্টামি-বুদ্ধি ঢোকে, তা হলে আর গতি ( নিস্তার ) নেই। টাকার জোরে অনেক রকম বদমায়েসী, অন্যায় অত্যাচার করা যায়। অর্থ থাকলে সৎ-বুদ্ধি প্রায়ই হয় না। শালা টাকার এমনি গুণ যে দুষ্টুমির দিকে টেনে নিয়ে যাবেই, ভাল লোককেও খারাপ করে দেয়! যার অর্থ আছে অথচ সৎ—জানতে হবে তার প্রতি ভগবানের খুব দয়া। বুঝ ব্যাপার! একই জিনিস, কিন্তু তার দু'রকম গুণ। তাঁর দয়া ছাড়া এর খারাপ গুণ থেকে নিস্তার পাবার জো নেই।

মানুষ বিয়ে করে স্ত্রীর একেবারে বশীভূত হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে কি করে সন্তুষ্ট রাখবে এই চেষ্টায় ব্যস্ত! বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সব পর হয়ে যায়; সকলের কাছ হতে তফাৎ হয়ে যায়। দেখ, একবার মায়ার ব্যাপার! গর্ভধারিণী মা, তিনি পর হয়ে যান। আবার দেখ—বড় বড় চাকুরে দু-পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়, যুদ্ধের সময় দশ-পনর হাজার লোকের নেতা হয়—হয়তো একেবারে স্ত্রীর বাধ্য। স্ত্রীর কথার ওপর কথা বলতে

পারে না—তার কাছে গেলেই যেন সব বিদ্যা-বুদ্ধি চাপা পড়ে যায়! কি মোহিনী শক্তি দেখ! তবে সকলেই কি অমন হয়? এমন সংযমী পুরুষও আছে যে কখনও স্ত্রীর মোহে পড়ে না। স্ত্রী তার উপরে কর্ত্তৃত্ব করতে পারে না। স্ত্রীকে ভালবাসতে হবে বলে কি তার গোলাম হয়ে যেতে হবে? ভালবাসা একটা জিনিস আর গোলাম হয়ে যাওয়া আর একটা জিনিস। যারা খুব বেশী ইন্দ্রিয়পরায়ণ তারা তত স্ত্রীর বশীভূত হয়ে যায়।

পঞ্চপাণ্ডবেরা ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। যুধিষ্ঠির মহাধার্ম্মিক, মহাদুঃখ-কষ্টেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নি। ধর্ম্মই মনুষ্য-জীবনে চিরদিন যথার্থ সুখ দিতে সমর্থ। ধর্ম্ম-ত্যাগ করলেই দুঃখ পাবে। তাই ধর্ম্ম কখন ছাড়বে না।

জিনিসপত্র সব দুর্ম্মূল্য। লোকে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করবে, না ধর্ম্ম করবে? এখন অন্নচিন্তাই হল প্রধান। পূর্ব্বে অন্নচিন্তা ছিল না, তাই সকলে অল্প-বেশী ধর্ম্মে মন দিতে পারতো। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) তাই বলতো, 'আগে দুমুঠো পেট ভরে খা, তারপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবি।' পেটে অন্ন নেই, ধর্ম্ম করবে কি করে? আগে অন্নের সংস্থান কর, দুমুঠো খাবার যোগাড় কর—নিজে পেট ভরে খা আর দশজনকে খেতে দে, প্রতিপালন কর, খাওয়া—তবে ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে।

কর্ম্মকে সবাই মানে। কর্ম্মপ্রকাশ হলে লোকে আপনিই মানবে। সকলেরই ভিতর ভগবান আছেন—তাঁর প্রকাশ আছে; কিন্তু যার ভিতর তাঁর বেশী প্রকাশ তাকে মানতেই হবে। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশিত হন। কর্ম্ম হল শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলছেন—'হে অর্জ্জুন, কর্ম্ম কর।' করম্‌সে করম্‌ কাটে।

যে যেমন কর্ম্ম করবে, তার মন ঠিক তেমনি হবে। যে নীচ কর্ম্ম করে, তার মন নীচ হয়, আর যে উচ্চ কর্ম্ম, সাধুকর্ম্ম করে, তার মন উঁচু হয়—উদার, সাধু হয়। আর যে যা কর্ম্ম করে, তার মন সেইখানে যায়—সেই কথা ভাবে। মেথর পায়খানায় কাজ করে, তার মন পায়খানায় যাবেই। তেমনি যে যা কর্ম্ম করবে, তার মন সেখানে যাবেই।

লোকে ধর্ম্ম করবে কি? গর্ভধারিণীকে টাকা দিতে কষ্ট হয়—যাঁর দয়ায় জগৎ দেখছে। মা কত কষ্ট করে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করে এত বড় করেছেন; এখন কত টাকা উপায় করে নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের জন্য কত খরচ করে, কিন্তু মা—গর্ভধারিণীকে দেখে না। একি কম দুঃখের কথা! একেই বলে কলিযুগ। যে সংসারে গর্ভধারিণী কষ্টে থাকেন, সে সংসারে শান্তি থাকে না—সে সংসার মহা অপবিত্র, শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়।

বিধবার যে কি দুঃখ, তা তোরা কি বুঝবি? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় বুঝেছিলেন। যে বিধবার বিষয় ফাঁকি দেয়—তার ইহকালও নেই, পরকালও নেই। সকলেরই বিধবাকে (যার সামর্থ্য নেই তাকে)

সাহায্য করা উচিত। বিধবার চোখে জল পড়লে আর রক্ষা নেই, যে দুঃখ দেবে তার সর্ব্বনাশ হবে।

তোমার বিমাতার শরীর গেছে। হাজার হউক তোমার মা ত! অশৌচ পালন করা উচিত। তবে পূজা করতে যেতে পার। তার শ্রাদ্ধের পর তিলভাণ্ডেশ্বরের ভোগ দিও, আর সাধুসেবা করিও। তা হলে ওর আত্মার কল্যাণ করা হবে। এই হলো ছেলের কাজ—ধর্ম্ম।

কর্ম্মের জন্যই মানুষ পূজা পায়, আর কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ বড় হয়; এই তো যা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। এই সাহেবরা কি সাধে বড হয়েছে? ওরা চুপ করে বসে থাকতে চায় না, কিছু-না-কিছু করছেই। ওরা কর্ম্মবীর। ভগবান ওদের কর্ম্ম দেখে বড করেছেন। তোমরা ওদের হিংসা করে কি করবে বল? ওদের হিংসা করলেই কি তোমরা বড় হয়ে যাবে? তা হবার যো নেই। বড হতে চাও তো হিংসা ছাড়, ওদের মত কর্ম্ম কর, তা হলে তাঁর দয়া হবে। তিনি বড় না করলে কেউ বড হতে পারে না। তিনি কর্ম্ম দেখেন আর কর্ম্মমতো দিয়ে দেন। হিংসুক কখন উন্নতি করতে পারে না। যদি উন্নতি করতে চাও ত হিংসা ছাড়—কর্ম্ম কর।

কেউ একটু ভাল-মন্দ খাচ্ছে দেখে লোক হিংসা করে। কি নীচ স্বভাব দেখ! বোঝে না, তার কর্ম্ম আছে বলে খাচ্ছে; কর্ম্মই তাকে সুখ দিচ্ছে। হিংসুকেরা কর্ম্ম করে না, অথচ সুখ চায়। আরে, ফাঁকি দিয়ে কি আর সুখ পাওয়া যায়?

এতদিন ত সংসার দেখলে, এখন বয়স হয়েছে, আর কেন? একটু জপ তপ কর। যদি শান্তি পেতে চাও, তাঁর চরণে সব সঁপে দাও, তোমার ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সব তাঁকে অর্পণ কর। তাঁকে বকলমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভজনা কর, মনে কপটবুদ্ধি রেখ না। যদি তাঁর সঙ্গে পাটোয়ারি না কর, তা'হলে তিনি তোমার ভার নেবেন

ভগবান ব্যাস ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে হয়েছিলেন, নারদ ঋষি দাসীপুত্র, ঋষি সত্যকাম বেশ্যাপুত্র—এ রকম কত ঋষি-মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা নীচ ঘরে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু লোকপূজ্য হয়ে আছেন। এর দ্বারা এই বুঝা গেল যে, ভগবানের রাজ্যে উচ্চ-নীচ নেই; আর তিনি 'জন্ম' দেখেন না, 'কর্ম্ম' দেখেন। এইসব যে জন্ম-ভেদ, জাতি-ভেদ—এ মানুষের মনগড়া; এর কোন মূল্য নেই। ধর্ম্মক্ষেত্রে ও-সব চলে না, সবাই সমান।

কর্ম্মফল ভুগতেই হবে, তা তুমি জান আর নাই জান। যেমন আগুনে হাত দিলে পুড়বেই পুড়বে, তা তুমি জেনেই দাও আর না জেনেই দাও, ঠিক তেমনি। যে বুদ্ধিমান, সে এ তত্ত্ব জেনে এমন কর্ম্ম করে না যাতে শেষে দুঃখ পেতে হবে। গীতায় আছে—'কর্ম্মের গতি বড় জটিল।' এ কথা খুব সত্য। দেখ না, যে কর্ম্মটা এখন তুমি ভাল বলে মনে করছ, সেটায় হয়তো কালে কুফল হবে। সেজন্য খুব বিচার করে কাজ করতে হয়। বিচার করে করলে যে ভুল হয় না এমন নয়—ভুল হয়, তবে কম ভুল হয়। যারা বিচার করে কাজ করে না, তাদের বেশী ভুল হয়, আর সেজন্য দুঃখও বেশী ভোগে।

পতিত, পাপী কেউ নেই, কর্ম্মই হচ্ছে দোষী। মন্দ কর্ম্ম ত্যাগ করে ভাল কর্ম্ম করলেই মানুষ সৎ হয়ে যায়। রত্নাকর দস্যু ছিল, সে-ভাব ত্যাগ করে সাধন করলে—ঋষি হয়ে গেল। তাই মানুষকে ঘৃণা করা অন্যায়, তার কর্ম্মকে ঘৃণা করতে পার।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়। দু-চারটে ভক্তির কথা বললেই বা দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললেই ভক্ত হয়ে যায় না। ভক্ত সেই যার মধ্যে তাঁর প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হয়েছে। মানুষের যখন ভক্তি হয় তখন সে দেবতা হয়ে যায়; হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার—এসব তার কিছুই থাকে না। বেশীর ভাগ দেখি—মুখে ভক্তগিরি জানায়, এ দিকে অন্তরে গরল—দ্বেষ, হিংসা, অভিমান ভর্ত্তি। আবার দেখবে খুব নম্রস্বভাব, 'বানিয়ে বানিয়ে' (বিনিয়ে বিনিয়ে) কথা বলে, ব্রাহ্মণদের দান করছে, সাধু খাওয়াচ্ছে কিন্তু ওদিকে বিধবাকে ফাঁকি দেয়, আপন ভায়ের সর্ব্বনাশ করে, সামান্য টাকার জন্যে লোকের মহা হানি পৌঁছায় (করে)। দেখ মায়ার খেলা! যে ভক্ত সে কখনও এমন কাজ করতে পারে না। তোমরা সব 'ভক্ত' 'ভক্ত' বল; আরে ভক্ত কি গাছে ফলে? এই যত সব ভক্ত সাজে, এদের মধ্যে খুব কমেরই ভক্তি আছে। বেশী দিলেই কি বড় ভক্ত হয় রে? তোমাদের সেই ভাবই দেখছি। তোমাদেরই বা দোষ কি? অন্তরটা ত দেখতে পাওনা যে জানতে পারবে।

নিষ্কাম দানে দাতা কোন আশা না রেখে দান করে। যীশুখৃষ্ট বলেছেন—তোমার ডান হাত যে দান করবে, তার কথা যেন

তোমার বাঁ হাত জানতে না পারে। এত অপ্রকাশ রাখতে বলেছেন। কিন্তু তা কটা লোক করে? এক পয়সা দিলে 'সাতগাঁও' জানিয়ে দেয়, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেয়—'এত দান করেছে।' দেখ অহঙ্কারের ব্যাপার!

ভালর সময় আমি আর মন্দর সময় তুমি—এই ত দেখছি জীবের ধর্ম্ম। হাজার ভাল কর, যদি একটু মন্দ হয়েছে তো আর তোমার নিস্তার নেই—তুমি মন্দ হয়ে যাবে। যাঁরা বিবেকী পুরুষ, তাঁরা জীবের এ 'ধর্ম্ম' জানেন, আর তাই তাদের কথায় কান না দিয়ে কর্ত্তব্য করে যান।

যার বাপ-মা খেতে পায় না, সে আবার ধর্ম্ম করবে কি? সাধু হতে এসেছে—এদিকে বাপ-মা খেতে পায় না। যেখানে উপযুক্ত ছেলে থাকতে বাপ-মার খাবার কষ্ট হয়, সেখানে ধর্ম্ম হতে পারে না। সেখানে ধর্ম্ম হবে কি করে? যাঁকে ডাকতে যাচ্ছে তাঁরই হুকুম হচ্ছে —'বাপ-মার সেবা করবে, খাওয়া-পরায় কখন কষ্ট দেবে না।' বাপ-মাকে খাওয়া-পরার কষ্ট দিলে বা মনে কষ্ট দিয়ে কথা বললে তিনি রুষ্ট হন। তিনি অবতার হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—বাপ-মার সেবা করতে হয়, তাঁদের কষ্ট দিতে নেই। কত দুঃখ স্বীকার করে তবে এত বড় করেছেন, আর এখন নিমকহারামি করছে। দেখ, কি হীন বুদ্ধি! যাঁদের দয়ায় জগৎ দেখলে, মানুষের মত হল, তাঁদেরই দুঃখ দিচ্ছে। আবার ধর্ম্ম করতে এসেছে! এমন লোকের ধর্ম্ম কোন কালেই হবে না।

এ সংসারে ভাই, বোন, বাপ, ছেলে—এদের কারো সম্বন্ধ নেই। যে যার কর্ম্ম নিয়ে জন্মায় আর তার ভোগ মিটলে চলে যায়। কারো কর্ম্মের জন্য কেউ দায়ী নয়। যদি কেউ মনে করে—'আমি স্ত্রী-পুত্রের জন্য জাল-জুয়াচুরি করছি, আর তাই করে তাদের প্রতিপালন করছি, তারা আমার পাপের ভাগী কেন হবে না? তা সে ভুল করবে। দেখ না রত্নাকর দস্যু-বৃত্তি করে সংসার চালাতো। যখন নারদ ঋষি তাকে বললে—'তোমার পাপের ভাগী কেউ হবে না,' সে তখন বললে, 'কেন, আমার বাপ-মা এরা সবাই হবে; তারা আমার অন্ন খায়।' নারদ ঋষি বললে—'যাও পুছে (জিজ্ঞেস করে) এস।' যখন সে সবাইকে পুছলে, কেউ স্বীকার পেলে না। সকলেই বললে—'তা আমরা কি জানি তুমি কি করে প্রতিপালন কর! আর আমরা তো তোমায় ও কাজ করতে বলি নি। আমরা তোমার পাপের ভাগী কেন হতে যাব?' বুঝ ব্যাপার! তখন রত্নাকরের জ্ঞান হয়ে গেল—এ সংসারে কেউ কারো নয়; যে যার নিজেরই কর্ম্ম ভোগ করে। আর সব ত্যাগ করে সে কঠোর তপস্যা করতে লাগলো, রাম-নামে সমাধি হয়ে গেল, সব মলিনভাব চলে গিয়ে তাঁর (ভগবানের) দর্শন পেল, ধন্য হয়ে গেল। সেই রত্নাকরই বাল্মীকি ঋষি। এখন সবাই তাকে মানে—পূজা করে। এমন অতুলনীয় রামায়ণ লিখলে; অমনটি আর দেখা যায় না।

তুমি বড় লোক হয়েছ তো—দিয়ে যাও। আবার পরের শরীরে পাবে। দুঃখীর দুঃখ দূর করাই হচ্ছে অর্থের সদ্ব্যয় করা। আর যথার্থ ধর্ম্ম করতে চাও তো ও অর্থ-কড়ির সম্বন্ধ সব ছাড়তে হবে।

হাবীর মূর্তি

# শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস

রাম সভার মধ্যে হনুমানকে মুক্তার মালা উপহার দিলেন। হনুমান মালাটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে এক একটা দানা দাঁত দিয়ে কাটতে লাগলো আবার তার ভিতরটা দেখে ফেলে দিতে লাগলো। লক্ষণ তাই দেখে রেগে গিয়ে বললেন—'বাঁদর কিনা, মুক্তার মর্ম্ম কি জানে? অমন ভাল মুক্তার মালা দাঁত দিয়ে কেটে নষ্ট করলে।' রাম বললেন—'ওকে জিজ্ঞেস কর, কেন অমন করলে।' হনুমানকে জিজ্ঞেস করায় বললে—'দেখছিলাম এর মধ্যে রাম আছেন কিনা!' তখন লক্ষ্মণ চটে গিয়ে বললে—'তুমি যে বলছ ওর মধ্যে রাম আছেন কিনা দেখছি, তোমার মধ্যে কি রাম আছেন? রাম তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে উপহার দিলেন, তুমি বাঁদর কিনা, তাই সেটা বুঝলে না—দাঁত দিয়ে কেটে ফেললে।' এই কথা শুনে হনুমান নখ দিয়ে বুক চিরে দেখিয়ে দিলেন—রাম-সীতা রয়েছেন। লক্ষ্মণের মহাশিক্ষা—যাতে রাম-সীতা নেই তা বৃথা।

ভগবান বিদুরের ভক্তিতে বাধ্য হয়ে রাজ-অন্ন ত্যাগ করে শাকান্ন গ্রহণ করলেন—রাজভোগের দিকে একবার দৃষ্টিও করলেন না। ভগবান শুধু ভক্তি চান—আর কিছুই চান না। তাঁকে কায়মনোবাক্যে ডাকলেই তিনি প্রসন্ন হন—দর্শন দেন।

ঠিক ঠিক ডাকলে ভগবান বুঝিয়ে দেন—সংশয় রাখেন না।

পরমহংসদেব চৈতন্যদেবের আসনে বসেছিলেন। ভগবানদাস বাবাজীর সংশয় হল। একদিন পরমহংসদেব হৃদেকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানদাস বাবাজীর কাছে উপস্থিত। হৃদে কথা কইতে লাগলো আর উনি বেড়াতে লাগলেন। বাবাজী জিজ্ঞেস করলেন—উনি কে? হৃদে বললে, 'পরমহংসদেব—দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, যিনি চৈতন্যদেবের আসনে বসেছিলেন।' বাবাজী দেখে বললেন—'হাঁ, ওঁরি ত আসন; ওঁর বসবার অধিকার আছে।'

কোন গুরু-ভায়ের বাপ একদিন দক্ষিণেশ্বর এসে তার (গুরু-ভায়ের) কাছে ঠাকুরের নিন্দা করছিল। সে তা সহ্য করতে না পেরে বললে—'তবে রে, এখান থেকে এখনই চলে যা।' তার বাবা তখনই চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে তাকে বললে—'তোর গুরুভক্তি দেখে ধন্য হলাম।' এই বলে ছেলেকে খুব আশীর্ব্বাদ করলে। প্রত্যক্ষ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার কি গুরু-ভক্তি! ঠাকুর বলতেন—'গুরু-নিন্দা না শুনিবে কানে।' যদি সামর্থ্য থাকে তা হলে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেবে, আর তা না পারলে সেখান হতে উঠে যাবে। গুরু-নিন্দা-শ্রবণ নিষেধ, আর গুরুনিন্দা করাও নিষেধ।

ঠাকুর যেসব কথা বলেছিলেন তা সবই ঠিক ঠিক ফলে যাচ্ছে। একদিন ঠাকুরকে তাঁর একখানা ফটো দেখাচ্ছিল। ঠাকুর সেই ফটোটা দেখে বললেন—'এ একদিন ঘরে ঘরে পূজো হবে।' তা ঠিক তাই-ই হলো, দেখতেই ত পাচ্ছো। আর স্বামীজীকে বলেছিলেন—'তোকে আমার অনেক কাজ করতে হবে।' আবার বলেছিলেন—

'আমার সব এমন ভক্ত আছে, যাদের ভাষা আমি জানিনে।' তা এসব ঠিক, একটাও ভুল না। এই দেখেও যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস না হয়—তার নাম কর্ম্মফল।

সধবা স্ত্রীলোকের আর অন্য কর্ম্ম কি? তার কল্যাণের জন্য স্বামীর সেবা করবে। স্বামীকে না মানলে দুঃখ পাবে। স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা। তাঁকে ভগবান-জ্ঞানে সেবা করলে কল্যাণ হবেই হবে, এমন কি জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়ে যায়। মহাভারতে আছে—কোন ব্রাহ্মণী একান্তমনে স্বামী-সেবা করেই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সে তাঁর স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতো, স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানতো না। স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান—স্বামিসেবাতে দিনরাত বিভোর থাকতো। আর একনিষ্ঠ হয়ে স্বামিসেবা করতে করতেই তাঁর জ্ঞান হয়েছিল।

যে ভগবানের নামে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, সে ভাগ্যবান। তাঁর প্রতি বিশ্বাস হওয়া কঠিন, কারণ তিনি অপ্রত্যক্ষ। সাধন করতে করতে তিনি প্রত্যক্ষ হন। সে সব তাঁর দয়া। যিনি অপ্রত্যক্ষ তাঁর আশায় সারা-জীবন কাটান, এ কি কম কথা? কতখানি নিঃসংশয় হলে তবে এ সম্ভব হয়!

গিরিশ বাবু বলতেন—"ভগবানকে ভয় করি না, কিন্তু ছেঁচড়া ভক্তদের ভয় করি। ওরা কিছু বুঝবে না, অথচ হাঙ্গামা করবে। ভগবান আমার বিষয় সব জানেন—তাঁর অগোচর কিছুই নাই। তাঁর

আশ্রয়ে আছি, তাঁকে ভয় করলে কি চলে?" এ খুব ঠিক কথা; ভগবানকে ভয় করলে তাঁকে ভালবাসা যায় না। যেখানে ভয়, সেখানে ভালবাসা (প্রেম) নেই।

## ভগবৎ-কৃপা

ধর্ম্ম তার নিকট খুব সোজা, যাকে ভগবান কৃপা করেছেন। কিন্তু যে তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত, তার নিকট আবার সেই ধর্ম্মই বড় কঠিন। ভগবানের কৃপা চাই, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না।

ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—এ সব হল তপস্যার অঙ্গ। ধর্ম্ম-লাভ করতে হলে এ সব সাধন করতে হয়। মনকে বিষয়-শূন্য করতে হলে ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা থাকা চাই। তা না হলে হয় না। মন বিষয়-শূন্য না হলে ধর্ম্মলাভ হয় না। তাঁকে প্রাণভরে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—তা হলে তাঁর দয়ায় সব হয়ে যাবে। তিনি মনকে ঠিক করে দেবেন আর নিজেও প্রকাশিত হবেন।

মৃত্যু না হলে বিশ্বাস নাই। কারণ, এ মায়ার রাজ্য। কখন কি মায়া চেলে দেবে তা কে জানে! তুমি হয়তো ভাবছ সদ্ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবে, কিন্তু মধ্যে থেকে হয়তো মায়া এমনি ভেল্কি লাগিয়ে দেবে যে, তুমি বুঝতেই পারবে না—কখন অসৎ ভাব এল! মায়ার শক্তির পার নাই—অসৎকে সৎ করছে, আর সৎকে অসৎ

করছে। কেউ জোর করে বলতে পারে না—আমি সদ্‌ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবই। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন—'যে আমার শরণ নেবে, তাকে আমি এই মায়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেব।' তিনি সর্ব্বশক্তিমান—তাঁর মায়া, তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন। যে তাঁর দয়ায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক সদ্‌ভাবে থাকতে পারলে, সে তরে গেল। তাঁর দয়া চাই-ই, তা না হলে হয় না। মৃত্যুর পর প্রকৃতিতে অবস্থান—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই বিশ্বাস করে।

ভগবান যাকে ভালবাসেন, জীব ত তাকে ভালবাসবেই। তিনি যার প্রতি বিরূপ হন, তার প্রতি সকলেই বিরূপ হয়। সব সংসার তাঁর ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবার কারো শক্তি নেই।

তুমি সাধু—ভগবানের নাম কর, তাঁর জন্য সব ঐহিক সুখ ত্যাগ করেছ, তাই লোকে তোমায় খেতে দেয়, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। আর তুমি যদি ভগবানের নাম না কর, সাচ্চা সাধু না হও, তা হলে তোমায় ভুগতে হবে। সাধু হয়ে যে ঠকায়—তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। দেখ, এমনি মহামায়ার খেলা যে, উদ্দেশ্য সব ভুল হয়ে যায়! সাধু হল—কোথায় সে সাধনভজন করবে, ভগবানের নামে ডুবে যাবে—না, ঠকান-বুদ্ধি শুরু করে দিলে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরুল, তা সব ভুলে গেল। এমনি মায়ার প্রভাব! তাঁর কাছে তাই প্রার্থনা করতে হয়—'হে ভগবান, যেন তোমার মায়া আমায় মুগ্ধ না করে।' তিনি গীতায় বলেছেন, 'আমার মায়ার হাতে কারো নিস্তার নেই, তবে, যে আমার শরণ নেবে, সে বেঁচে যাবে; আমি তাকে আমার

কালী খ্রীষ্টানের লেকচার, পরশু কৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজকের বক্তৃতা—লোকে আর ধরে না। আবার শশধর তর্ক-চূড়ামণির শাস্ত্র-ব্যাখ্যা; বুথ সাহেব, অলকট সাহেব—এ রকম কত যে সে সময় এসেছিলেন, কত যে সভা, বক্তৃতা হতো তার আর ইতি নাই। ছেলে, বুড়ো, যুবা সকলের মধ্যেই ধর্ম্ম নিয়ে কথাবার্ত্তা, তর্ক-ঝগড়া—বাড়ীতে, আফিসে, রাস্তায় সে এক ব্যাপার চলেছিল। সে ধর্ম্মের বন্যায় সব দিক ভাসিয়ে দিলে। সে যে কি ব্যাপার তা তোমাদের কি করে বুঝাব? কিন্তু দেখ, ভগবানের চক্র। সে সব দলটল কোথায় সব মিলিয়ে যাচ্ছে; আর তাদের তেমন জোর দেখা যাচ্ছে না। আর পরমহংসদেবের দল—যাদের তখন কেউ জানতই না, এখন একেবারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে। স্বামীজীর এক লেকচারে (চিকাগো ধর্ম্মসভায়) পরমহংসদেবের কথা জগতের সব লোক জানতে পেরে গেল। দেখ ব্যাপার! ভগবানের ধর্ম্ম-চক্র কোন্‌দিকে ঘুরে গেল। যা কেউ কখন ভাবেও নি—তাই হয়ে গেল।

অবতার হয়ে জগতে আসা—জীবের উপর ভগবানের বিশেষ দয়া বৈ কি। অবতার হয়ে এ জগতে এসে নিজের ধর্ম্মরূপ প্রকাশ করলেন—একি তাঁর কম দয়ার কথা? লোকে 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' করে খুঁজে বেড়ায় কিন্তু পায় না। কত কষ্ট করে তাঁকে পাবার জন্য; আর সেই ঈশ্বর মানুষরূপে আসেন, আর লোকে তাঁকে ভক্তি, পূজা করবার অবসর পায়। একি তাঁর কম দয়া!

একদিন গিরিশ বাবুর কাছে গেছি—তিনি তখন বসে ছিলেন। আমি যেতেই বলে উঠলেন—'লাটু ভাই, প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি ঐ—

ঐ যেন ঐ গাছতলায় বসে রয়েছেন। ঠাকুর ঐ যে বসে রয়েছেন।' শেষজীবনে গিরিশ বাবু রামকৃষ্ণময় হয়ে গিছলেন। বুঝ ব্যাপার! অমন জীবন, তাঁর দয়ায় কি পরিবর্ত্তন হল!

## সদ্‌গুরু-কৃপা

সদ্‌গুরুর কথা অমান্য করতে নেই, অমান্য করলে মহা অকল্যাণ হয়। সদ্‌গুরু কে?—যিনি ভগবানলাভ করেছেন। হরে, পেলা নয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় পিতৃ-শক্তি পায়, চন্দ্র-শক্তি পায়, শেষে সূর্য্য-শক্তি পায়। যেমন ভীষ্মদেব সূর্য্য-শক্তি পেয়েছিলেন।

গুরু কি যে-সে হতে পারে? যিনি ভগবানলাভ করেছেন তিনিই গুরু হতে পারেন। গুরু শিষ্যের ভাব দেখে শিক্ষা দেন, ভাবভঙ্গ করেন না। গুরু শিষ্যের ভাব আরো বাড়িয়ে দেন, যাতে শিষ্যের উন্নতি হবে তাই করেন। এমন কোন কথা বলেন না, যাতে শিষ্যের ভাবের হানি হয়—সংশয় হয়। শিষ্যের ভাবের হানি করলে, তার ক্ষতি হয়—উন্নতি করতে পারে না। এমন গুরু দুর্লভ।

রাম বাবুকে ঠাকুর বলতেন—"রাম, এ সংসার (অর্থাৎ রাম বাবুর সংসার) আমার, তোমার নয়।" রাম বাবুর প্রতি তাঁর অহেতুক দয়া।

গুরু যা ইচ্ছা তাই শিষ্যকে বলতে পারেন। তিনি জানেন শিষ্যের

কিসে কল্যাণ হবে। শিষ্য তাঁর আদেশ পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। শিষ্য গুরুর উপর কখনও সংশয় আনবে না। গুরুতে সংশয় হলে কখনও উন্নতি হয় না। এইজন্যে যাকে-তাকে গুরু করা চলে না—খুব বিচার করে তবে গুরু করতে হয়। যে গুরুর নিজেরই কল্যাণ হয় নি, সে শিষ্যের কল্যাণ কি করে করবে? গুরুও অন্ধ, শিষ্যও অন্ধ—এ স্থলে দু'জনারই মনে ঘোর সংশয়, দু'জনারই পতন হয়, উন্নতি করতে পারে না। তাই ঠাকুর বলতেন—'গুরু যাচাই করে নিবি, বাজিয়ে নিবি।' আবার বলতেন—'গুরু যেমন শিষ্যকে দিনে রাতে দেখবে, শিষ্যও তেমনি গুরুকে দিনে রাতে দেখবে।'

হিংসা, দ্বেষ লেগেই আছে। একসঙ্গে থাকলেই হিংসা, দ্বেষ করবে—এমনি মানুষের বদ্‌স্বভাব। গুরুকৃপায় সে স্বভাব দূর হলে তবে ধর্ম্মপথে মানুষ এগোতে পারে। গুরুর দয়া ভিন্ন গতি নাই। গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্, গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন, কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারেন। সদ্‌গুরু 'প্রাণে' মন্ত্র দেন, আর অন্য গুরু 'কানে' মন্ত্র দেন। সদ্‌গুরুলাভ মহা ভাগ্যবানেরই হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় ইষ্ট-লাভ হয়—প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য এসব তো হয়ই। অবধূতের চব্বিশ গুরু ছিল—সে-সব শিক্ষাগুরু। বক, ব্যাধ, ভ্রমর—এইসব। বক যেমন স্থির নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে, নজর আছে মাছের দিকে, মাছ যেমনি কাছে আসে অমনি ধরে ফেলে—ঠিক তেমনি সাধক ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির

রাখবে, অন্যমনা হবে না। এই রকম ব্যাধের বিষয়েও শিক্ষা আছে। আর ভ্রমর যেমন ফুল ছাড়া আর কোথাও বসে না, ফুলের মধু ছাড়া খায় না, সাধক ঠিক তেমনি ভগবান ছাড়া আর কিছু চিন্তা করবে না, তাঁর আলোচনা করবে, তাঁর কাজ করবে—তা ছাড়া আর সব ত্যাগ করবে। এইরকম যে বিবেকী পুরুষ সে এইসব জীব-জন্তু থেকেও শিক্ষালাভ করে। সকলের কাছেই কিছু-না-কিছু শিক্ষালাভ আমরা করতে পারি।

## অহঙ্কার ও সংশয়

ধর্ম্ম-টর্ম্ম আর ত কিছু নয়—'হিংসা' ( অহং ) যাবার জন্য। মানুষ অহঙ্কারের জন্য বুঝতে পারে না—ভগবান কি জিনিস। অর্জ্জুন অত বড় ভক্ত ও বীর, শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকেও তাঁর উপর সংশয় হয়েছিল। তা জীবের কা কথা! শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করিয়ে সংশয় দূর করে নিলেন।

পরশুরাম বলতেন—'আমি ভগবান, আমার উপর কেউ নেই।' ভগবান রামচন্দ্র শরীরধারণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর উপরও ভগবান আছেন। অহঙ্কার করো না, তাঁর কাছে ওসব টিকবে না। তিনি কারো দর্প সহ্য করেন না, তাই তাঁর নাম—দর্পহারী মধুসূদন।

কত সংশয় যে ধর্ম্ম-পথে আসে, তার ইতি করা মুশকিল। কত কষ্টে একটু বিশ্বাস হয়েছে, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটে গেল যে, বিশ্বাস টলে গেল। দেখ ব্যাপার! এমন সব ধর্ম্মী আছে, যাদের কাছে গেলে বিশ্বাস টলিয়ে দেয়। তোমার কত মেহনত করে একটু

বিশ্বাস হয়েছে ; সৎ-ধর্ম্মী ভেবে তাদের কাছে যদি যাও—এমনি ঝাং ঝাড়বে যে তোমার সংশয় আনিয়ে দেবে। দেখ আপদ! যারা সাচ্চা তারা কখনও এমন কাজ করে না ; তারা তোমার যাতে আরো বিশ্বাস হয়, এমন কথা বলবে।

ঝট্ করে একজনকে দোষী মনে করা ভুল। কারণ, সে দোষী নাও হতে পারে। যদি দোষী হয়তো বাঁচোয়া, কিন্তু নির্দ্দোষ হলে বাঁচোয়া নেই। তার নির্দ্দোষ মনে দুঃখ দিলে ভুগতে হবেই। বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া তক্ কারো উপর সংশয় করতে নেই। সংশয় বড় খারাপ, ওতে বিচ্ছেদ আনে। তাই বলি—আগে দেখ কার দোষ, তারপর দোষী ঠিক করো।

তোদের মনের ভাব হচ্ছে—'লোকে আমায় দেখুক।' একটু ভক্তি করেছিস—অমনি মনে হয়েছে, 'লোকে আমায় দেখুক।' তোদের কি দেখবে? তোরা কি বিবেকানন্দ স্বামী হয়েছিস? সেই অগাধ ভক্তি, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিস যে, তোদের দেখবে? একটু ভক্তি, একটু ধ্যান করেই তোদের 'অহং' এসে পড়ে।

## সৎসঙ্গ

সাধুসঙ্গ করতে করতে পরে বাসনা যায়, মন শুদ্ধ হয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা আর সাধুসঙ্গ করা একই কথা, সমান ফল হয়—যদি ধারণার ক্ষমতা থাকে। যার ধারণা-শক্তি নাই, সে সাধুসঙ্গই করুক, আর সদ্‌গ্রন্থই পড়ুক—কিছুই হয় না। তবে সাধুসঙ্গ কখন বৃথা যাবার নয়, কালে তার কল্যাণ হবেই। ধারণা কেন হয় না?—হীন-বীর্য্য বলে। মহা অসংযমী—ধারণা করবে কি করে? ব্রহ্মচর্য্য চাই। যার ব্রহ্মচর্য্য নেই, যে সংযমী নয়—তার ধারণা-শক্তি হয় না।

সাধুসঙ্গ করার ফল অনেক। সাধুসঙ্গ করতে করতে মনের উন্নতি হয়—তাঁকে বুঝতে পারা যায়, সকল কাজ সোজা হয়ে যায়। যুধিষ্ঠির মহারাজ সৎসঙ্গ পেয়েছিলেন, তাই ইহকালে ও পরকালে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

সাধুসঙ্গ ছাড়া অন্য উপায় নাই। সংসারের ঝঞ্ঝাটে রাতদিন পড়ে আছে, মনে কেবল বদ্‌-মতলব, ফন্দি, জালজুয়াচুরি; এ মন দিয়ে কি করে তাঁর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস করবে? সংশয় ত আসবেই। সাধুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস—এ মনের ধর্ম্ম। সাধুসঙ্গ কর, তাঁদের উপদেশ পালন করতে চেষ্টা কর—ক্রমে মন শুদ্ধ হবে, সংশয়শূন্য হবে। কর্ম্ম করতে হয়; কর্ম্ম না করলে কি হয়? তোমরা কর্ম্ম করবে না, ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্মলাভ করতে চাও। আরে তা কি হয় রে? সাধুসঙ্গ করতে করতে ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস না হলে ধর্ম্ম বুঝা যায় না।

যাবৎ বাঁচো তাবৎ সাধুসঙ্গ কর। যে সৎ হতে চায়, তার সাধুসঙ্গ করা উচিত। সাধু কে? চিনবে কি করে? যার মনে হিংসা (অহঙ্কার) নাই, যে তাঁর চিন্তায় ডুবে আছে, আর কিছুই জানে না, রেষারেষি ও দ্বেষাদ্বেষী ভাব যার নেই, শান্ত ও সমদর্শী, সেই সাধু। আর যার ভগবানলাভ হয়েছে তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ।

'ভেক' কেন ধারণ করে জান?—মনে পবিত্র ভাব আনে বলে। যারা শুদ্ধ, বৈরাগ্যবান—তাদের এই ভেক (গেরুয়া) পরলে মনে ত্যাগের বিকাশ হয়। কোন কু-কর্ম্ম করতে গেলে ভেক অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয়, মনে হয়ে যায়—আমি যে সাধু এ কি কচ্ছি? যে সৎ, পবিত্র তার মনে ভেক সাধু-ভাব জাগিয়ে রেখে দেয়, তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ বা চিন্তা হতে পারে না। এরূপ কোন অসৎ-ভাব মনে এলেই খেয়াল হয়ে যায় 'এই আমি যে সাধু।' তবে কি জান—মনের সঙ্গে ভেকের কোন সম্বন্ধ নেই। মনেই সাধু, অসাধু সব। যে মনেতে ঠিক ঠিক সাধু আছে, সে যদি ভেকধারণ নাও করে তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। মনে যে সাধু নয়, বাইরে সাধুর ভেক তার বৃথা। যে মনে অসাধু, বাইরে সাধুর ভেক পরেছে—সে চোর, তার কোন কালে কল্যাণ হবে না।

সাধুর কাছে, গুরুর কাছে সরলভাব দেখাবে, কপটতা করবে না। সেখানে কপটতা করলে মহা অকল্যাণ হয়। সরল লোককে তাঁরা ভালবাসেন, আশীর্ব্বাদ করেন।

সৎসঙ্গের প্রভাব এমনি যে, মানুষকে মুক্ত করে দেয়। এতে আর কোন ভুল নেই। সৎসঙ্গ করা খুব দরকার। এক মুহূর্ত্ত মাত্র সৎসঙ্গ করলে ভবসমুদ্র পার হবার উপায় হয়ে যায়। বুঝ ব্যাপার! সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সময় করে নিয়ে সৎসঙ্গ করা উচিত; তাতে কল্যাণই হয়ে থাকে। কিন্তু এমনি মায়ামুগ্ধ তোরা—সংসার-কীট, সব কাজের সময় পাস্, কেবল ঐ সৎ-কাজের বেলায় সময় হয়ে উঠে না। থিয়েটার দেখে স্ফূর্ত্তি করে সময় কাটাচ্ছে তার বেলা বেশ সময় পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু একটু সৎসঙ্গ করবে, বা একটু সদ্বিষয় নিয়ে স্ফূর্ত্তি করবে —তার আর সময় হয় না। যেমন তোমাদের বুদ্ধি—মতি-গতি, তেমনি লাভ হবে, পরে দুঃখভোগ করতে হবে।

সাধুসঙ্গ না করলে ধর্ম্ম যে কি জিনিস তা বুঝা যায় না। হাজার বই পড, কিছুতেই হবে না। ভগবান বলেছেন—"বেদপাঠ না করলেও, ব্রত-তপস্যা না করলেও কেবল সাধুসঙ্গ করলেই ভগবান-লাভ হবে।" সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা সব শাস্ত্রেই আছে।

সাধু কি কেবল রোজ রোজ তোমার মনের ময়লা সাফ (পরিষ্কার) করবে? সাধু কি তোমার মেথর আছে? একবার করে দিল, তারপর তুমি চেষ্টা করে সাফ রাখ। তোমার যদি নিজের চেষ্টা না থাকে, তা হলে সাধু কি করতে পারে?

বৈষ্ণবদের বড় ভেদ-বুদ্ধি! তুলসীগাছকে পূজা করে, প্রণাম করে, কিন্তু বেলগাছকে পূজা করে না। আরে তোদের ঠাকুর কি

কেবল তুলসীগাছেই আছে, আর বেলগাছে নেই? তোদের ঠাকুরকে তোরা বড় করতে গিয়ে ছোট করে ফেলছিস্; তোদের মন্দ বুদ্ধির দোষে ভগবানের এই দশা হয়েছে। যে ঠাকুর তুলসীগাছে আছে আর বেলগাছে নেই—সে ঠাকুর আমি মানি না। আমার ঠাকুর সর্ব্বত্র আছে—তুলসীগাছেও আছে, আর বেলগাছেও আছে। সৎসঙ্গ না করার দরুণ এমন হীন বুদ্ধি হয়েছে—উদার ভাব নেই।

## ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

সংসারী লোক গীতা বুঝতে পারে না; কারণ, ত্যাগ না থাকলে গীতার মর্ম্ম বুঝা যায় না। তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—দশবার গীতা গীতা বললে যা হয়, গীতা পড়লেও তাই ফল হয়। সাধন না থাকলে গীতার মর্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। আর সাধন না করলে ত্যাগের ভাব মনে ঠিক ঠিক বসবে কেন? গীতা কি বলছে?—ত্যাগ, ত্যাগ, অন্তরে-বাহিরে ত্যাগ। ব্রহ্মচর্য্যপালন না করলে, সাধন না করলে—এ ভাব ধারণা হয় না। 'গীতা, গীতা—ত্যাগী, ত্যাগী' এই চিন্তা কর, তা হলেই গীতার মর্ম্ম তোমার কাছে প্রকাশিত হবে।

যেখান থেকে সব সাপ্লাই ( সরবরাহ ) হচ্ছে, সেইখানে ধর। শহরময় গ্যাসের আলো, কিন্তু সাপ্লাই হচ্ছে এক জায়গা থেকে। যেখান থেকে সব শক্তি সাপ্লাই হচ্ছে, সেইখানে ধর—তোমার সব হয়ে যাবে।

আমার 'দৃষ্টিতে' মায়ার 'সৃষ্টি'। এই মায়াতে লোক মুগ্ধ

হয়—'আমার' মায়া এত মিষ্টি। 'আমি' যে আরো কত মিষ্টি তা জীব বুঝতে পারে না। "হে অর্জ্জুন, আমায় ভুল না; না ভুললে মায়া তোমায় কিছু করতে পারবে না।" মায়ার ধর্ম্ম দেখ! কত প্রকাণ্ড সরোবর সৃষ্টি করলে—পাখী-পক্ষী নানারকম! দেখে মনে হল সব সত্য, কিন্তু কিছুই নয়। জীবের মায়ার হাতে নিস্তার নেই। তবে, যে তাঁর শরণ নেয়, তাকে তিনি ( ভগবান ) বাঁচিয়ে দেন। তিনি যাকে দয়া করেন, সেই কেবল মায়ার হাতে নিস্তার পায়।

মুক্ত পুরুষদের স্থূল শরীর যায়, নষ্ট হয় বটে, কিন্তু শরীর গেলেও তাঁদের শক্তি থাকে, যায় না। এই শক্তি তাঁদের শরীর যাবার পরও জীবের কল্যাণ-সাধন করে।

জলের কি কোন দোষ আছে রে? জল সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়। সঙ্গ-গুণে জল খারাপ হলে তাকে 'রিফাইন' ( পরিষ্কার ) করতে কষ্ট হয়। কিন্তু একবার রিফাইন হলে তখন আবার যে জল সেই জল। তেমনি মানুষ সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়। একবার খারাপ হলে তাকে ভাল করতে কষ্ট হয়। ঐ সঙ্গ-দোষ ছুটে গেলেই সে আবার ভাল মানুষ হয়ে যায়। মানুষ ত ভালই আছে; কেবল সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়।

যতক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি, ততক্ষণ দলাদলি। ভেদ-বুদ্ধি গেলে উপাধি নাশ হয়। উপাধি-নাশে চৈতন্য হয়—তখন জগৎ চৈতন্যময় বোধ হয়; সব নাম-রূপ, মত-পথ সত্য বলে বোধ হয়। এক পরব্রহ্মই সব হয়েছেন—এ বোধ হলে মত-পথে ভেদাভেদ-বুদ্ধি, দ্বেষাদ্বেষী ভাব চলে

যায়। পূর্ণ জ্ঞান হলে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য'—এ ভাব থাকে না; তখন সব সত্য, ব্রহ্মময় দেখে।

ভগবান যেখানে জন্ম নেন, সেখানে কেউ জানতে পারে না। অপর জায়গার লোক জানতে পারে যে, তিনি ভগবান। ঠাকুর বলতেন—'লণ্ঠনের নীচেই অন্ধকার—দূরে আলো।' ঠিক তেমনি, যে ঘরে তিনি ( ভগবান ) জন্ম নেন, যাদের কাছে সদাসর্ব্বদা থাকেন, তারা জানতে পারে না যে, তিনি ভগবান—মানুষ-রূপ ধরে তাদের কাছে রয়েছেন। তিনি যাকে জানিয়ে দেন, সেই জানতে পারে। অপরের সংশয় হয়—'ভগবান যে মানুষ-রূপ ধরে এসেছেন, আর তিনিই যে সেই' একথা বিশ্বাস করতে পারে না। ভগবানের মায়া দেখ!

'আমিই বিষ্ণু, বিষ্ণুর সন্তান'—পবিত্র জীবন আমার, 'আমি খেলি ( লীলা করি ), আমার শক্তি খেলে,' এসব পবিত্র হলে বুঝতে পারবে। ভগবান পবিত্রতা চান; হনুমান, শুকদেব—এঁরা সব মহাপবিত্র। এঁরা ভগবান কি জিনিস তা জানতেন; তাই ত পৃথিবীর সব সুখ-ভোগ ত্যাগ করেছিলেন। ভগবানকে জেনে এমন সুখ শান্তি পেয়েছিলেন যে, দুনিয়ার সুখ তুচ্ছ হয়ে গেল, কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

ঈশ্বর খুব কাছে আছেন, কিন্তু তাঁর মায়ার বশীভূত জীব মনে করে অনেক দূরে আছেন। জীবের মায়া তাঁর দয়ায় দূর হলেই সে দেখতে পায় তিনি অতি নিকট—অন্তরাত্মা।

মানুষ যখন ভগবানকে পায়, তখন সে সদাই আনন্দে থাকে—সুখ-দুঃখে চঞ্চল হয় না। হিংসা, দ্বেষ—এসব থাকেই না, তা আর করবে কি করে। যে তাঁকে পেয়েছে, তাকে ভক্তি করবার জন্য লোককে বলতে হয় না; তাদের আপনা হতেই তার প্রতি ভক্তি আসে।

তিনি দ্বন্দ্বের অতীত—ত্রিগুণাতীত। তাঁকে দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে মনকে সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে স্থির রাখতে হয়; তা না হলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি ত্রিগুণাতীত, আবার অসংখ্য গুণে বিভূষিত; ভজনা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে, তাঁকে আর তাঁর অপার মহিমা জানতে পারা যায়।

সাধু-সজ্জন, মহাপুরুষ—এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। এঁদের স্মরণ করলে মানুষ পবিত্র হয়, সৎ হয়। যে যাকে স্মরণ করে, সে তার গুণটা পায়। বদ্ লোককে স্মরণ করলে বদ্ মতলব আসবে; আর সৎ লোককে স্মরণ করলে সৎ বুদ্ধি আসবে—এই হচ্ছে নিয়ম।

সন্ন্যাস নেয় নি তা কি হয়েছে? কর্ম্মই হল প্রধান। যে সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করে—সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যার মন সন্ন্যাসীর মত—সেই ঠিক সন্ন্যাসী। বাইরে কেবল ভেকধারণ করলেই কি সব হয়ে গেল! গেরুয়া—ত্যাগের চিহ্ন। যার ভিতর-বাইর গেরুয়া রঙ্গে রঙ্গেছে—সেই ঠিক ঠিক ত্যাগী, সন্ন্যাসী। যার অন্তরে ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে—বাইরে কোন ভেকধারণ না করলেও কোন ক্ষতি নাই।

ভেক—ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'আমি যে ত্যাগী—সন্ন্যাসী, আমি এমন অসৎ কাজ করতে যাচ্ছি'—এরূপ ভাব এসে আর অসৎ কাজ, শঠতা, প্রবঞ্চনা করতে দেয় না। এইটুকু হল ভেকের উপকার। কিন্তু যার মনে ত্যাগ নেই, সাধুতা নেই, কেবল ভেক-ধারণে তার কিছুই হয় না—সৎ হতে পারে না।

ঠাঁকুরের মনে সন্দেহ হলো—শ্রীচৈতন্য অবতার হলে তাঁর নাম জগৎ-জুড়ে ছড়িয়ে পরবে; কিন্তু তাঁর নাম মাত্র বাংলা আর উড়িষ্যায়! তারপর তিনি (ঠাকুর) দেব-দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন—যেখান থেকে অবতারের উৎপত্তি, সেই 'ঘর' থেকে চৈতন্যদেব বেরিয়ে আসছেন। তখন তাঁর সন্দেহ গেল—শ্রীচৈতন্য যে অবতার এ নিশ্চয় হলো।

বিদুর ভিক্ষার অন্নও ভগবানকে না দিয়ে (অর্পণ না করে) খেতেন না। তাঁর জিনিস, তাঁকে না দিয়ে যে খায়—সে চোর। আর ঐরূপ (অনর্পিত) অন্ন অশুদ্ধ। যা খাবে ভগবানকে অর্পণ করে খাবে। তাঁকে অর্পণ করলে অন্নের দোষ (জাতি-দোষ, আশ্রয়-দোষ আর নিমিত্ত-দোষ) নষ্ট হয়ে যায়—অন্ন পবিত্র হয়।

পুরীতে চৈতন্যদেব মন্দিরে দর্শন করতে ঢুকলেন, আর বেরুলেন না—মিশিয়ে গেলেন। তাই ঠাকুর সেখানে যান নি—পাছে দেহ না থাকে। বলতেন—"গয়া আর পুরীতে কেন যাই না জানিস্? গেলে আর আসতে পারবো না—দেহ থাকবে না।"

ঠাকুর বলতেন, "ভাবতুম—রাসমণি কৈবর্ত্তের মেয়ে, তার এমন বুদ্ধি হলো কোত্থেকে? তারপর দেবদৃষ্টিতে দেখলুম—রাসমণি মা দুর্গার দাসী। তাই তো বলি, এমন বুদ্ধি তা না হলে কোথায় পাবে?"

ঈশ্বরদর্শন হলে—নিঃসংশয় হয়, নিরহঙ্কার হয়, আর খুব প্রীতি প্রেম হয়। তাঁর অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান। তাই মানুষ তাঁকে পেলে তাই-ই হয়ে যায়।

জীব-শক্তি আর অবতারের দৈবী শক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। জীব-শক্তি—ক্ষুদ্র শক্তি, নিজ কল্যাণসাধনেই অসমর্থ। আর অবতার-শক্তি—দৈবী শক্তি, জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ।

যে ঠাকুর একটু মাংস পেলে খুশী হন, একটু মদ পেলে গলে যান—তিনি আবার মুক্তি কি দেবেন? স্বামীজী বলতেন—'আমি অমন ঈশ্বরকে মানি না। মদ-মাংস পেলে খুশী হবে, আর তা না হলে চটে যাবে—তাকে আমি ঈশ্বর বলি না।'

প্রকাশানন্দ দণ্ডী স্বামী; তাঁর খুব নাম—একরূপ কাশীর রাজা ছিলেন। চৈতন্যদেব এলেন। প্রকাশানন্দ বললেন—'নামগান আবার কি? বেদে আছে—সমুদ্রের মত গম্ভীর হবে। নামগান তোমার মাথার ভুল।' চৈতন্যদেব মণিকর্ণিকা থেকে চান্ (স্নান) করে আসছেন, পথে প্রকাশনন্দের সঙ্গে দেখা। দেখিয়ে দিলেন—'তুমি যে জ্যোতিঃ ধ্যান কর, সেই জ্যোতিঃই আমি।' আর যাবে কোথা? প্রকাশানন্দ

পায়ে পড়ে গেলেন। ব্যস্। প্রকাশানন্দ স্বামীকে টেনে নেবার জন্যই তিনি কাশীতে এসেছিলেন। ঠিক ঠিক যারা সাধু, তাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবানকে আসতেই হবে। গীতায় এ কথা আছে।

ভগবানকে ডাকলে শক্তি আসবেই আসবে। তিনি আধার। ভগবান জানেন কার দ্বারা কি কাজ হতে পারে, তাকে সেই কাজ করবার শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। মানুষ মায়ামুগ্ধ —ভাবে তার শক্তিতেই সে এসব কচ্ছে। আরে তা নয়, তিনি অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম্মশক্তি যোগাচ্ছেন। এই যে দেখছ বিশ্বজগৎ—এসব তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে চলছে। মায়া-মুগ্ধ সব কেউ বুঝতে পারছে না যে, তিনিই এ সবের পেছনে আছেন, আর অনন্ত কর্ম্মশক্তি যোগাচ্ছেন। তিনি স্বয়ং যাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছেন, সেই—কেবল সেই তাঁর এই অনন্ত খেলা ধরতে পাচ্ছে। অপরে তাঁর বিশাল মায়ায় মুগ্ধ—অচৈতন্য। কি করে বুঝবে তাঁর এ খেলা?

কর্ম্মফলে কেউ গুরু হয়, আর কেউ শিষ্য হয়। কর্ম্মফলই মানুষকে জোর করে নিয়ে গিয়ে অমন ঘটায়। কারো সাধ্য নেই যে, এ শক্তিকে বাধা দিতে পারে। এই কর্ম্ম-গতিই এক জনকে এক জনের অধীন করেছে, আবার কাউকে স্বাধীন করে দিচ্ছে। গীতায় তাই বলেছেন—'কর্ম্মের গতি জটিল'—বুঝা যায় না। তবে তিনি এই বিশ্বসংসারের মালিক, তিনি ইচ্ছা করলে উল্টেও দিতে পারেন। তিনি কর্ত্তা—তাঁর ইচ্ছামত কর্ম্ম হবে। একি আর মিছে কথা! সত্যি বলছি রে!

সাধনপথে মাছ, মাংস এসব রজোগুণী আহার না করাই ভাল, রিপু প্রবল হয়। সাধক হিংসা ত্যাগ করবে। যার অদ্বৈত-ভাব, হিংসা চলে গেছে, রিপু সব দমন হয়েছে—এমন জ্ঞানীর আহার-বিহার সম্বন্ধে কোন বিধি নেই। তিনি যদি মাছ-মাংস খান, তাতে তাঁর কোন দোষ হয় না, কোনও অনিষ্ট হয় না। দুধ, ঘি, ফল—এ-সব সাত্ত্বিক আহার, খেলে সত্ত্বগুণবৃদ্ধি হয়। সাধকদের এই সব আহারই ভাল।

এত কঠোর করবার কি দরকার? আমাদের গুরুর অমন হুকুম নেই। ভাল খাবে, ভাল পরবে; যা হজম হয় তাই খাবে, আর ভগবানকে ডাকবে। যাঁকে ডাকছো তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সব জানেন। এই যে সব ত্যাগ করেছ, তাঁর জন্য স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছ, তিনি কি এসব বুঝেন না? তিনি সব জানেন। তিনি অন্তরটা দেখেন, উপরটা দেখেন না—তিনি অন্তর্য্যামী।

যে পাগল নয়, তোরা তাকে 'পাগল পাগল' বলে পাগল করে তুলিস। তোদের এ বড় মন্দ বুদ্ধি। স্বামীজী বলত, "মানুষকে নীচ, নীচ বলতে বলতে সে নীচ হয়ে যায়। শক্তিহীন, শক্তিহীন বলতে বলতে শক্তিহীন হয়ে যায়।" বুঝ ব্যাপার! আরও বলত, "যে দুর্ব্বল তাকে শক্তিমান, শক্তিমান বল; দেখবি, সে অচিরাৎ শক্তিমান হয়ে উঠবে। এইরকম যে অসৎ তাকে সৎ সৎ বল, দেখবি সে সৎ হয়ে যাবে"—এসব ঠিক। স্বামীজী কি আর মিথ্যা বলেছে? স্বামীজী

কোন বিষয় ঠিক ঠিক সত্য বলে না বুঝা পর্য্যন্ত মেনে নিত না; এটা তার স্বভাব ছিল।

সকলেই যদি মুক্ত হবে, তা হলে বদ্ধ থাকবে কে? চিরদিন মুক্ত আর বদ্ধ এ দুই-ই জগতে থাকবে। যদি সব মুক্ত হয়ে যায়, তা হলে জগতের তো প্রলয় হয়ে যাবে; সব বদ্ধ হলেও তাই হবে। গীতায় আছে—'দ্বন্দ্ব নিয়েই জগৎ। সাম্য-অবস্থায় প্রলয় হয়ে যায়—সেখানে সৃষ্টি নেই—স্থির।'

এমন এক এক জন জন্মায়—কত শক্তিমান, কত লোককে চালিয়ে নিয়ে যায়! এরা সব 'জন্ম-নেতা'। আবার এমন সব মানুষ আছে, যারা নিজেরাই চলতে পারে না, অন্যের সাহায্য চায়। যারা নেতা হবে, ছোটকাল থেকেই তাদের মধ্যে সে চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম—যে যা হবে, তাকে ছোটকাল থেকেই সেই রকম কর্ম্মপ্রবৃত্তি দেয়। বড় বড় লোকদের জীবন দেখলে এই কথাই বোঝা যায়।

তাঁতে মিশে গেলে সব দুঃখের অবসান হয়—সব সংশয়ের নাশ হয়। কিন্তু সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাধন করতে করতে তাঁর দয়ায় সমাধি হলে, সেই সমাধিযোগে তাঁতে মেশা যায়। তাঁতে অভেদস্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত এ দুঃখ—এ সংশয় যাবার নয়।

খোলা (উন্মুক্ত) জায়গায় ধ্যান করলে মনটা উদার হয়, সঙ্কোচভাব

( সঙ্কীর্ণ ভাব ) থাকে না। সঙ্কোচ-ভাব ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন ডালে ( সৃষ্টি করে )। যেখানে সঙ্কোচ ( সঙ্কীর্ণতা ) সেখানে তাঁর বিকাশ হয় না। তিনি উদার, অনন্ত—তাঁর সেখানে সঙ্কোচ নেই। তাঁর ( ঠাকুরের ) উপদেশ—"সঙ্কোচ-ভাব ত্যাগ কর।"

সন্ন্যাসীর ফুল শুঁকতে নেই—এ কথা কেন বলে জান? ফুল শুঁকলে পাছে ভোগ-প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য। তেমনি রাত্রে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না উঠলে ব্রহ্মচারীর দেখতে নেই বলে! ওর মানে আছে—ভোগ-প্রবৃত্তি জেগে উঠে, মন চঞ্চল করে দেয়, তাই। এতদূর কঠোরতা কোন কোন গুরু অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য সকলেরই ও মত নয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখলে স্রষ্টাকে মনে পড়ে—আরো কত সুন্দর তিনি! তাঁকে দেখবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা প্রবল হয়। আসল কথা—যে যা ভাল বোঝে, আর সবাইকে তাই করতে বলে; এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব; আর 'যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ হয়।'

যতক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি, ততক্ষণ দলাদলি। ভেদ-বুদ্ধির নাশ না হওয়া তক্ ( পর্য্যন্ত ) ও যায় না। জ্ঞান না হলে ভেদ-বুদ্ধি যায় না—পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান হওয়া চাই। ঐ ভেদ-বুদ্ধিই হচ্ছে সবসে সেরা উপাধি। যখন এ উপাধির নাশ হয়, তখন মানুষের চৈতন্য হয়। চৈতন্য হলে জীব, জগৎ সব চৈতন্যময় বোধ হয়; সব নাম, রূপ এক চৈতন্যে লয় হয়ে যায়। তখন আর মত, পথ নিয়ে কে বিবাদ করবে? দ্যাখে সব সত্য—জীব, জগৎ যা কিছু, সব সেই এক পরম ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। সব সত্য। তবে যে বলে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য' সেটা সাধনের

সুবিধার জন্য। তা ধারণা না হলে মন বিষয়-আসক্তি ত্যাগ করবে না —ব্রহ্মে বসবে না। তবে ও কথাটা কি মিথ্যা? তা নয়। এই জগৎ-সংসারের চেয়ে ব্রহ্ম সত্য। সে সত্যের তুলনায় জগৎটা মিথ্যা বৈকি?

ভগবানলাভ হলে কেবল আনন্দ। সে যে কি আনন্দ তা আর মুখে বলা যায় না। উহা উপলব্ধির জিনিস, আনন্দ-সগার; তাঁর সন্ধান যে পেয়েছে, সেও আনন্দময় হয়ে গেছে। সে আর কি বলবো! কর্ম্ম ( সাধন ) না করলে বোঝা যায় না।

ভোগ-সুখ চাইলে ধর্ম্ম হয় না। ও দুটো এক সঙ্গে থাকতে পারে না। মনে ত্যাগ বাইরে ভোগ—মুখে বললেই হয় না, কাজে করা খুব কঠিন। অমন জীবন খুব কম দেখা যায়। তবে যে তা পারে সে করুক; অন্যে কেন বাধা দেবে? তেমনি যারা তা পারে না, তাদের সে আদর্শ দিয়ে চঞ্চল করা ঠিক নয়। তোমার প্রকৃতির সঙ্গে সকলেরই প্রকৃতি কি মেলে? নিজ নিজ প্রকৃতি-মত চলতে দাও, কেউ কাকেও বাধা দিও না।

ব্রহ্ম-নেশা আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে? গাঁজা, মদ খেয়ে নেশা করে, আর যতক্ষণ নেশা করে, ততক্ষণ একটু আনন্দ পায় এই যা। কিন্তু ব্রহ্মনেশা যার ভাগ্যে একবার জোটে, তার নেশা আর ছোটে না —তার আনন্দ আর টুটে না। যার ব্রহ্মনেশা জুটেছে, তার আর অন্য নেশার দরকার হয় না।

ঈশ্বর খুব কাছে—নিকট হতেও নিকটে আছেন। কিন্তু তাঁর মায়া এমনি যে, মনে হয় তিনি বহুদূরে আছেন। যেমনি তাঁর মায়া তিনি দয়া করে সরিয়ে নেবেন, অমনি তাঁর প্রকাশ তোমার চারদিকে—অন্তরে, বাইরে দেখতে পাবে। কিন্তু উহা তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করে।

যেখানে রাম, সেখানে আরাম—শান্তি। যেখানে রাম নেই, সেখানে আরামও নেই। 'যঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম। কভি দুঁহুঁ এক সাথ্ মিলত নেহি (জৈসী) রব্ রজনী এক ঠাম।' কাম হচ্ছে—বাসনা। যেখানে বাসনা সেখানে শান্তি, আরাম নেই; তাই সেখানে রামও নেই। যদি রাম চাও তো কাম ছাড়, কাম ছাড়লেই রাম মিলবে।

ভগবান রাবণ ও বিভীষণ দু'জনকেই শক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাবণ 'বদ্' দিকে শক্তি চালিয়ে দিলে, তাই নাশ হয়ে গেল; আর বিভীষণ সৎ-দিকে শক্তি চালালে—তাই ভগবানের আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল।

# বিবিধ

ভগবান যেটুকু করবার মুরদ দিয়েছেন, ততটুকু ঠিক ঠিক করাই ভাল—লোকদেখান না হয়। লোকদেখান খারাপ। সাধ্যমত ঠিক ঠিক চেষ্টা করলে, তিনি আরও ক্ষমতা ও অধিকার supply ( সরবরাহ ) করেন।

সাধু-ভক্ত কি গাছে ফলে ?—মানুষের মধ্যেই জন্মায়। উৎসাহহীন হয়ো না, প্রাণপণে লেগে যাও।

সংসারী জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন ভাল। কারণ, যদি কখনও বৈরাগ্য আসে, তা হলে সংসারী লোক ছেলে-পিলের মায়া ছেড়ে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না, অবিবাহিত লোক পারে।

সৎ-বুদ্ধি হলেই ভগবান স্বপক্ষে থাকেন, হীন-বুদ্ধি হলে ভগবান বিপক্ষ হন। তাঁর হুকুম পালন না করলে দুর্দ্দশা হবেই।

এমন শক্তি আছে—যাতে নিজে সুখী হয়, পরকেও সুখী করে, ইহা সৎ শক্তি। আর নিজে দুঃখ পায়, অপরকেও দুঃখী করে, ইহাই অসৎ শক্তি।

মানুষ ধর্ম্ম বুঝবে কি করে, রাত-দিন কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে ব্যস্ত। তবে যারা ঐ সংসারে থেকে মেহানৎ করে টাকা উপার্জ্জন করে,

দান-ধ্যান করে, ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করে, তাঁর বিষয়ে চর্চ্চা করে তারা খুব বাহাদুর। এরা ভগবানের সন্তান। সংসারে থেকে ভগবানের স্মরণ-মনন করে জীবনকাটান খুব বাহাদুরী। তবে ভগবানেরই সংসার মনে করে সংসার করলে খুব সুবিধা হয়।

যিনি ভগবানকে চান, তিনি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষদেরও মানবেন। কারণ, এঁরা হলেন মহাজ্ঞানী—ভগবানের দর্শনলাভ করেছেন। এঁদের মেনে চললে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করলে হিংসা-দ্বেষ চলে যাবে, দুঃখ দূর হবে এবং ভগবানকে বুঝতে পারবে। যার হবার তার হবেই। যে ভগবানকে চায়—সে তাঁকে ডাকবেই। যে চায় না, সে কেন ডাকবে ?

লেখাপড়া শিখে, ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে শিক্ষালাভ না করলে, লেখাপড়া সমস্তই বৃথা। উদ্দেশ্যহীন জীবন অতি খারাপ। মানুষের একটা-না-একটা উদ্দেশ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। * উদ্দেশ্য না থাকলে উন্নতি হয় না। লক্ষ্য স্থির করে একটা কাজে জোর করে লেগে থাকতে হয়। তবে যাঁর উদ্দেশ্য যত মহৎ, তিনি তত বড়।

মতামত মানুষ করে। মতামতের ভেতর কোন ভগবান নেই।

*

যেমন করেই হোক, সৎ হতে হবে। তা যে ধর্ম্মপালন করেই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

যারা ধর্ম্ম মানবে, ভগবানকে চাইবে, তাদের মেজাজই আলাদা। এক রকমের লোক আছে, ভাল কথা বললেও মানবে না, নিজের গোঁ-তে চলবে। নিজেও কষ্ট পাবে, অপরকেও কষ্ট দেবে—মহা তামসিক।

লোককে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ। যতটুকু পার, তাঁর কৃপায় দুঃখ দূর কর—শান্তি দাও।

ভগবানলাভ করবার সহায়তা হবে বলে ক'জন লেখা-পড়া শেখে? যে শেখে সেই ভাগ্যবান। লেখাপড়া শিখে ধন-মান হবে, এইজন্যই চেষ্টা—একেই বলে অর্থকরী বিদ্যা, তাতে ভগবানলাভ হয় না।

বুদ্ধদেব ইচ্ছা করলে মরা ছেলে বাঁচাতে পারেন—এই বিশ্বাস করে একজন স্ত্রীলোক তার মরা ছেলে নিয়ে এসে বুদ্ধদেবকে বাঁচিয়ে দিতে বললে। বুদ্ধদেব ঐ কথা শুনে বললেন—তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। যার বাড়ীতে কেউ মরে নি, তার বাড়ী থেকে কৃষ্ণতিল নিয়ে এসো। সেই কৃষ্ণতিল আনলে তোমার ছেলেকে বাঁচাব। স্ত্রীলোকটি অনেকের বাড়ীতে গেল, কিন্তু সকলেই বললে, আমার অমুক মরেছে। এইরূপে অনেক বাড়ী ঘুরে এসে বুদ্ধদেবকে বললে, 'এমন বাড়ী পেলাম না, যেখানে কোন লোক মরে নি।' তখন বুদ্ধদেব তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার ছেলেই শুধু মারা যায় নি, সকলের ঘরেই এইরূপ! তখন ঐ স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারলে এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যা হয়ে গেল।... নিজের দুঃখ যেমন বোঝ, অপরের দুঃখও তেমনি বোঝবার চেষ্টা করো। মানুষ অপরের দুঃখ বোঝে না বলেই কষ্ট পায়।

আর অপরের দুঃখ বুঝে সেটা দূর করবার চেষ্টা কর; ভগবান্ তোমাকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন, সেই অনুপাতেই চেষ্টা কর। বুদ্ধদেবের জীবের জন্য প্রাণ কেঁদেছিল, সেইজন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন। তুমি কি তা পারবে? তবে যতটা পার, তার মধ্যে যেন জুয়াচুরি না থাকে। এইরূপ জীবসেবা করতে করতে বুঝতে পারবে ভগবান কে।

আপন আত্মার কল্যাণ কর। সৎ-সঙ্গ, বিগ্রহ-দর্শন—এসব কি বৃথা যায়? রোগীর সেবা করা, দুঃস্থকে খেতে-পরতে দেওয়া—এইসব হলো ধর্ম্ম। এর চেয়ে আর কি ধর্ম্ম আছে?

গুরুবাক্যই হলো প্রধান। গুরু-বাক্য অনুযায়ী সাধন করতে করতে বস্তুর প্রকাশ হয়।... গীতা হলো ভগবানের বাক্য; গীতাপাঠ করা উচিত।

সদ্বুদ্ধি চাই। সদ্বুদ্ধি হলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিশ্চয়ই হবে। যে নিঃসংশয় হয়েছে, সে কত বড় ভাগ্যবান! ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকলে নিঃস্বার্থ ভাব আসবেই। সাঁচ্চা কাজ করলে সে কাজ চলবেই চলবে—জুয়াচুরি কোন কালেই চলবে না।

সরলতা হলে ভগবানের দয়া বুঝতে পারা যায়। যার সরলতা নেই, সে কূট-বুদ্ধির জন্য একটি কথার ওপর বিশটি মানে করে

দুঃখ পাবে ও অপরকে দুঃখ দেবে। ভগবান সরল লোককে ভালবাসেন। জপ-ধ্যানের ফলে মানুষ সরল হয়।

ভিক্ষে করে কত লোক খাচ্ছে; সকলেরই কি উন্নতি হয়? সাধুরা যে ভিক্ষা করে, তা পেটের দায়ে নয়—ভগবানের দায়ে! … সংসারীদের মধ্যেও অনেক মহৎ লোক আছেন।

এ সংসারে কাকেও বিরক্ত করা মহাপাপ।

হিংসা যদি হয়, তবে ভগবানের উপরই হওয়া ভাল।—অমুককে দয়া করলেন, আমায় কেন করলেন না—এটা ভাল।

পণ্ডিত আর কাকে বল? যে লেখাপড়া শিখে ভগবানের স্তব-স্তুতি করে, প্রার্থনা জানায়, দুঃখ জানায়, সেই পণ্ডিত। যে ভগবানকে জেনেছে, সেই পণ্ডিত।

ভাগ্যবান কে?—যে ভক্ত, ভগবানকে বুঝতে চেষ্টা করে।

ভগবান যাঁকে বড় করেছেন, তিনিই বড়। লোকের বড়-ছোট বলায় কি এসে যায়?

যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেখায় কি হিংসা থাকে? সেথায় শান্তি।

যে ভগবানকে জানবার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে আলাপ করলে শান্তি পাবে।

যে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস নেবে, সে জীবকে অভয় দেবে; সে এক ভগবান ছাড়া আর কারও ভালবাসা চায় না।

দ্রৌপদী ব্রত করে লোকজন খাওয়াচ্ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—সখি, ঐ লোকটাকে খাওয়াও। দ্রৌপদী খুব আয়োজন করেছিলেন। তার পর সেই লোকটি খেতে বসামাত্র শাঁখ-ঘণ্টা বাজতে লাগল। তার খাওয়ার ঠিক নেই, পর পর খাচ্ছে না—কখনও এটা, কখনও সেটা; তাই দেখে মনে ভাবছেন যে, লোকটা এমন, খেতেও জানে না! মনে করবামাত্র শাঁখ-ঘণ্টা থেমে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, 'তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি? শাঁখ-ঘণ্টা থেমে গেল কেন?' তখন দ্রৌপদী ঐ বৃত্তান্ত বললেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বড়ই অন্যায় করেছ! ওর কি খাওয়ার ওপরে মন আছে? আমার ওপর মন আছে।' দ্রৌপদীর মস্ত শিক্ষা—অহঙ্কার যেন না হয়!

ভাইয়ে ভাইয়ে মিল থাকার খুব দরকার। একসঙ্গে থাকতে গেলেই বকাবকি হয়। মনে পুষে রাখা খারাপ। তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'সতের রাগ, জলের দাগ, কি না—ক্ষণস্থায়ী।'

জানো আর না জানো, তাঁর গুণ যাবে কোথা? আনন্দময়

তিনি—জগতের কর্ত্তা, ত্রিলোকনাথ—তিনি মানুষরূপ ধারণ করেছেন। ওঁরা শক্তিমান পুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে লালিত; দেখিয়ে দিলেন—আমি যেখানে জন্ম নিই, সেখানে কোন দোষ নেই। হে জীব! দোষ ধরো না।

সাধু, রাজা, নদী, অগ্নি—এদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হয়। কখন কোন্ সময় কি যে মেজাজ হয়, তা বলা যায় না।

ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম্ম করতে হয়। আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম্ম করলে সিদ্ধাই হয়। ভগবান সিদ্ধাইকে ঘৃণা করেন। সিদ্ধাই এমন যে মানুষকে অপবিত্র করে দেয়।

স্ত্রীলোকদের জ্ঞান খুব কমেরই হয়। আমাদের স্ত্রীলোকদের দয়া করে উপদেশ দিতে গিয়ে শেষে মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হয়। সাবধান! স্ত্রীলোকের অন্তরে এক-আনা বৈরাগ্য থাকলে বাইরে দেখাবে ঢের। অনেক সাবিত্রীও আছেন বটে। স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু। অন্যত্র যাওয়ার কি দরকার?

ভীষ্মের মত হতে পারলে মানুষের কথা থাকে—ভগবানের কথা মিছে হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—অস্ত্র ধরব না। ভীষ্মের জন্য আপনার কথা মিছে করে অস্ত্র ধরলেন। ভীষ্মের কাছে ভগবান বাঁধা ছিলেন কেন?—এইজন্য যে, ভীষ্ম নিমকহারাম ছিলেন না। যার অন্ন খেতেন, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেখ, যে যারটা খায়, সে তার পক্ষ

সমর্থন করে। ভীষ্ম জানতেন, দুর্য্যোধন কি। তবু তার পক্ষ হয়ে পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করলেন; তার নিমক খেয়েছিলেন কি-না —তাই।

শ্রীকৃষ্ণের দয়া সকল অবতারের চেয়ে বেশী। যুধিষ্ঠিরের সভায় ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সেই সভায় তিনি জোর করে বলেছেন— আমি ভগবান, আমায় মান, তোমাদের কল্যাণ হবে। একদিকে ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে দিতেন, আবার বলতেন—আমায় মান, আমি ভগবান। শিশুপাল মানলে না, তখনি নাশ করে ফেললেন।

ভাল হলে কেউ কিছু বলে না, মন্দ হলেই চেপে ধরে—এটা জীবের স্বভাব। লোকের ভালর জন্য যুক্তি দেওয়া মুশকিল রে! যদি ভাল হয়ে গেল ত খুব খুশী, আর দেখা করে না; কিন্তু অন্য কোন কারণে যদি কিছু খারাপ হয়ে যায়, তা হলেই যত দোষ চাপিয়ে দেয়। তাই লোকের সঙ্গে সাবধান হয়ে কথা বলতে হয়। হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করতে নেই। নিজের ঘাড়ে দোষ কেউ নিতে চায় না। নিজের ঘাড়ে দোষটি নিলেই সব গোলমাল মিটে যায়। জীব কিন্তু তা কিছুতেই করবে না। কিসে অপরের ঘাড়ে দোষটি চাপাতে পারে, এই খোঁজে। আর কারও ঘাড়ে চাপাতে না পারলে অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

মানুষ নরম হলে লোক পেয়ে বসে। সহ্যগুণ দেখাচ্ছো?— সহ্যগুণের একটা সীমা আছে। বিরক্ত হয়ে কোন কাজ করা ভারী

খারাপ। এতে উভয়েরই অকল্যাণ হয়। যে কাজটি করবে, প্রীতির সহিত করবে। তা যদি না পার—করবে না। বিরক্ত হয়ে কোন কাজ করলে সে কাজের ফল দুঃখময় হয়।

আমার চর্চ্চা করো না। আমার চর্চ্চা করে কোন লাভ নেই। ঠাকুর-স্বামীজীর চর্চ্চা করো—রাতদিন করো, তাতে শান্তি পাবে। ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন যে চর্চ্চা করবে, তার কল্যাণ হবেই হবে।

দশ-বার বছরের ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুর-পূজা করতো। কি সংস্কার দেখ! কি কর্ম্ম ছিল, তাই এদের ঘরে জন্ম নিয়েছিল; কর্ম্ম ফুরালো, চলে গেল। এদের বলে শাপ-ভ্রষ্ট।

সাধু কি ভুলে? সংসারী জীব ভুলে যায়। সাধুর হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তাই তার সকলকে মনে থাকে। কিন্তু সংসারীদের স্বার্থে ভরা মন, যাকে ভালবাসলে স্বার্থসিদ্ধি হবে তাকে বাইরে ভালবাসা দেখায়, কাজ ফুরিয়ে গেলেই ভুলে যায়—এই সংসারী জীবের স্বভাব। তবে সৎ সংসারীও আছে—তারা নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করে।

নূতন কোন জিনিস আনলেই নিজ ইষ্ট ও গুরুকে নিবেদন করে তবে গ্রহণ করতে হয়। সব জিনিসের অগ্রভাগ ইষ্ট ও গুরুর আগে অধিকার। যার যা অধিকার, তাকে তা যে না দেয় সে চোর। ইষ্ট-গুরুকে দিয়ে গরীব-কাঙ্গালদের খাওয়াবে—ওরা সব দরিদ্র-নারায়ণ; তবে নিজে গ্রহণ করবে। এ হচ্ছে সাঁচ্চা লোকের ধর্ম্ম।

যতই অন্যায় করুক না কেন, তুটি অন্ন দিতে কাতর হবি না। তোর আছে বলেই তোর কাছে আসে—তুটো খেতে চায়; না থাকলে কে আসতো? তোর ভাগ্য যে, তোর কাছে সাধু-ফকির, দীন-দরিদ্র অন্নপ্রত্যাশী হয়ে আসে। মহাত্মাদের উপদেশ—কেউ অন্ন-প্রত্যাশী হয়ে এলে কখনও ফিরিয়ে দিবে না। যদি পেট-ভরা না দিতে পার, যা সামর্থ্য তাই দিয়ে নারায়ণ-জ্ঞানে তার পূজো করবে। 'ক্যা জানে কোন্ ভেকসে হরি মিল যাওবে'—তুলসীদাসের এই কথা মনে রেখ।

যে লোকটা অর্থ-সাহায্য করে, তাকেই আমরা ভাল লোক বলে থাকি। অর্থ-সাহায্য না করলেই খারাপ বলি। এই ত মনের অবস্থা! এই মন নিয়ে ধর্ম্ম হওয়া কঠিন। ঠাকুরের কাছে যখন ভক্তেরা আসতো, হৃদয়কে যদি কেউ কিছু সাহায্য করতো, তা হলে হৃদে বলতো—'মামা, ঐ লোকটা খুব ভাল।' আর ছোকরা ভবনাথ প্রভৃতি আসলে বলতো—'মামা, ওদের সঙ্গে কথা বল কেন? ঐসব নেংটা ছেলেদের 'সাথ' কথা কয়ে কি হবে? কোন ফল নেই।' ঠাকুর সব বুঝতে পারতেন।

দলাদলির ভেতর ভগবান নেই। ঠাকুর খুলে বলে গেলেন এবং জীবনেও দেখিয়ে দিলেন যে, সব ধর্ম্মই ঠিক। আর এরা ছোট বড় নিয়ে ঝগড়া করে—কত হীনবুদ্ধি দেখ!

অসৎভাবে উপার্জ্জিত টাকার সদ্ব্যয় হওয়া কঠিন।

গুরু এক হয়, শিষ্যদের কর্ম্ম হয় আলাদা। যেমন গিরিশ

বাবুর কর্ম্ম, স্বামীজীর কর্ম্ম আলাদা। কারুর কর্ম্মের সহিত কারুর মিল হতে পারে না। তবে উদ্দেশ্য এক হতে পারে। হে জীব, সৎ হও— তুমি নিজেই সুখী হবে।

নম্রতা সকলকেই দেখান ভাল বটে; বিশেষতঃ বিনয়-নম্রতা সাধু-গুরু-ইষ্টকে দেখাবে। তাঁরা তোমার মনের ভাব বুঝতে পারেন। অপরকে অধিক নম্রতা দেখান ভাল নয়। তারা তোমার মনের ভাব না বুঝে তোমায় চেপে ধরবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলমোড়া পাহাড়ে রাতভোর ধ্যান করতেন। এত টাকা, মান্য—তার মধ্যে ভগবানের উপর মন রাখা কি কম কথা? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব বাবু, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি গুরু ( আচার্য্য )।

দেনার মত পাপ নেই। এ শরীরের যখন কিছুই ঠিক নেই— কখন চলে যায়, তখন দেনা করে নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয়। দেনা নিয়ে শরীর ছাড়া ভারী খারাপ। যতদূর পারবে, দেনা করবে না।

যে কাজই করবে, একটু বিচার করে করবে এবং পার ত পাঁচ জনের পরামর্শ নিয়ে করবে। কোন কাজ নিজের গোঁয়ে করলে শেষে অনুতাপ হয়। তখন মনে হয়, কেন এরূপ করলুম।

ভাগবত-পাঠ খুব ভাল, বিশেষ কাশীর ন্যায় তীর্থস্থানে। অন্ত

জায়গায় না করে তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের ওখানে করলে ভাল হয়। আর কাকে শোনাবে? বিশ্বনাথ শুনবেন—এর চেয়ে আর মহাভাগ্য কি আছে! মানুষ আসুক আর না আসুক, তাতে কি এসে যায়? যে আসে, তারই কল্যাণ। তবে মানুষ বেশী হলে যে পাঠকের উৎসাহ বেশী হয়, এটা বেশ বুঝা যায়। পাঠ শেষ হলে, যারা শুনতে আসবে তাদের তিলভাণ্ডেশ্বরের প্রসাদ দেবে। রোজ তাঁর ভোগও হল, আবার সকলে প্রসাদও পেলে। ভাগবত-পাঠ শেষ হলে যদি সামর্থ্য থাকে ভাল জিনিস তৈরি করে সাধু-ব্রাহ্মণ-গরীবদের খাওয়ান ভাল।

তিনি (ঠাকুর) বলতেন—সৎকাজে খুব বাধা। সৎকাজ যে পর্য্যন্ত তাঁর কৃপায় ভালয় ভালয় মিটে না যায়, সে পর্য্যন্ত চিন্তা থাকে বৈ কি। দেখছো না, কত হাঙ্গামা এসে জোটে! ভগবানের দয়ায় সৎকাজ ভালমতে হয়ে গেলেই সুখের বিষয়। যে সুসময়ের অপেক্ষায় সৎকাজ বন্ধ রাখে, তার আর কোন কালেই হয়ে ওঠে না। সামান্য সৎকাজও বৃথা যায় না। যে সৎকাজ করে, তার প্রতি ভগবানের দয়া জানবে। পয়সা থাকলেই কি সৎকাজ হয় রে? তা হলে বড়লোকের আগে হতো। ইহজন্মে অথবা আগের জন্মে কর্ম্ম করা ছিল তাই হচ্ছে। এই জন্যই সংস্কার—কর্ম্মফল মানতে হয়। এমন জীব আছে যে, সৎকাজ করতে হলেই পয়সা খতাতে বসে—এত টাকা খরচ হবে! কিন্তু বাজে খরচের সময় কোন আটক নেই, কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা ঠিকও পায় না! আগের লোক এমনি সৎ ছিল যে, দোল দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ করতো, আর গরীব-দুঃখীদের পেটভরে খেতে দিতো। আর্থিক কোন কষ্ট ছিল না, অন্নের অভাব

ছিল না, বেশ স্ফূর্তি ছিল। এখন তোমরা যা হয়েছ—দু বেলা পেটভরে খেতেই পাও না, তা আর ঐসব ব্যাপার করবে কি? সেরকম মানুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না। এমন সব সময় আসে, যে-সময় সৎ লোক জন্মায়, জিনিস প্রচুর হয়, নিজেও খুব করে খায়, আর গরীব লোকদেরও যথেষ্ট দেয়। এসব তাঁর ইচ্ছা। মানুষের কোন মুরোদ নেই, নেই; কেবল মুখে বড় বড় কথা বললে কি হবে?

খাবার সময় কখনও রাগ করতে নেই। রাগ করে খেলে শরীর খারাপ হয়।

বলরামের পুত্র রামকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে অনেক দিন ছিলুম; কিন্তু আমাকে একদিনও বকায় নি। লোকে সাধুকে উপদেশ দিতে বলে এবং সাধুর কাছে অনেক আশা করে। বলরাম বাবুর সংসারকে ঠাকুর 'আমার সংসার' বলতেন। বলরাম বাবুর বাবা বৃন্দাবন থাকতেন ও বৈষ্ণবদের খাবার পরে যা পড়ে থাকত, তাই প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করতেন। উড়ে চাকরদের ডাকলে খোঁজই পাওয়া যেত না—এদিকে নীচে বসে গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে। অনেক ডাকার পর 'আজ্ঞে যাই' বলে হাতে মালা নিয়ে বাবুর কাছে এসে উপস্থিত হতো। বলরাম বাবুর বাবা চাকরের মালা দেখে বলতেন, 'ওরে, থাক্ থাক্।' কারণ, তারা ভগবানের নাম করছে মনে করতেন। দেখ কি সরল! কিন্তু চাকর বেটা ঠকাচ্ছে। চাকর জানতো, আমার মুনিব এরূপ করলে ভারী খুশী হন, আর আমিও কাজ এড়াই। মুনিব দেখে বড়ই খুশী হলেন, 'যাক, আমার কাজে না হয় একটু ক্ষতি হলো, চৈতন্য মহাপ্রভুর

হুকুম মানছে, ভগবানের নাম করছে।' এরা হলো ভাগ্যবান, সরল। টাকাকড়ি হলে কিরূপ দেমাক হয়, কিন্তু এঁদের সেরূপ কোন চাল-চলন ছিল না। ঠিক ঠিক বৈষ্ণব হলে এই রকমই হয়।

গৃহস্থদের কাছে সাধু থাকে না কেন? গৃহস্থদের রোগ-শোক, ভাবনা-চিন্তা, সংসারের নানা দুঃখ-অশান্তি—এসব একটা-না-একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। এই সমস্ত মায়া তারা সাধুর উপর চাপিয়ে দেয়। তখন সাধুর ভগবানের চিন্তা গিয়ে ঐ চিন্তাতে অল্প-বিস্তর থাকতেই হয়। তার অন্ন খেলে আর তার কাছে থাকলে কিছু-না-কিছু সুখ-দুঃখের অংশ নিতেই হয়। নিজের সংসার ছেড়ে এসে শেষে পরের সংসারের চিন্তায় জীবন কাটাতে হয়। এই জন্য সাধুরা লোক-সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জ্জনে থাকে—গৃহস্থদের কোন সংস্পর্শে আসে না, মাধুকরী করে খায়, একান্তে বাস করে। তখন তাদের ঠিক ঠিক ভগবানের উপর নির্ভর হয়, আর গৃহস্থদের সব মায়া থেকে অব্যাহতি পায়। গৃহস্থদের কাছে থাকলে দিন দিন শ্রদ্ধা-ভক্তি কমে যায়। এটা হচ্ছে বিষয়সঙ্গের কুফল। অবশ্য গৃহস্থদের মধ্যে অনেক ভক্ত পরিবার আছেন; তাঁরা সাধারণ গৃহস্থদের থেকে ঢের ভাল, কারণ তাঁদের মুখে ভগবানের নাম শুনতে পাওয়া যায়, তাঁরা সৎবিষয়ের আলোচনা করেন। কিন্তু এদের কাছে কেবল বিষয় বিষয়, অর্থ আর অর্থ, অন্য কোন কথা নেই। সদ্‌গৃহস্থ হলেও সাধুর তার কাছে থাকা উচিত নয়।

যতক্ষণ শরীর আছে, খাওয়া চাই। দুটি খাওয়ার সংস্থান থাকলে

ধ্যান-জপ যত পার কর। খাওয়ার সংস্থান না থাকলে ঐ বিষয়ের জন্য ভাবতে হয় ও ঈশ্বর-চিন্তায় বাধাবিঘ্ন হয়।

সাধু-সেবা বড়ই কঠিন, খুব শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহিত করতে হয়। আজকাল সব সাধুকে খাওয়াবার পরাবার নামটি করে না, অথচ থাকতে বলে। সাধু কি খেয়ে থাকবে, তার ঠিক নেই। সাধুকে থাকতে বলে গল্প করবার জন্য। দু-চার ঘণ্টা বকিয়ে যায়, কাজের নামটি নেই, অথচ একবার খেতেও বলে না।

তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—কলিতে অন্নগত প্রাণ। দু-চার দিন না খাও, পরে খেতেই হবে ; না খেলে শরীর ছুটে যাবে।

যাতে আত্মার উন্নতি হয়—তাই হলো সদ্‌বুদ্ধি, আর যাতে আত্মার অধোগতি হয়—সেটাই অসদ্‌বুদ্ধি। যে সৎ, তার আত্মজ্ঞান হয়।

যে সাধু ঔষধ দেয়, খড়ম পরে, তাকে তিনি ঘৃণা করতেন। এসব অহঙ্কারের চিহ্ন। তুমি ভগবানকে ডাকার জন্য সাধু হয়েছ। রোগ হলে ত ডাক্তার-কবিরাজ আছে। তবে নিঃস্বার্থ হয়ে গরীবদের ঔষধ দিয়ে সেবা করা—সে ভাল কাজ।

ভগবানের চেয়ে ছোটও কেউ হতে পারে না, তাঁর চেয়ে বড়ও কেউ হতে পারে না। ভগবান যেখানে যাবেন, সেখানেই সকলের আনন্দ। রামচন্দ্র বনে গেলেন, বনের সকলের আনন্দ—বৃক্ষ ফল দিচ্ছে, ফুল ফুটছে ; সকলেরই আনন্দ।

হুজুগে ধর্ম্ম থাকে না, কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভগবান চায়, তারা শত বাধাতেও ছাড়ে না। এখন ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ-ছবি দেখা যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তুমি কি মান? বিবেকানন্দ মেনেছিল। যদি তাঁকে মান, তবে তাঁর উপদেশ পালন কর। তবেই জানব তুমি ঠিক ঠিক ধর্ম্ম চাও।

যার যতটা আধার, তার ততটাই ধরবে। বেশী কি ধরে? তাই ত জনে জনে বুদ্ধির ভেদ।

ঠাকুর ঋণ করতে নিষেধ করতেন; যে জমিদারী বিক্রী করে, তাকে লক্ষ্মীছাড়া বলতেন। যখন জায়গা-জমি দেখতেই হবে, আলস্য করলে চলবে কেন? তখন বুকে হাঁটু গেড়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে হয়। যার আছে তাকে ছাড়বে কেন? যার যথার্থই নেই, তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ভগবান রামচন্দ্র ভূভার হরণ করতে এসেছিলেন। তাঁর জন্মস্থানে বাস করা মহাভাগ্য।

ভরত রামচন্দ্রের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। ভরত জানতেন, ইনি স্বয়ং ভগবান; ইনি লোক-কল্যাণের জন্য শরীরধারণ করেছিলেন; রাজ্যসুখ ছেড়ে দিলেন। রাম-পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে চামর ঢুলালেন, কত তপস্যা করলেন!—খুব ত্যাগী।

ধীরে ধীরে উন্নতি করা ভাল। খুব একচোটে উন্নতি করলে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। খুব কীর্ত্তন করলে মন হু হু করে উঠে গেল, কত নাচলে কাঁদলে, তারপর—যে-কে সেই!

চৈতন্য মহাপ্রভু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ—যত অবতার কত উপদেশ দিচ্ছেন। হে জীব! তোমরা এঁদের শিক্ষা নেবার, প্রতিপালন করবার চেষ্টা কর—কল্যাণ হবেই। অবতাররা জীবের শিক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ওঁদের কার্য্যের অনুসরণ করতে গেলে জীবের পক্ষে অকল্যাণ।

যে অপরের ছেলেকে ছেলে মনে করে, সে ভগবান হয়ে গেল।

বিষয়-বুদ্ধি যাবার জন্য সাধুরা ধ্যান-জপ করে, ভিক্ষা করে, কষ্ট করে।

নিজের দুঃখ না হলে পরের দুঃখ বুঝতে পারে না।

বিষয়ীর অন্ন খেলে মনটা অধোগামী হয়।

শিবপূজোর মত কিছু আছে না কি? শিব কৃপা করলে কি না হয়? প্রভু রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরীরধারণ করে জীবের শিক্ষার জন্য তাঁর দয়া পেয়েছিলেন। হে জীব, আপন কল্যাণ চাও, শিবপূজো

কর। তিনি জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি দেন। শিবপূজো করলে জগতে যা না হবার, তাই হয়—শিব হয়।

যে সংসারে ধর্ম্মের কথাই হচ্ছে, কি দিয়ে ঠাকুরের ভোগ হবে, পূজো হবে—এই নিয়ে আলোচনা—কলহ-বিবাদ নেই, সেই সংসারই ঠিক।

জীব সংস্কারের জন্য কষ্ট পায়। কেউ পূর্ব্বের সংস্কার, আবার কেউ যার ঘরে জন্ম লয়, তার জন্য কষ্ট পায়। বড়লোকের ছেলে, কোন অভাব নেই, চুরি করে। ভগবানের দয়া, গুরু-কৃপা ভিন্ন সংস্কার যায় না। এই সংসারে ধন মান বিষয় অপমান ইত্যাদির সংস্কারের জন্য জীব কষ্ট পায়। ভগবান ইচ্ছা করলে এখনই সংস্কার কাটিয়ে দিতে পারেন। জীবের সংস্কারও যাবে না, ভগবানকেও পাবে না।

সংসার চালাতে হলে পরস্পর কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে হয়। তা হলে ভাল সংসার চলে। যেমন একজনের উপর নির্ভর করলে সংসার ভালরূপ চলে না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ পথের যারা, তারা পরস্পর ধর্ম্ম-আলোচনা করবে—পরস্পর ভুল সংশোধন করবে। এই হলো এ দিকের সাহায্য।

আইডিয়াতেই (কল্পনাতে) কি কেবল ধর্ম্ম হয়? অনন্ত, অনন্ত কর, ভাব যে তুমি অনন্তের কতটুকু!

যদি বিয়ে না করিস, তবে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে যাবি। খাওয়া-পরার ত কোন অভাব নেই। খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারবি। বিয়ে করলেই দুঃখ পাবি। তোদের বিষয়ের বখরা হলে তোর ভাগে আর কত পড়বে। এর উপর বিয়ে করলে ছেলেপিলে হলে তাদের কি খাওয়াবি? যদি বিয়ে না করে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারিস, তা হলে সুখ পাবি। Free life (স্বাধীন জীবন) কত সুখের! একবার তার স্বাদ পেলে আর কি বন্ধনে যেতে ইচ্ছা করে?

তুলনা করার সময় রাস্তায় যে লোকটা পড়ে আছে, তার সঙ্গে তুলনা করলে দুঃখ পাবে না, শান্তি পাবে। ধনী লোকের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করতে গেলেই দুঃখ আসবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, ওর মত রাস্তায় পড়ে দুঃখ পাচ্ছ না। তোমার ত একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, এক মুঠো খাবার আছে—বিশেষ কোন অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না। দুঃখ-কষ্ট হলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়—তোমার চেয়ে আরও কত দুঃখী আছে। তা হলে দুঃখ সহ্য করবার শক্তি আসে, মনে শান্তি হয়।

যুবা বয়সে শরীরের উপর কত অত্যাচার করেছি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কঠোরতা করে। তখন বুঝতে পারি নি শরীর সুস্থ থাকা কত দরকার। এখন দেখছি শরীর ভাল না থাকলে ভগবানকে ডাকবে কে? এখন ইচ্ছা হয়— খুব ডাকি, কিন্তু শরীরে একটা-না-একটা রোগ লেগেই

আছে। কি যে দুঃখ হয়, তা আর কি বলবো! রক্তের তেজ যত কম হচ্ছে, তত যেন সব চেপে ধরছে।

যেখানে ভিক্ষা আর জলের সুবিধা আছে, সাধুরা সেইসব স্থানে থাকবে। সকালে উঠেই চিন্তা হয় কোথা ভিক্ষায় যাবো। ভিক্ষা করতে কত সময় যায়! সেইজন্য হরিদ্বার, হৃষীকেশ খুব তপস্যার জায়গা। ঐসব স্থানে সাধুরা বেশী থাকে। কারণ, ভিক্ষার ও জলের খুব সুবিধা আছে। তিনি (ঠাকুর) বলতেন, "মাধুকরীর অন্ন বড় পবিত্র।" কেন না, একখানা রুটি দেবে, তার আর কি কামনা করবে?

আমি একবার ইটিলিতে কোন অনুরাগী ভক্তের কাছে টাকার জন্য গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, সেই ভক্তটি কিছু 'পান' করছেন। তারপর তিনি আমার হাতে ৩।৪৲ টাকা দিলেন। আমি প্রথমে নিলাম। তার একটু পরেই ভক্তটির হাতে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন থাক।' আমি ফিরে আসলে অন্যান্য ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, টাকা নিলেন না কেন?' আমি বললাম, 'মত্ত হয়ে টাকা দিয়েছে, পরে হয়ত অন্য ভাব আসতে পারে, তা হলে দাতার ও গ্রহীতার উভয়ের পতন।' তাই টাকা ফিরিয়ে দিলাম।

সংসারে সুখ নেই—মরার পরও সুখ নেই। যতই অর্থ, স্ত্রী-পুত্র, মান, যশ হউক না কেন, তবুও সুখ নেই। তবে সুখী লোক

আছে—যাদের কোনও দুঃখ নেই, কেবল শান্তি। যেমন সনক, সনাতন, সনৎকুমার, শুকদেব। এঁরা চিরকুমার, চির-বালক, রোগ-শোকের অতীত—এঁদের কোনই দুঃখ নেই, সদাই শান্তিতে আছেন। এঁদের মধ্যে ভগবানের সব শক্তি আছে।

একটু ধর্ম্মের দিকে মন গেল, আর বড় বড় চুল রাখলে। বড় বড় চুল রাখলে কি ধর্ম্ম হয় রে? ধর্ম্ম মনে—জীবনে অনুভব করতে হয়। 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' বললেই ধর্ম্ম হয় না। কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই।

ছেলে রোজগার করলে বাপ-মা আশা করে। বাপ-মার হাজার সঙ্গতি থাকলেও যতটুকু পার সাহায্য করা উচিত। না সাহায্য করলে বাপ-মার মনে দুঃখ হয়। তবে বিয়ে করতে বললে যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে, বাপ-মার কথায় বিয়ে করা উচিত নয়। তাতে কোন দোষ নেই। বাপ-মা নিজেরাও দুঃখভোগ করে, আবার ছেলেকেও দুঃখভোগ করাতে চায়। এরই নাম সংসার!

একসঙ্গে থাকতে গেলে দুটো উঁচু-নীচু কথা হয়েই থাকে; তা হলে কি সব সময় মনে রাখতে হয়? যখন হলো—তখন হলো; ঐ ভাব মনে রাখতে নেই, তাড়িয়ে দিতে হয়। আমাদের মধ্যে ঐ রকম অনেক হতো। তখন আমরা বলাবলি করতুম—'ভাই, ভিতরে কিছু রেখো না।' তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'সতের রাগ জলের দাগ।'

যে দেশে ঠাকুরদেবতা, দেবমন্দির নেই, সে দেশ ত শ্মশান রে! সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ সকল সময়েই ঠাকুর-দর্শনে যাবে। এ সংস্কার করা খুব ভাল। তবে সুখের সময় যে দর্শন করা যায়—সেটা পবিত্রতা আনে। ঠাকুরের কাছে গেলে একটু উদ্দীপনা হয় বৈ কি। অন্ততঃ সেই সময়টা খুব ভাল লাগে, সংসারের কোন কথা মনে থাকে না—ঐটুকুই লাভ।

তোদের ভাল বলতে যতক্ষণ, খারাপ বলতেও ততক্ষণ। মোট কথা, বিচার করে কোন কথা বলিস না, তাই এ রকম হয়। বিচার করে সব কথা বলা এবং নেওয়া দরকার। তা হলে কোন গোল থাকে না। ঐরূপ না করলে শেষে ভুগতে হয়।

কাশীতে শিব অনেকেই প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু অনেক শিব জল পর্য্যন্ত পায় না—এটা বড় দুঃখের বিষয়! শিব প্রতিষ্ঠা করা ভাল বৈ কি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিয়মমত পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে ত কল্যাণ হবে।

কুকুর অনেক মানুষের চেয়ে ভাল (বিশ্বাসী)। মনিবের বাড়ীতে বদ্‌লোক এলে কামড়ে দেয়—তা না পারলে চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু নিমকহারাম চাকর কিছু বলে না।

যে বিষয় যে জানে না, তার কাছে সে বিষয়ের উপদেশ নিতে নেই। আদার-ব্যাপারী জাহাজের খবর কি জানে?

ছেলেবেলা হতে পবিত্রভাবে থাকতে হয়—ভগবানের জন্য ব্যস্ত হতে হয়। তা না হলে যোয়ান বয়সে বদখেয়ালিতে পড়ে মানুষ মাটি হয়ে যায়। ঐ বয়সে ঠিক থাকা কি কম কথা? যদি ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত মানুষ কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকতে পারে, তা হলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বোধ আপনা-আপনি আসবে।

মনের সঙ্গে মিল করে কি হবে—উদ্দেশ্য এক হলে মিল হতে পারে। একজন কেবল কু-মতলবে ঘুরছে, আর একজন কি করে সাধু হবে ভাবছে। সেইজন্যই ত মিল হচ্ছে না—এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। যে যার নিজের উদ্দেশ্য নিয়ে থাকলে, আর গোল থাকে না।

মানুষ কি ম্লেচ্ছ হয় রে? কর্ম্মই ম্লেচ্ছ।

বেশ ভাল কথা সমাজের সেবা—এ সৎকাজ, সন্দেহ নাই। বাকি (কিন্তু) ভগবানলাভ এতে হয় না। ভগবানলাভ করতে হলে, তাঁর জন্য নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। তুমি বলছো—কর্ম্মের দ্বারা কি ভগবানলাভ হয় না? না, চিত্ত শুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাঁকে পেতে হলে নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

মাধুকরী কি জান? মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বসে একটু একটু করে মধু সংগ্রহ করে খায়, ঠিক তেমনি। সাধু ঐরকম বাড়ী বাড়ী গিয়ে এক এক মুটো অন্ন সংগ্রহ করে খাবে। লোকে নানান কামনা করে সাধুকে ভিক্ষা দেয়। যে যে-পরিমাণ দেয় তার সঙ্গে

ততখানি কামনাও তার থাকে। সাধু এজন্য এক মুটোর বেশী নেয় না। একমুটো দেবে, তাতে আর কত কামনা করবে! এ কামনাতে সাধন-ভজনের ক্ষতি করে না। অল্প অল্প ভিক্ষে নিলে তাতে কামনার ভাগও কম আসে। তাই সাধন-ভজনের বেশী ক্ষতি হয় না, অথচ স্বাধীন থাকা যায়। ঠাকুর এজন্যই আমাদের মাধুকরী করিয়েছিলেন। মাধুকরী বড় ভাল—সাধনার পক্ষে অনুকূল। তিনি ( ঠাকুর ) মাধুকরীর অন্ন বড় ভালবাসতেন।

শ্রীরামচন্দ্র বলি দেন নাই। তাঁর হুকুম শুনলে কল্যাণ হবেই হবে। পূজার সময় হাতযোড় করে শ্রীরামচন্দ্র প্রভুকে, মা-দুর্গাকে দুঃখ জানাবে; মা ত সব জানেন। বলির কথা নিষেধ করবে; শোনে ভাল, না শোনে তুমি কি করতে পার? আপনার দুঃখ আপনি আনবে, তোমার কি? তাঁর সাত্ত্বিক পূজা। আর বলিটলি দেওয়া—ও সব রাজসিক ভাব।

যে ভগবানের পথে—ধর্ম্মের পথে বাধা দেয়, তার মত শত্রু আর নেই।

তেজী লোকের দোষ ধরো না। তেজী লোকের দোষ ধরা অন্যায়। কারণ, সে কি ভাবে কোন্ কাজ কচ্ছে, তা কে বলবে?

শরীর ছাড়বার সময় যে ভগবানের নাম লয়, তার বহু তপস্যার ফল। সে নিশ্চয়ই সজ্জন।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—দোষী ভগবানের কাছে যেতে পারে না; নির্দ্দোষ পবিত্র আত্মা যেতে পারে। তিনি তাঁর কাছে প্রকাশ হন।

দানের উপকারিতা কি জান? ধ্যান-জপের সাহায্য হয় (অর্থাৎ দাতার মন উদার, প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে)। মনের এরূপ অবস্থা ধ্যান-জপের বিশেষ অনুকূল, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল কেটে যায়। তবে যার পয়সা আছে, সেই দান করবে। যার তা নেই, সে ভগবানের নামজপ করবে—ভগবানের কাছে দুঃখ জানাবে, (ইহাই চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক হবে)।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ করে দেখিয়ে দিলেন যে, মানবদেহ ধারণ করলে ভগবানকেও কষ্ট করতে হয়, মানুষের কা কথা! ভগবানের রাজ্য থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? দশরথ শ্রীরামকে রাজা করলেন। আবার যখন বনে পাঠালেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বনে চলে গেলেন।

সৎ, পবিত্র হলে ভগবানই তোমায় সাহায্য করবেন—মানুষ কা কথা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের সঙ্গে থাকতেন (যুদ্ধের সময় সারথিরূপে)। অর্জ্জুন ভয় পেয়ে বলেছিলেন—সখা, কি হবে? ভগবান বললেন—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষের জয় নিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারতেন—সখা, আমি আছি, ভয় কি? কিন্তু তা তিনি বলেন নি।

অসৎ লোকের জিনিস খেতে নেই—অসদ্‌বুদ্ধি হয়। সতের অন্ন শুদ্ধ—তার অন্ন খেলে সৎ-বুদ্ধি হয়।

পুণ্যবান লোককে দেখলে মন প্রফুল্ল হয়। আর পাপাত্মাকে দেখলে হৃৎকম্প হয়।

সকলেই তাঁর ( ভগবানের ) সন্তান। তবে যে ভগবানকে ভক্তি করবে, তাঁর শরণ লবে, সেই সুসন্তান।

ভগবান কি তোমার বাঁধা যে তোমার নিয়মে চলবেন? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছামত সকলকে চলতে হয়।

অসৎসঙ্গ করলে অসদ্‌বুদ্ধি আসবে; সৎসঙ্গ করলে সদ্‌বুদ্ধি হবে। যেমন সঙ্গ করবে, তেমনি ফল পাবে।

বাসনাতে লোক মরে, দুঃখ পায়; ক্রমাগত বাসনা ওঠে। বাসনা না গেলে সুখের আশা নেই।

এ জগতে কারো সুখ নেই। যার অর্থ আছে, তারও দুঃখ ( তস্করাদির ভয়জন্য ); যার অর্থ নেই, তারও দুঃখ ( দরিদ্রতাহেতু )। কেবল যে ভগবানকে পেয়েছে, সেই সুখী।

ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। কারো হিংসা করতে নেই। হিংসাই যত গোলযোগ বাঁধায়। হিংসুকেরাই দুঃখ পায়।

যার সংসারে কিছুই নেই, সে ভগবান ছাড়া আর কাকে ডাকবে? সব থাকতে যে ভগবানকে ডাকে, তারই বাহাদুরী।

সৎ-সঙ্গ করলেই কি স্বভাব যায়? কর্ম্ম করতে হয়। কথায় আছে যে, কোন কাকের সঙ্গে এক হাঁসের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কাক হাঁসকে এবং হাঁস কাককে নিমন্ত্রণ করেছিল। হাঁস কাককে ভাল ভাল জিনিস খাওয়ালে; আর কাক হাঁসকে বিষ্ঠা খেতে দিলে। এর অর্থ এই যে, হাঁসের সঙ্গ করলেও কাকের জাতি-স্বভাব যায় নি।

গুরুর আদেশমত তাঁকে সেই নামেই (যা দীক্ষাকালে পেয়েছ) ডাকছ। তবে আরো যদি দশরূপে তাঁকে ভাবতে ইচ্ছা হয়— মনে রাখবে যে, 'সবই ইষ্টের লীলা।' নাম-রূপ নিয়ে ডাকা কি-না; ডাকায় কোন লাভ-লোকসান নেই। এতে আবার বাদ দেওয়া কি? এক জনকে ডাকলেই ত সকলকে ডাকা হল। একজনের নাম নিলেই ত সকলের নাম নেওয়া হল। আবার সব নাম-রূপ আরোপ করে ডাকলেও তাঁকেই (ইষ্ট) ডাকা হয়। তাতে 'চাঞ্চল্য' (ভেদবুদ্ধি) আসে না। তবে এক জনের ভেতরই যখন সব, তখন নানারূপ এলেই বা কি (এসে যাবে)? ওগুলি কেবল সন্দেহ। আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ওটা দূর করা একটু কঠিন। সন্দেহ হওয়া ভ্রম। সবই তিনি।

ধর্ম্ম-উপদেশ সকলেই দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম করা ভারী কঠিন। ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না।

লেখা-পড়া করা খুব দরকার। তা হলে বুদ্ধি মাজ্জিত হয়। বুদ্ধি মাজ্জিত না হলে বিচার-বুদ্ধির উদয় হয় না। সদসদ্-বিচার করবে কি দিয়ে ?

গৃহস্থই হউক, আর সাধুই হউক—ভগবান কর্ম্মহীনকে খুব ঘৃণা করেন। কর্ম্ম দুই প্রকার—অন্তঃকর্ম্ম ও বহিঃকর্ম্ম। একটা-না-একটা কর্ম্ম করতেই হবে। কর্ম্ম না করলে তাঁকে বুঝবে কি করে ?

কলিতে অন্নগত প্রাণ—খাওয়া-পরা চাই, তার চেষ্টা করবে বৈ কি। মন কিন্তু ভগবানের দিকে দেবে—এ কথা তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন।

বিবেকানন্দ ভাইকে নিয়ে এত কাণ্ড হল। ঠাকুরের নাম সেই ত প্রচার করলে। সে বলতো—ঠাকুর ছাড়া উপায় নেই, তিনিই সব উন্নতির মূল। যে বিবেকানন্দ ভায়ের কথা না মানবে, সে ঠকবে।

যারা ভগবান রামচন্দ্রকে লাভ করতে চায়, তারা যদি হনুমানের শরণ লয়, তবে শীঘ্র তাঁর দয়াতে রামচন্দ্রকে লাভ করতে পারে। ভগবান ভক্তের অধীন। ভক্তের শরণ নিলে ভগবানের দয়া বুঝতে পারা যায়—তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তকে সম্মান করলে ভগবান সুখী হন। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে অর্জ্জুনের শরণ নিতে হয়। আর ঠাকুরকে জানতে হলে স্বামীজীর শরণ নিতে হয়। তাঁর শরণ নিলে তবে ঠাকুরকে জানা যায়। আমাদের মধ্যে first ( প্রথম ) স্বামীজীই ঠাকুরকে বুঝেছিল। তার পর স্বামীজীর কৃপায় আমরা তাঁকে একটু জেনেছি।

স্বামীজীর মত গুরুভাই কি আর পাব? এখন কত লোক লেক্‌চার দিচ্ছে, বই লিখছে—তাতে লোকের কি হয়? স্বামীজী যা লিখেছে, তা অনুভব করে লিখেছে; তাই তা চিরদিনই নূতন থাকবে। তা পড়ে কত লোক শান্তি পাচ্ছে ও পাবে। আসল কথা—অনুভব দরকার। তা না হলে কিছুতেই কিছু হয় না, লেক্‌চার দাও আর বই-ই লিখ!

শরীরধারণ করলেই ভয়ানক কষ্ট—এ কথা কেউ বোঝে না। সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিসে যে সুখ হয় তার সন্ধান রাখে না। গর্ভাবস্থায় দুঃখ, জন্মাতে দুঃখ, বাঁচতে দুঃখ, মরতেও দুঃখ—এখানে সুখ কোথা? সবাই কেবল সুখের জন্য মত্ত। একমাত্র ভগবান-লাভেই সুখ; তাঁকে যারা দেখেছে, তারাই সুখী, তাদেরই শরীরধারণ সফল; এত দুঃখ তাদের কাছেই সুখ বলে মনে হয়। তা না হলে শরীরধারণ বিড়ম্বনা—খালি দুঃখ-ভোগের জন্য।

তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'তৈরী খানা মৎ ছোড়ো' (অর্থাৎ, তৈয়ারী খাবার ছেড় না)। তৈরী খানা ছাড়লে অকল্যাণ হয় এবং হয় তো সে দিন আর খাওয়া হল না। যেরকম খাবার হোক না—ভাল-মন্দের দিকে লক্ষ্য না রেখে শান্তির সহিত খাবে। ঐরূপ তৃপ্তির সহিত খেলে শরীর সুস্থ থাকে, আর মন পবিত্র হয়। যা খাবে—তা যাই হোক না কেন, ইষ্টকে অর্পণ করে খাবে। যদি কোন দোষ থাকে, ইষ্টকে অর্পণ করলে কেটে যায়।

গুরু-নিন্দা শুনতে নেই, তাতে দোষ হয়। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে

আচ্ছাকরে শাস্তি দিয়ে দিবে—তাতে কোন পাপ নেই। আর যদি ক্ষমতা না থাকে, তা হলে সে স্থান ত্যাগ করবে।

এইসকল ( বিষয় ) পেয়েও বোধ করবে যে, ত্যাগী জনের পক্ষে উহা মাটী; গুরুই সত্য, ব্রহ্মই সত্য। কারণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখের কথা ত শুনেছ, আর স্বামীজীর জীবনাদর্শ দেখে আরও সাহায্য পেলে। অতএব তোমরাও যদি ওঁদের অনুসরণ করে জীবন কাটাতে পার, তবে তাঁর ( গুরুমহারাজের ) গৌরব। যাঁর সাত শত গুরুভাই ল্যাংটা, গুরুও ল্যাংটা, নিজেও ল্যাংটা, তাঁর ল্যাংটা-দর্শনে আনন্দ ( হয় )। তিনিই বলতেন যে, কোন রাজা তাঁর সাত শত গুরুভাইকে ভোজন করিয়ে রূপোর থালা-গেলাস দান করেছিলেন, তথাপি তাঁরা যে ল্যাংটা সে ল্যাংটা—তোমাদেরও এইসমস্ত কথা বোঝা উচিত। তুমি শুনেও থাকবে যে, তিনি সাধুর রাজা। আর আমিও সেই কথা স্মরণ করিয়ে বলছি যে, আমরাও তাঁরই সন্তান। গুরু ভিন্ন বড় কেউ নেই, সুতরাং 'মাটীর' আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়; ব্রহ্ম বা গুরুতেই হরষিত হতে হয়। জড় হতে কেউ কি হরষিত হয়ে থাকে? চৈতন্যেরই হরষিত করবার ক্ষমতা আছে।

আমরা তাঁর সন্তান, কেউ যদি আমাদের পাগল বলে, তবু তো একবার ঠাকুরের নাম নেবে। বলবে ত—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'ছেলেটা' পাগল হয়েছে! ঠাকুরের নাম নিলেই আমাদের আনন্দ।

প্রশংসা করলে তোদের বুক পাঁচ হাত বেড়ে যায়, আর নিন্দা

করলেই মনটা ছোট হয়ে যায়—এও জীবের ধর্ম্ম দেখছি। যার মন নিন্দা-স্তুতিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সে যথেষ্ট ভাগ্যবান। তার উপর ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে।

বিয়ে না করে যদি পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারিস, এই সংসার থেকে বেঁচে গেলি। বিয়ে করলেই যত দুঃখ। আজ স্ত্রীর, কাল ছেলের অসুখ হলো, পরশু মারা গেল—এই নিয়ে রাতদিন চিন্তিত থাকতে হয়, ক্ষণেকের জন্য সুখ নেই। আর বিয়ে না করলে নিজের শরীরের উপর দিয়ে যা ভোগ হয়—এই তফাৎ।

পুত্রশোকের মত আর কি কিছু আছে রে? তিনি (ঠাকুর) বলতেন, "যার পুত্রশোক হয়, সেই বুঝতে পারে—পুত্রশোকটা কি জিনিস! মানুষের পুত্রশোক হলে, তাকে মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলতে নেই; তা হলে তার খামকা সংশয়ের উদয় হয়।" তিনি (ঠাকুর) সেই সময় মন বুঝে শিক্ষা দিতেন, তাই তাঁর প্রতি কখনও কারও সংশয় হয় নি।

দোষও করবে, আবার চোখও রাঙাবে—কিছু বললেই মুশকিল। সংসারে এই ভাবই বেশী। তাই ত এত গোলমাল।

কেবল বকাতে আসে, কিছু ত করে না—সে লোকের সঙ্গ করে কি হবে? দুর্দ্দশা হবে। নিজেও সাধন-ভজন করে না, অন্যকেও করতে দেয় না।

শরীর নিয়ে সকলের সাথে সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ থাকলে সব ভাল লাগে। অসুস্থ হলে আর কেউ দেখে না—কিছু ভালও লাগে না।

জীবের কি কোন কালে গতি আছে? সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাচ্ছে, তা ফেলে দিচ্ছে—নিজের বুদ্ধি-মতলব বড় করবার জন্যে।

সকলকেই কাঁদতে হবে—না কেঁদে উপায় নেই। কেউ ভাইয়ের জন্য, ছেলের জন্য কাঁদছে। যারা ভাই-ছেলের জন্য কাঁদে, তারা জীব; আর যাঁরা ভগবানের জন্য কাঁদে, তারা যথার্থ ভাগ্যবান পুরুষ।

ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল রাখবে। কেউ রোজগার করলে, আর কেউ ঈশ্বরচিন্তা করলে—এই রকমে দিন কাটাবে। তোমাদের দু'টি ভাইকে কেন ভালবাসি? তোমাদের ঐ ভাবটি আছে; আর তাঁর নামে তোমরা কেউ বিয়ে কর নি, ঠিক ঠিক জিতেন্দ্রিয় হয়ে আছ। এই ত চাই! তাইত তোমাদের ভালবাসি; তোমাদের টাকার জন্য তোমাদের ভালবাসি না।

আজকাল তোমরা সব পৈতে নেবার জন্য গোলমাল লাগিয়েছ। কেশব সেন পৈতে ফেলে দিলেন; তিনি ( ঠাকুর ) পৈতে ফেলে দিলেন। তাঁরা যা ফেলে দিলেন—তোমরা সেই সবের জন্য হট্টগোল করছ। পৈতে নিলে কি চারটে হাত-বেরুবে? কর্ম্মই হচ্ছে প্রধান। কর্ম্ম নেই, পৈতে নিলে কি হবে? ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, বৈশ্য বৈশ্যের কর্ম্ম করুক। তা হলেই ত হল। কর্ম্ম নেই—পৈতে নেবার জন্য হট্টগোল

করছে। কোথা উপাধি ত্যাগ করবে, না উপাধি বাড়াচ্ছে। উপাধি যত কমে যায়, ততই ঈশ্বরলাভের স্থবিধা হয়। উপাধিশূন্য না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও মত একই। তবে বুদ্ধের সময় কর্ম্ম (বৈদিক যাগযজ্ঞাদি) ছিল না। শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মের স্থষ্টি (পুনঃপ্রতিষ্ঠা) ও বৃদ্ধি করলেন। তিনি চার ধাম প্রকাশ করলেন—দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর ও জগন্নাথ।

রাগ আর অহঙ্কার ভারী খারাপ—দুটোই মানুষের শত্রু। রাগ আর অহঙ্কারের বশ হলে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না। আর হিংসা করা পাপ। বুদ্ধদেব তাই বলে গেছেন—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠিরের মনে একটুও হিংসা-পাপ ছিল না। মানুষ যত হিংসা ছাড়বে, তত পবিত্র হবে, মনে শান্তি পাবে। হিংস্থকের মন অপবিত্র, অশান্তিপূর্ণ। যদি শান্তি চাও, হিংসা ছাড়।

গুরুর কৃপায়, ভগবানের কৃপায় ব্রহ্ম-নেশা লেগে যায় তো ব্যস্, সব হয়ে গেল। অপর নেশা করা ভাল নয়, তাতে অমন মজা নেই। 'স্থরাপান করি নারে, স্থধা খাই জয় কালী বলে'—এই হল ঠিক ভাব। ঠাকুরের এমনি ব্রহ্ম-নেশা লেগে থাকতো—সে আনন্দে ভরপুর অবস্থা। পা পর্য্যন্ত টলতো, আর লোকে ভাবতো যে মদ খেয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মনেশায় অমন হতো।

পরীক্ষিতের ভাগবত শোনার ফল ঠিক ঠিক হয়েছিল। ভাগবত শুনে, সব দেখে নিঃসংশয় হয়ে বললে—"আমার আর শরীর ছাড়তে ভয় হচ্ছে না।" ভাগবত শুনলেই হল না, ধারণা করবার শক্তি চাই।

ঠাকুরের ভক্তদের খেতে পরতে কিছু মানা নেই, কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান। খুব খাও, পর—কিন্তু বজ্জাতি করো না, তা হলেই হল।

উপদেশ লিখলে, মুখস্থ করলে কি হবে?—অন্তরে প্রবেশ করা চাই। কর্ম্ম নেই—ভুলে যায়; নিজের প্রবৃত্তিমত কর্ম্ম করে, লোককে ঠকাতে যায়। এদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। আরে, উপদেশ লিখলেই কি সব হয়ে যায়? মনে ধারণা করতে হয়, উপদেশমত কর্ম্ম করতে হয়, তবেই না তার ফল পাওয়া যায়। কতকগুলো কথা মুখস্থ করে একে তাকে উপদেশ দিতে যায়। ব্যাপার দেখ! আগে নিজের জীবনে অনুভব কর, তবে ত উপদেশ দেবার ক্ষমতা হবে। যখন নিজেরই কিছু হয় নি, তখন অপরকে দিবি কোথেকে? তাই ঋষিরা যাকে-তাকে উপদেশ দিতেন না। উপদেশ দেবার আগে খুব তপস্যা করিয়ে নিতেন। হয়তো বললেন—'যাও তীর্থপর্য্যটন করে এস, তারপর উপদেশ দেব।'

সাধু যদি মান-সম্ভ্রমের বশীভূত হল ত সে গেল। ঐ হলো দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা চেপে ধরলে রোগ হয়, তখন সারানো মুশকিল। সাধু ঐসব মান-সম্ভ্রমে তুচ্ছবুদ্ধি আনবে। যে তা আনবে না, তার পতন হবেই হবে।

ছেলে-মেয়ে হবার আগে সাধুর কাছে আসতে পার নি? এখন অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সংসারে কষ্ট হয়েছে—তাই সাধুর কাছে এসেছ। সাধু তার কি করবে? সুখ পেয়েছ কিন্তু দুঃখভোগ করতে চাও না। জান না—সুখের পর দুঃখ আসে? আমরা 'ধূলোকে সোনা-করা' সাধু নই; আমরা তাঁকে জেনে শান্তি পেয়েছি। এখানে যারা আসে তাদের ভগবানকে ডাকতে বলি। তোমাকেও বলছি—ভগবানের শরণাগত হও, তাঁকে প্রাণভরে ডাক; তাঁকে ডাকলে দুঃখ-কষ্টের ভেতরও শান্তি পাবে। আমরা আর কিছু জানি না।

অমুক খারাপ—তা তোমার কি? তুমি খারাপ-ভালর কি বোঝ? তাঁর সন্তান তিনি জানেন—কে ভাল, কে খারাপ। তুমি যাকে ভাল বলে মনে করছ, হয়তো সে তাঁর চোখে খারাপ; আবার তুমি যাকে খারাপ ভাবছো, হয়তো তাঁর চোখে সে-ই ভাল। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়েই তো ভাল-মন্দ বিচার করি। সেটা যে ঠিক ঠিক করতে পারি, তার প্রমাণ কি? আজ যাকে ভাল বলছি, কাল হয়তো তাকেই খারাপ বলছি। আমাদের খারাপ বলতেও যতক্ষণ, ভাল বলতেও ততক্ষণ। যে তাঁকে ( ভগবানকে ) জেনেছে, সে-ই ঠিক ঠিক বলতে পারে—কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা খারাপ; সে-ই ঠিক ঠিক জানে—ভাল-মন্দের তফাৎ কি।

সাধুরা, তাঁদের মন যেদিকেই যায়, সেখান থেকেই উপদেশ সংগ্রহ করেন ভগবানের পথে যাবার। মহাত্মা তুলসীদাস গরীব

ব্রাহ্মণের ছেলে, কবীর জোলার ছেলে—এঁরা ঐরকম সব উপদেশ-পূর্ণ কত তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। কবীরের এ দুটি দোঁহা বেশ—

(১) চল্‌তি চক্কী দেখ্ কর মিঞা কবীরা রোঁয়।
দোপাটন্‌কী বীচ্ আঁ সাঁবুত গয়া না কোয়॥

(২) চল্‌তি চক্কী সব্ কোই দেখে, কীল্ দেখেনা কোই।
যো কীল্‌কো পকড় রহে সাঁবুত রহে হৈঁ ঐ॥

অর্থাৎ—(১) মিঞা কবীর জাঁতা ঘুরতে দেখে কাঁদছেন; (কারণ) জাঁতার দুই-পাটের মধ্যে এসে কেউ (কোন শস্যই) আস্ত বেরুতে পাচ্ছে না। জাঁতা ঘুরছে তাই সবাই দেখে, কিন্তু কীলকটা (খোঁটা —যাতে চাকা দুটি বসান আছে) কেউ দেখে না। যে এই খোঁটার আশ্রয় নিয়ে থাকে (বা খোঁটাকে ধরে থাকে) সেই আস্ত থাকে (জাঁতার পেষণে চূর্ণ হয়ে যায় না)। তেমনি লোকে এই জগৎটা দেখে, আর সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বের পেষণে পড়ে মারা যায়; কিন্তু যে এই জগৎ-সংসারের কর্ত্তাকে আশ্রয় করে, সেই কেবল সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বের হাত থেকে বেঁচে যায়।

একদিন ঠাকুর কথায় কথায় বললেন—"ত্যাগ না হলে কিছুই হবে না।" তাই শুনে রাম বাবু, সুরেশ মিত্র ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির। রাম বাবু বললেন—"আমরাও এখানে (ঠাকুরের কাছে) থাকব।" ঠাকুর শুনে বললেন—"তোমরা ভিক্ষের অন্ন কেন খেতে যাবে? তোমরা পাঁচ জনকে অন্ন দিয়ে খাবে। তোমাদের সংসারে থেকেই হবে; আমি তোমাদের ভার নিলুম।" তারপর তাঁর কথায় তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন। ঠাকুর অন্তর্য্যামী, অধিকারিভেদে উপদেশ

দিতেন। তিনি জানতেন ওঁদের এ পথ নয়। রাম বাবু, সুরেশ মিত্র তাঁর উপদেশ মেনে শান্তি পেয়েছেন, কত কল্যাণ করেছেন। শেষে দেখলি না, রাম বাবু ঘর ছেড়ে কাঁকুড়গাছিতে রইলেন?

কোন কোন বদ্ধ জীব বলে—'বিয়ে না করলে সৃষ্টি লোপ পাবে। আপনি বিয়ে করতে বারণ করেন কেন? যদি সবাই বিয়ে না করে—মেয়েদের উপায় কি হবে?' দেখ একবার? আমি বলি—যাঁর জগৎ তিনি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন? তোমার এত মাথা-ব্যথার দরকার কি! তিনি যাকে যা বলাচ্ছেন, সে তাই বলছে। যদি সৃষ্টিলোপ করা তাঁর ইচ্ছা হয়, তা হলে তুমি কি তা রাখতে পারবে? তোমার মনে ভোগ-বাসনা আছে, তাই তুমি ঐ সব কথা বলছো। সৃষ্টিটা কি তুমি রেখেছ? তোমার খেয়ালমত অপরে চলতে পারে না। মেয়েদের কি হবে, না হবে তা নিয়ে তোমার মাথা-ঘামাবার দরকার কি? তাঁর ইচ্ছা যা তাই হবে। তুমি যা করবে—করে যাও, এসব জুয়োচুরী ( কপট-বুদ্ধি ) ভাল নয়।

আমরা এমন স্বার্থপর হয়ে পড়েছি যে, বিপদে-আপদে কাউকে দেখি না, সাহায্য করবার ভয়ে লুকিয়ে পড়ি। এ কথা ভাবি না যে, একদিন আমারও বিপদ হতে পারে আর লোকের সাহায্যের দরকার হতে পারে। আমি যখন অপরের দুঃখের সময় দেখি না, তখন অপরে আমার দুঃখের সময় দেখবে কেন? রাতদিন পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা নিয়েই ব্যস্ত, কারো উন্নতি দেখতে পারি না—কাতর হই। স্বামীজী তাই বলতেন—"জুতো-খেকো গোলামের জাত।"

শরীরের সঙ্গে মনের খুব নিকট সম্বন্ধ। রোগ হলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কিছু ভাল লাগে না। শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়ে যায়, তেমনি মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়। অভ্যাস করলে এমন হতে পারে যে, শরীর খারাপ হলেও মন খারাপ হয় না। সাধন করলে এই অবস্থালাভ হয়। তাই সাধুরা খুব কষ্ট হচ্ছে তবুও শান্ত থাকতে পারেন।

মহাপুরুষেরা কারো অপরাধ লন না। কারণ তাঁরা দেখেন—বিষ্ণুময় জগৎ। তাঁরা অপরাধ নিলে ভগবান স্বয়ং শাস্তি দেন—পুরাণে এ কথা আছে।

একদিন জনৈক গুরুভাই হঠাৎ আফিস থেকে ঠাকুরের কাছে এসে হাজির। ঠাকুর বললেন—"কি, এখন যে এলে?" সে বললে—"বুঝতেই ত পাচ্ছেন।" তাই শুনে ঠাকুর বললেন—"তোমার পরিবারের নামে কিছু টাকা জমা দিয়ে দাও।" তার কিছুদিন পরে তার পরিবার মারা গেল। তার বাপ খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে। সে তাঁর ( ঠাকুরের ) হুকুম প্রতিপালন করছে।

আমি সাধু, আমার সঙ্গে কোন ছল-চাতুরী—পাটোয়ারী করিস্ না। ব্যবসা করতে হলে হয়তো অনেক সময় ঐ সব না করলে চলে না, কিন্তু তা করতেই যে হবে, এমন কোন কথা নেই। তা যা হউক, আমার সঙ্গে ও সব করিস্ না। কাশীতে আছি, তাঁর নাম করি আর দুটি খাই—বেফজল ( বাজে ) খরচ কিছুই করি না। তা আমার সঙ্গে ওসব পাটোয়ারী চাল কেন?

তোকে পুনঃ পুনঃ বলছি—নেশা ছাড়, তা তুই কিছুতেই শুনবি না, নেশা তোকে পেয়ে বসেছে। ওরে, আমি যতদিন আছি, ততদিন চলবে; তারপর কি করবি? শেষে তুই-ই আমাকে গাল দিবি আর বলবি—"তাঁর কাছে থেকেও আমার এই দুঃখ হলো।" যদি সাঁচ্চা (সৎ) থাকতে পারিস্ তা হলে যেখানে থাকবি সুখে থাকবি, কোনও অভাব হবে না। বজ্জাতি করলে দুঃখ পাবি।

কেদার বাবা, আর চারু বাবু কাশী সেবাশ্রমের জন্য যা প্রাণ দিয়ে খেটেছে তা মুখে বলবার নয়। ওরা স্বামীজীর হুকুম মেনেছে—প্রত্যক্ষ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কেদার বাবা কলকাতায় টাকা তুলতে গেছলো সেবাশ্রমের জন্য। আমি বললাম—কাজ না দেখালে লোকে টাকা দেবে কেন? তখন কিন্তু সে আমার একথা বুঝতে পারে নি—চটে গেছলো। এখন কাজ বেশ হচ্ছে, যে দেখছে সেই খুশী হচ্ছে; তাই লোকে টাকাও দিচ্ছে—তোমরা প্রত্যক্ষই দেখছো।

লক্ষ্মী দিদির বিবাহের কিছুদিন পরেই ঠাকুর বলেছিলেন—"দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মী আর শ্বশুরবাড়ী যাবে না।" ঐ কথা শুনে সকলেই বলতে লাগলো—'বল কি, বল কি? অমন অকল্যাণের কথা বলতে নেই।' কিন্তু ঠাকুর যা বলেছিলেন তাই হলো—তার পরই লক্ষ্মীদি বিধবা হলেন।

মায়ের পেটের ভাই—ইহকালের, আর গুরু-ভাই—ইহকাল ও পরকালের। এ যে কি সম্বন্ধ তা মুখে বলা যায় না! তিনি (ঠাকুর) বলতেন, "রক্তের টানের চেয়ে ভক্তের টান বেশী।"

সংসার কোনকালেই খারাপ নয়। যে সংসারে সব অবতার মহাপুরুষেরা জন্ম লন, তা কি কখন খারাপ হতে পারে রে? তাতে আসক্তিই হচ্ছে খারাপ, বন্ধনের কারণ—জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বারবার নিয়ে যায়। আর হিংসা, দ্বেষ, কলহ—এইসব অশান্তি-দোষ, এই সবই খারাপ। ভগবানের সংসার মনে করে সংসার করলে আর কোন গোল থাকে না। তবে, ভালটির বেলা আমার, আর মন্দটির বেলা ভগবানের—এরূপ পাটোয়ারী-বুদ্ধি যেন না থাকে, তা থাকলেই দুঃখ পাবে।

•

বাপের বিষয়ে সকল ছেলেরই অধিকার আছে। তবে বাপ ইচ্ছা করে যদি কাউকে বেশী, কাউকে কম দেয় অথবা অসৎ কোন ছেলেকে যদি কিছুই না দেয়, সে বাপের খুশী। কিন্তু তেমন কিছু না করে গেলে সব ভাইয়ের সমান বখ্‌রা হওয়া উচিত। যে-ভাই ভাইকে ফাঁকি দেয়, তার ইহকাল পরকাল দুই-ই নেই।

এরা সাধু, মার আশ্রয় পেয়েছে; তুই এদের মনে দুঃখ দিয়ে কথা বলিস্ কেন? এরা যদি চোখের জল ফেলে, আর তাঁর কাছে দুঃখ জানায়, তা হলে তোর যে কি গতি হবে তা ভগবানই জানেন। প্রাণে দুঃখ দিয়ে কাকেও কখন কড়া কথা বলতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। আবার দেখ, দুটো কড়া কথা বললে চোখের জলে ভেসে যাবে, কিন্তু ভগবানের নামে চোখে জল আসে না। এও এক মায়ার খেলা দেখছি!

গভীর রাত্রে দুর্গাচরণ ডাক্তার হাজির। হৃদয়কে গাল পাড়ছেন—'শালা, কোথায় সাধু আছে নিয়ে চল।' হৃদে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল; দু'খানা চৌকি পেতে দিলে—একখানায় ঠাকুর, আর একখানায় দুর্গাচরণ ডাক্তার বসলেন। অনেকক্ষণ দুর্গাচরণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলেন, একটিও কথা বললেন না। তারপর হৃদেকে যেতে বলে চলে গেলেন। এ রকম প্রায়ই আসতেন। তিনিই জানেন—ঠাকুরকে কি চোখে দেখেছিলেন।

বলরাম বাবু ঠাকুরকে অন্দর-মহলে নিয়ে যেতেন। হরিবল্লভ বাবু তা পছন্দ করতেন না। একদিন ঠাকুর বাগবাজার এসেছেন—হরিবল্লভ বাবুর কথা উঠলো। গিরিশ বাবু (গিরিশ ঘোষ) বললেন, 'আমি ডেকে আনি।' হরিবল্লভ বাবুকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে ঠাকুরের সামনে বসলেন। দু'জনেই ঝর্‌ঝর্ করে কাঁদতে লাগলেন; আর কোনও কথা হল না। হরিবল্লভ বাবু কি বুঝে কাঁদলেন তা কখন প্রকাশ করেন নি, আর ঠাকুরই বা কেন কাঁদলেন কিছুই বুঝা গেল না। হরিবল্লভ বাবু কি বুঝে কেঁদেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে কি বোঝালেন—জানবার জন্য আমি পুরী গিছলাম, কিন্তু জানতে পারি নি; তিনি প্রকাশ করলেন না। হরিবল্লভ বাবু এত বড় লোক কিন্তু আমাদের সঙ্গে নিয়ে খেতেন, তাঁর কোনও অভিমান ছিল না।

বলরাম বাবুর খুড়ো বৃন্দাবনে থাকেন, বৈষ্ণব সেবা করতেন। আমি তাঁর কাছে গিছলাম; তিনি খুব যত্ন করতেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিশতাম না; মনে হতো—বড় লোকের সঙ্গে কি মিশবো?

কখন কি ভাবে থাকে, তার কিছুই ঠিক নেই। তিনি বলতেন—তোমরা সাধু, তাই আমাদের সঙ্গ ভাল লাগে না। তিনি সব ঠাকুরদের প্রসাদ আনিয়ে খাওয়াতেন।

ঠাকুর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন—"এতদিনে সাগরে এসে মিশলুম।" বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, "তবে কিছু লোনা জল নিয়ে যান।" ঠাকুর হেসে বললেন—"না গো, তা হবে কেন? তুমি যে অমৃতের সাগর।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে জল খেতে চাইলেন। সেখানে কোন জলাশয় ছিল না। তাই লক্ষ্মণ ভূমিতে তীর মারলেন। তীর মারতেই কিন্তু রক্ত উঠলো। রাম বললেন—খোঁড়ো (খুঁড়ে দেখ)। খুঁড়তে দেখা গেল—একটা ব্যাঙ রয়েছে। রাম ব্যাঙকে বললেন—"তুমি বল নাই কেন?" ব্যাঙ বললে—"রাম, অপরে মারলে তোমায় ডাকি, তুমি মারলে আর কাকে ডাকব বল?"

সুরেশ মিত্র মঠ-বাড়ীর ভাড়া দিতো। একদিন সুরেশ মিত্রকে আসতে দেখে স্বামীজী বললে—"যা, সব ছাদে চলে যা; কে এখন ওর সঙ্গে বসে খোশগল্প করে?" সব ওপরে চলে গেল। সুরেশ মিত্র এসে দেখে কেউ নেই; তখন কেঁদে বললে—"দু'দণ্ড তোদের কাছে জুড়ুতে আসি, তা তোরা যদি এ রকম করিস্ তো কোথায় যাব?" সুরেশ মিত্র ঠাকুরের 'রসদ্দার'দের মধ্যে একজন। তখন সে সাহায্য না করলে মঠফঠ কিছুই থাকতো না।

ঠাকুর চলে গেলে কেউ বললে, 'ঠাকুর আমায় বেশী ভালবাসতেন', অন্য কেউ, 'আমায় বেশী'—এই রকম মাঝে মাঝে ঝগড়া হতো। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, প্রত্যেকেই মনে করতো তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। একদিন আমি অমনি ঝগড়া দেখে বললাম—'তিনি ( ঠাকুর ) কিছু রেখে যান নি, তাতেও তোরা সব ঝগড়া কচ্ছিস, আর যদি কিছু রেখে যেতেন, তা হলে তোরা নিশ্চয়ই মকদ্দমা লড়্‌তিস।'

গয়াতে যত অবতারের উৎপত্তি-স্থান। এখানে চৈতন্যদেবের উৎপত্তি, দীক্ষাগ্রহণ, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ ; ঐখানেই ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) উৎপত্তি—পিতাকে স্বপ্নদান ; আবার ঐখানেই বুদ্ধদেবের উৎপত্তি, সিদ্ধিলাভ, প্রেম-প্রচার ( হয়েছিল )।

রাসমণির বাপের বাড়ী হালিশহরে। তাঁকে বিয়ে করবার পর হতেই তাঁর স্বামীর অবস্থা ফিরে যায়। তাঁর স্বামী একস্‌চেঞ্জে ( exchange ) জিনিস কিনতেন। অল্পদামে জিনিস কিনে খুব বেশী দামে বিক্রি করতেন। এইভাবে ক্রমে অনেক টাকার কারবার রোজ করতেন। রাসমণির ভাগ্যে তিনি খুব অল্প দিনে ধনী হয়ে গেলেন।

রাসমণির জামাই মথুর বাবু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। রাসমণির ষ্টেটের আয় তিনি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই বাড়্‌তি টাকা হতে অনেক সদ্ব্যয় করতেন। কোন সময় ঠাকুর মথুর বাবুকে বলেছিলেন—"এখানে সব ভক্ত আসবে।" মথুরবাবু বললেন—"বাবা, আমি তা দেখে

যেতে পারলেম না।" ঠাকুর বললেন—"মথুর, তারা সব আসবে—আসবে!" মথুর বললেন—"বাবা, যদু মল্লিকের বাগানটা কিনে রেখে যাই, তোমার ভক্তরা এসে থাকবে।" ঠাকুর বললেন, "না মথুর, মা তাদের যোগাড় করে দেবেন, তোমায় কিছু করতে হবে না।"

একজন ঠাকুরকে বললে—"মশায়, এক ন্যাংটা সাধু এসেছেন; লোকে বলে খুব ভাল সাধু; দেখতে যাবেন?" ঠাকুর বললেন—"হাঁ, আমি শুনে দেখতে গিছলাম; দেখলাম—ন্যাংটো বটে কিন্তু আনন্দ পায় নি।" ন্যাংটো হলেই কি আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয় রে? ন্যাংটো হলেই আনন্দলাভ হয় না। ওটা অভ্যাস করলেও হতে পারে।

যার কাশীতে মৃত্যু হয়, সে মহা ভাগ্যবান। স্বয়ং শিব তার কানে মন্ত্র দেন। ঠাকুর বলতেন—"কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাট নৌকা করে দেখতে গিছলাম। দেখি—স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহান্তে তারকব্রহ্ম নাম দিচ্ছেন, আর মা বন্ধন কেটে দিচ্ছেন।"

আমি ঠাকুরের পা টিপ্‌ছি। মনে হচ্ছে—তীর্থভ্রমণে যাই। কারণ, শুনেছিলাম তীর্থে গেলে ধর্ম্ম হয়। ঠাকুর মনের কথা জানতে পেরে বললেন—"এখান হতে যাস্‌নি, এখানেই সব আছে; কোথায় ঘোরা-ঘুরি করবি। আর এখানে দুটি খাওয়া মিলছে; এ ছেড়ে যাস্‌নি।" ঠাকুরের অহেতুক দয়া। আমি আর গেলাম না।

এক দিন কালীবাড়ীর একজন চাকর তামাক খেয়ে যেমন হুকোটি

রেখেছে, আর ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে সেই হুকোয় টান দিলেন। অমনি কালীবাড়ীর বামুনরা বলে উঠলো—"ছোট ভট্‌চাজ্জির জাত গিয়েছে, আর আমরা ওর সঙ্গে খাব না।" ঠাকুর বলতে লাগলেন—"আঃ, বাঁচলুম। শালাদের সঙ্গে না খেতে হলে বাঁচি।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাকেও শিষ্য করেন নি। সংসারী লোককে বরং একটু-আধটু সাহায্য করা চলে, কিন্তু সন্ন্যাসী শিষ্য করা বড় কঠিন।

কাশীবাস করে লাভ কি? দেহ কাশীতে রয়েছে, কিন্তু মন কলকাতায় ছেলে-পিলের উপর পড়ে রয়েছে। একজন বলে, তার মাকে কাশীতে রাখবে। তিনি (ঠাকুর) বললেন—"ওটা ঠিক নয়। যাদের সংসারে বনে না, গোলযোগ—তারাই মাকে কাশীতে পাঠাতে চায়।" ঠাকুর জানতেন—তার সংসারে গোলযোগ, মায় সঙ্গে বনে না, তাই বললেন।

অ— স্বামীজীর কথা প্রমদা মিত্রকে বলেছিল। তারপর স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তিনি স্বামীজীকে খুব যত্ন করতেন। বলতেন—'শাস্ত্রের সঙ্গে সব মিলছে—তুমি ঠিক ঠিক সাধু।' খুব একটা রব উঠলো—ভারী এক সাধু প্রমদা মিত্রের বাড়ীতে এসেছে। অনেক লোক দেখতে আসতো, পণ্ডিতরা তর্ক করতে আসতো। একদিন স্বামীজী স্নান করতে যাচ্ছেন, আর এক পণ্ডিত এসে বললে—'আমার সঙ্গে তর্ক করুন।' স্বামীজী বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি লিখে দিচ্ছি—

আপনার কাছে হেরে গেছি। তা হলে তো হবে?" প্রমদা মিত্র বেঁচে থাকলে আজ ভারী খুশী হতেন—স্বামীজীর এত নাম ( দেখে )।

গিরিশ বাবুর ব্যাপার সাধারণ লোক বুঝতে পারে না। লোকের দৃষ্টিতে পবিত্র জীবন নয়—গোলমেলে জীবন। ওঁকে যে follow ( অনুকরণ ) করবে তার অনিষ্ট হবে। তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন—"গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস।" আমার মাঝে মাঝে চার-পাঁচ দিন একেবারেই ঘুম হতো না। গিরিশ বাবু আমার চোখ দেখলেই বুঝতে পারতেন। তিনি আমায় ডেকে কাছে বসিয়ে অনেক গল্প করতেন, আর আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। বেশ আরামে চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হয়ে যেত। আমাকে তিনি সাধু বলে ডাকতেন। গিরিশ বাবুর বই পড়ে অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতো, 'মশায়, এ জায়গাটা বুঝতে পাচ্ছি না, কি রকম ভাব বলে দিন।' গিরিশ বাবু বল্‌তেন—"আমিও বুঝতে পাচ্ছি না, লিখে গেছি মাত্র; এ সব মিথ্যা, কল্পনা।"

ব্যবসা বড় কঠিন। যে বেশী খাটতে পারে না, সে আবার ব্যবসা করবে কি? ব্যবসা করলেই হল? ব্যবসা জানা চাই। কত খবর রাখতে হয়; দর নাম্‌চে, চড়্‌ছে, কোথায় সস্তা মেলে, কোথায় ভাল মেলে, এই সব খবর রাখতে হয়, আর খুব খাটতে হয়। মান, অপমান বোধ থাকলে কি ব্যবসা করা যায়? ও সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। ব্যবসাতে খুব ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লোকচেনবার শক্তি চাই। বিশ্বাসী লোক সব রাখতে হয়। কারণ, কাঁচা পয়সার ব্যাপার—ওর মায়া ছাড়া বড় কঠিন।

রাখাল মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ) বাড়ী হতে এলে ঠাকুর বলতেন—"যা, আগে গঙ্গার জল তিন গণ্ডুষ খেয়ে আয়, তারপর আমার কাছে আসিস্। অনেক দিন বিষয়ীর অন্ন খেয়েছিস কিনা!"

মিছরির পানা যে খেয়েছে, সে কি আর গুড়ের পানা খেতে চায়? যারা তাঁর সঙ্গ করেছে, তাঁর পবিত্র জীবন দেখেছে—তারা কি আর এ সবে ভোলে? যারা পবিত্র জীবন দেখে নি, কখন তেমন লোকের সঙ্গ করবার সুযোগ পায় নি, তারা এ সব ঢং দেখে ভুলবে। আর দেখ, 'আরোপ করা' ভাব বেশী দিন রাখা যায় না। তেমন-তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে ও সব ধরা পড়ে যায়। একটা গল্প শোন— একটা বাঘ ভেড়ার ছাল পরে ভেড়ার দলে ঢুকেছিল। উদ্দেশ্য—ভেড়াওয়ালার চোখ এড়ান, যাতে সে জানতে না পারে যে একটা বাঘ ভেড়ার দলে এসেছে। ভেড়ার দলে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ভেড়ার মত নিরীহ থাকতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই আর তার হিংস্র স্বভাব চেপে রাখতে পারে না। যেই ভেড়াওয়ালা একটু আন্মনা হয়েছে, অমনি ভেড়ার সাজ ফেলে একটা ভেড়া নিয়ে পালিয়ে গেল। এই রকম করে বাঘটা প্রায়ই ভেড়া চুরি করে খেত। একদিন সে একটা চতুর ভেড়াওয়ালার পালে ঐ রকম সেজে ঢুকেছে। হাজার হউক বাঘ—তার চাল-চলনই আলাদা। ভেতরে চেষ্টা চলছে—কখন সুবিধা হবে, আর ভেড়া মারবো। বাহিরে নিরীহ ভেড়াটি হতে চেষ্টা করলে কি হবে? হিংস্রভাব কি চেপে রাখতে পারে? হাব-ভাব দেখলেই বুঝা যায় যে, এ ভেড়া নয়। চতুর ভেড়াওয়ালা ওকে দেখেই বুঝেছে— এ ভেড়া নয়। তখন সে চেঁচামেচি করে উঠলো—আর বাঘটা ছুটে

পালিয়ে গেল। ঠিক তেমনি—যে সাধু নয়, পবিত্রাত্মা নয়, সে ভাণ করে বেশী দিন থাকতে পারে না। তার আসল স্বভাব একদিন-না-একদিন বেরিয়ে পড়বেই। তাই বলি, জুয়োচ্চুরি করো না; তুমি যা তাই দেখাও—ভেতর বাহির সমান কর!

রোগ, শোক, অশান্তি হলে সংসারীরা দমন করতে পারে না, হতাশ হয়ে পড়ে। তার কারণ—এই সব নশ্বর বস্তুতে তাদের খুব আস্থা। কিন্তু সাধুরা দমন করতে পারে, তার কারণ—তাদের এ সবে কোনই আস্থা নেই, আর জানে এ সব তাঁরই খেলা; তাই কাতর হয়ে পড়ে না। সাধু আর গৃহস্থে এই তফাৎ।

রাজ-শক্তি মানতে হবে বৈ কি। ভগবান যাঁকে রাজা করেছেন, অত শক্তি দিয়েছেন তাঁকে অমান্য করলে ভুগতে হবে। সেখানে তাঁর বিশেষ শক্তির প্রকাশ; আর সব প্রকাশ তাঁর অধীন। এ কথা খুব সত্য। তাই বলি, রাজশক্তির অমান্য করো না; না মান দুঃখ ভুগবে।

মানুষের মধ্যে নানারকম লোক আছে—ভাল, মন্দ, আবার মাঝারি রকমের। সকলের সঙ্গ করা চলে না; তাই মানুষ চিনে সঙ্গ করতে হয়—এ শাস্ত্রের কথা। মানুষ চেনবার শক্তি নেই বলেই তো জীবনে এত ঠকতে হয়। যতদূর সম্ভব বিচার করে সঙ্গ করা উচিত। তা হলে কম ঠকতে হবে।

কেবল খাদ্য-অখাদ্যের বিচার নিয়ে পড়ে থাকলে ভগবানলাভ হয় না। খাদ্য-অখাদ্যের বিচারটা প্রধান নয়, ভগবানলাভই হল প্রধান। পিঁয়াজ বা মাংস খেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। পিঁয়াজ, মাংস খেয়েও যদি সাধন করে, তবে বস্তু লাভ হবে; আর নিরামিশ খায় অথচ সাধন করে না, তার কিছুই হবে না। যীশুখ্রীষ্ট মাংস খেতেন, আমাদের ঠাকুর মাছ খেতেন, বুদ্ধদেবও মাংস খেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁদের কি পতিত করে দিয়েছিল? খাদ্য-অখাদ্য মানুষের উন্নতি-অবনতির দিক দিয়ে বিশেষ কিছু করে না। মনই হচ্ছে আসল। যে সাধন করবে তার হবেই, তা সে যাই খাক না কেন। তবে আমি এ কথা বলছি না যে, রাজসিক আহার করলে রজোগুণ বৃদ্ধি করে না। তা একটু করে বৈ কি। কিন্তু যার মন সাত্ত্বিক, সে যা খাবে তাই সাত্ত্বিক হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে—হিংসা না করাই ভাল, আর যা ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন না আনে এমন আহার করা ভাল।

নিত্যগোপাল (জ্ঞানানন্দ অবধূত) আর বিজয় গোস্বামীর ওপর আমার কোন সংশয় নেই। ঠাকুর তাঁদের দু'জনকে উপদেশ (দীক্ষা) দিতে বলেছিলেন। নিত্যগোপাল ভয় পেয়ে রাজী হচ্ছিল না। তা দেখে ঠাকুর বললেন—আমায় দেখে তোমার কষ্ট হয় না? আমি বকতে বকতে গেলাম। তুমি উপদেশ (দীক্ষা) দাও, কোনও ভয় নেই। যদি কিছু দোষ হয় তো আমার।" গোস্বামীকে বলেছিলেন, "তুমি ত অদ্বৈতবংশের, তুমি উপদেশ (দীক্ষা) দিলে কোন দোষ হবে না।" তার পর তাঁর কথায় দু'জনে উপদেশ (দীক্ষা) দিতে লাগলেন। আমারই সামনে এসব হলো। ঠাকুর বলতেন, নিত্যগোপালের

পরমহংস অবস্থা। রাম বাবুকে ঠাকুর বলেছিলেন—"ওকে এঁটো খেতে দিও না।"

জন্ম হলেই দুঃখ ভুগতে হবে, এড়াবার উপায় নেই। মায়াতেই বেশী দুঃখ দেয়; কারণ, যার উপর মায়া করে, সে তো আর অমর নয়? সে মরলেই দুঃখ হবে। তা ছাড়া, এই যে শরীর—এর ওপর মায়া থাকলেই দুঃখভোগ হবে। রোগ, শোক, মৃত্যু, অভাব, দুঃখ—এ সব শরীর থাকলে লেগেই আছে। এদের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই—তা অবতার মহাপুরুষদের পর্য্যন্ত 'পার' নেই। শরীরধারী মাত্রই এ সবের অধীন। তবে শরীরের মায়া যে ত্যাগ করতে পেরেছে তার দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তাকে তা অভিভূত করতে পারে না। এই যা তফাৎ।

'শিবোঽহং, শিবোঽহং' বললেই শিব হয়ে যায় না। তবে সেই শিবের শক্তি পেয়ে 'শিবময়' হয়ে যায়। ভৈরব, ভৈরবী সাজলেই বুঝি হর-পার্ব্বতী হয়ে পড়লো? সেটা অত সহজ ব্যাপার নয়। কাম, ক্রোধ, হিংসায় ভর্ত্তি—বলে কিনা 'শিবোঽহং'। দেখ জুয়োচুরি! ভৈরব-ভৈরবী সেজে লোকঠকান বিদ্যা শিখে জুয়োচুরি করে বেড়ালে কি শিব হওয়া যায়? সাধন করবে, সাধন কর; ওসব আবার কেন—ধর্ম্মের নামে দুষ্টামী?

বিবাহ না করে কর্ম্ম করে যাও, আর স্মরণ-মনন করে যাও। সকলের ভিক্ষা করে খাওয়া ঠিক নয়। ঠিক ঠিক যারা ধ্যান-ভজন

করতে সক্ষম, তারা ভিক্ষান্ন খেতে পারে। তা যারা পারে না, তাদের ভিক্ষান্নে উপকার হওয়া চুলোয় যাক্, বিশেষ অপকারই হয়ে থাকে।

চাকর কি দিয়ে আর মনিবকে সন্তুষ্ট করবে? তবে সেবা-যত্নে তাঁকে খুশী করতে পারে—এই পর্য্যন্ত। মনিব খুশী হয়ে তাঁকে বক্‌সিস্ দিয়ে তিনি যে সন্তুষ্ট হয়েছেন সে কথা জানাতে পারেন।

গুণবানকে সকলেই আদর করে। গুণহীনকে কে আর ভালবাসে বল? তবে মহাপুরুষরা গুণহীনকে ভালবেসে শিক্ষা দিয়ে গুণবান করে দেন। ঘৃণা করলে কি আর গুণহীন কোনদিন গুণবান হবে রে? ভালবাসতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়—তবে গুণহীনও গুণবান হয়ে যায়। স্বামীজী বলতো—"ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। প্রেম, প্রেম—প্রেমের মধ্য দিয়েই একমাত্র ঠিক ঠিক শিক্ষা সম্ভব।

তাঁকে জেনে যদি ভালবাসা যায়, তা হলে বন্ধন আসে না। মোহ সেখানে আসবে কি করে? কারণ, মন আছে ভগবানের ওপর। যা মোহ তাই বন্ধন। যে ভগবানকে ভালবেসেছে, সে অপরকে ভালবাসে—সে কেবল তার মধ্যে তিনি আছেন বলে। এমনি যেখানে মনের ভাব, সেখানে বন্ধন ( মোহ ) আসতে পারে না।

স্নান করে উঠে একটু প্রসাদ ধারণ করবে। ভগবানের প্রসাদ ধারণ করলে মন পবিত্র হয়, শরীর শুদ্ধ হয়।

রামায়ণ, মহাভারত বিশ্বাস কর আর নাই কর, ধ্রুব প্রহ্লাদ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ—এঁরা খুব সত্য। এঁদের মানতেই হবে, এঁরা সত্যই ছিলেন আর লোক-কল্যাণ করেছিলেন।

আমি একদিন বিজয় গোস্বামীর কাছে গিছ্‌লাম। তিনি তখন কলকাতায়। আমাকে কাছে বসালেন, আর খুব যত্ন করলেন। দেখলাম—আমাদের ভোলেন নি। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে। বাপের এত মান, কিন্তু ছেলের একটু অহঙ্কার নেই! আমি গেলেই যোগজীবনের খুব আনন্দ হতো, পরে বলতো, "বাবা, স্বামীজী এসেছেন।" গোস্বামী মশায় খুব হরষিত হতেন, তাঁর আসন ছেড়ে এসে আমায় বসাতেন। সকলের কি দর্শন হয় রে? গোস্বামী মশায়ের ঠিক ঠিক দর্শন হয়েছিল। তিনি যা পেয়েছিলেন তাতেই ভরপুর হয়েছিলেন। মানুষ আর কতটা হবে!

একবার ফেলে দিলুম, একবার তুলে নিলুম। সাধু হয়ে কি সর্ব্বদাই তোদের কথা ভাববে? তাই জন্যে 'ফেলে দিলুম' বলে তোদের চিন্তা মন থেকে একেবারে ফেলেই দিই, আবার যখন ইচ্ছা হল, তোদের চিন্তা 'তুলে নিলুম' বলে তুলে নিই।

তোদের পূজো কি রকম রে? রাজ্যের খারাপ জিনিস জুটিয়েছিলি! কাপড় দিলি তো আট হাতের বেশী নয়—আবার তাও 'জেলে ধুতি'। ফল দিলি তো রাজ্যের খারাপ ফল। মিষ্টি দিলি তো যত বাসী, গন্ধ! এ কি রকম পূজো রে? যদি মাকেই দিচ্ছিস্, তবে ভাল

জিনিস দে না। যে জিনিস তুই নিজেই খেতে ঘেন্না করিস—তা ভগবানকে কি বলে দিতে গেলি? যদি একান্তই পয়সার অভাব, ভাল জিনিস কিনতে না পারিস, তবে যে জিনিস তুই নিজে ব্যবহার করিস তাই দে না। ও রকম খারাপ জিনিস দিয়ে অশ্রদ্ধা করে পূজা করার চেয়ে না করাই ভাল।

খুব জড়িয়ে কথা কয়, ভাল কথা ফোটে না। বড় কমবুদ্ধি বলে ওকে ছোট মনে কর কেন? ও তোমাদের চেয়ে কি কম ভাগ্যবান? কলকাতায় মা-ঠাকুরাণীর কৃপা পেয়ে গয়ায় বাপ-মার পিণ্ড দিয়ে কাশীতে সাধুসঙ্গ করে এসেছে। একি কম কথা? ও কি কম ভাগ্যবান?

বেশ ভাল ভাল জিনিস খেয়ে ভগবানের নাম না করে থাকার চেয়ে ভগবানের নাম করে না খেতে পেয়ে মরাও শতগুণে ভাল।

পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনালেন স্বয়ং শুকদেব। রাজার কি একটু মায়া রে? তোর ঐ ছোট্ট বাড়ীটির ওপর কত মায়া! রাজার যে অত বড় রাজ্যটার ওপর মায়া, সে কত বড় মায়া! সেই মায়া কাটাবার জন্যই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা শুকদেবকে স্বয়ং আসতে হলো আর ভাগবত শোনাতে হলো। ভাগবত বড় কঠিন। শুদ্ধাত্মা হলে বিপরীত বুদ্ধি আনিয়ে দেয়—সংশয় হয়ে যায়।

**হরি ওঁ তৎ সৎ**